তফসীরে নূরুল কোরআন

ত্রয়োদশ পারা

১৩

মওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম

ত্রয়োদশ খন্ড

اقرأ باسم ربك الذي خلق

তফসীরে নূরুল কোরআন

ত্রয়োদশ খন্ড

১৩

ত্রয়োদশ পারা

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, ইমাম ও খতীব লালবাগ শাহী মসজিদ,
সম্পাদক, মাসিক আল-বালাগ, তফসীরকার রেডিও বাংলাদেশ,
সাবেক সদস্য, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বংলাদেশ বোর্ড অফ গভর্ণরস.
চেয়ারম্যান, তফসীরে তাবারী শরীফ সম্পাদনা বোর্ড,
বহু গ্রন্থ প্রণেতা

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

আল-বালাগ পাবলিকেশন্স
ঢাকা

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

চতুর্থ প্রকাশ	ঃ	ফেব্রুয়ারী-২০১১ ফাল্গুন-১৪১৭ রবিউল আউয়াল -১৪৩২
প্রকাশক	ঃ	মোহাম্মদ মাহমুদুল হাসান
সর্বস্বত্ব	ঃ	প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
মুদ্রণে	ঃ	এ. এন. প্রিন্ট এণ্ড প্যাকেজ ৫/২ গির্দা উর্দূ রোড বখশিবাজার, ঢাকা।
হাদীয়া	ঃ	৩০০ টাকা

পরিবেশক

গাউসিয়া পাবলিকেশন্স

১১, বাংলাবাজার (ইসলামী টাওয়ার) ঢাকা-১১০০

ফোন-৯৫৫৮৯১৩, মোবাইলঃ ০১৯৭৩০১৪৮৮৯

প্রাপ্তিস্থান

আল-বালাগ কার্যালয়

১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড,

মোহাম্মদপুর, ব্লক-এ, ঢাকা-১২০৭

মোবাইল ঃ ০১৭১৩০১৪৮৮৯

আন-নূর পাবলিকেশন্স

৫২, বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোন ঃ ৭১৭৩৭২১

এমদাদিয়া লাইব্রেরী

চকবাজার, ঢাকা

Tafseer-e Nurul Quran (13): By Hazrat Moulana Mohammed Aminul Islam. Published Bby Al-Balag Publications, 12/17, Sir Sayed Ahmed Road, Mohammedpur, Block-A, Dhaka-1207, Mobile : 01713014889

Price : 275.00

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

بسم الله الرحمٰن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

ভূমিকা

পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের মহান দরবারে অগণিত শোকর যে, তিনি তফসীরে নূরুল কোরআনের এয়োদশ খন্ড পেশ করার তৌফিক দান করেছেন। যদি সারা জীবন আল্লাহ পাকের মহান দরবারে শোকর আদায় করতে থাকি, তবুও শোকরগুজারীর হক্ব আদায় হবেনা। দরুদ ও সালাম হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, যাঁর নেক নজরের বরকতে আমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের নেয়ামত ও রহমত মুষলধারে বৃষ্টির ন্যায় নাজিল হয়ে থাকে। হে আল্লাহ! দরুদ পেশ কর তাঁর দেহ মোবারকের প্রতি, দেহ সমূহের মাঝে এবং দরুদ পেশ কর তাঁর রুহের প্রতি, রুহ সমূহের মাঝে। হে আল্লাহ! আমাদের তরফ থেকে তাঁকে সালাম পৌঁছিয়ে দাও, সৃষ্টির শুরু থেকে এ পর্যন্ত বৃষ্টির যত ফোটা পড়েছে এবং যত উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়েছে, সেগুলোর সংখ্যা অনুসারে।

ইসলাম স্বভাব ধর্ম, মানব জীবনের সার্বিক কল্যাণ সাধনই ইসলামী বিধান সমূহের মূল লক্ষ্য। এজন্যে ইসলাম নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবে মানব জীবনে এক কল্যাণধর্মী ইনকেলাব বা বিপ্লব আনে। তাই সর্ব প্রথম ইসলাম মানুষকে চিন্তা এবং চেতনার পবিত্রতায় উদ্বুদ্ধ করে। কেননা, যে পর্যন্ত মানুষের মনো-জগতে পরিবর্তন না আসবে, যে পর্যন্ত মানুষের চিন্তাধারায় বিপ্লব না আসবে, সে পর্যন্ত মানুষ সরল-সঠিক পথের যাত্রী হতে পারে না।

খৃষ্টীয় ছয়শ' শতাব্দীতে আরবের যে অবস্থা ছিল, তা ইতিহাস পাঠক মাত্রেরই জানা। জুলুম-অত্যাচার, চুরি-ডাকাতি, অবিচার-অনাচার ছিল তখন নিত্য-নৈমিত্যিক ব্যাপার। কলহ-দ্বন্দ্ব, হত্যাকান্ড ছিল সে যুগের মানুষের নিত্য-সাথী। মানবতা ছিল তখন ভূলুণ্ঠিত। জালেমের দৌরাত্ম ছিল সর্বত্র। মজলুমের ফরিয়াদের কোন স্থান ছিলনা। পৌত্তলিকতা এবং যাবতীয় কুসংস্কার তখনকার মানুষগুলোকে পশুত্বের পর্যায়ে অবনমিত করেছিল বললে অত্যুক্তি হবেনা। গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন এমনি একটি সমাজে আবির্ভাব হল সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের। তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হল সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআন। মাত্র ২৩ বছরের স্বল্প সময়ে পৃথিবীর ইতিহাস বদলে গেল। ভৌগলিক সীমারেখায় অভাবনীয় পরিবর্তন দেখা দিল। যারা জুলুম-অত্যাচারে ছিল অভ্যস্ত, তারা সুবিচারের আদর্শ শুধু নিজেরাই গ্রহণ করলেন না, বরং সারা বিশ্বের এক বিরাট অংশে এ মহান আদর্শ কায়েম করলেন,

যারা জ্ঞানের আলো থেকে ছিল অনেক দূরে, পথভ্রষ্টতার অন্ধকারে ছিল আচ্ছন্ন, তারা শুধু যে জ্ঞান অর্জন করলেন তাই নয়; বরং বিশ্ববাসীর জন্যে শিক্ষকের ভূমিকা পালন করলেন। নিঃসন্দেহে এটি মানব-জাতির ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম বিপ্লব। এ বিপ্লবের মহানায়ক হলেন স্বয়ং হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, আর এ বিপ্লবের সংবিধান হল পবিত্র কোরআন। যারা সহজাত মানবিক গুণাবলী পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিল, তাদেরকে ফেরেশ্তাদের চেয়েও উচ্চতর মর্তবায় পৌছানো আদৌ সহজ কাজ ছিল না। বিশ্বের ইতিহাস সম্পর্কে যারা চিন্তা ও গবেষণা করেন, তাদের মনে এ প্রশ্নটি বারে বারে উত্থিত হয় যে, কিভাবে এ মহাবিপ্লব সম্ভবপর হল? এ প্রশ্নের সহজ এবং সঠিক জবাব হল পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণ এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনিন্দ্য-সুন্দর আদর্শ বরণের মাধ্যমেই এ মহাবিপ্লব সংঘটিত হয়েছে।

মানুষকে আত্মসংশোধনে উদ্বুদ্ধ করার যে পন্থা পবিত্র কোরআন অবলম্বন করেছে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যেভাবে সে পন্থার বাস্তবায়ন করেছেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত খুঁজেও পাওয়া যাবেনা। পবিত্র কোরআনের বর্ণনা-শৈলী এত সহজ, সরল এবং আকর্ষণীয় যে, যে কোন মানুষ একাগ্রচিত্তে তা শ্রবণ করে, তার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারেনা। পবিত্র কোরআন শুধু যে চিন্তা ও চেতনার পবিত্রতা অর্জনে উদ্বুদ্ধ করে তাই নয়; বরং এ পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট পথের সন্ধান দেয়। পবিত্র কোরআন কত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় মানুষকে আত্মসচেতন হতে এবং আত্মসংশোধন করতে উদ্বুদ্ধ করে তা বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়।

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا

(সূরা আস্ শামস)

"সে-ই সফলকাম হয়েছে যে নিজেকে পবিত্র করেছে, আর সে-ই ব্যর্থ হয়েছে যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করেছে"।

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ.......فٰعِلُوْنَ

(সূরা মোমেনুন)

"নিশ্চয় সফলকাম হয়েছে সেই মুমেনগণ, যারা তাদের নামাজে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় হাযির হয়েছে। যারা অহেতুক কথা এবং কাজ থেকে বিরত রয়েছে, আর যারা যাকাতের কর্মসূচীর বাস্তবায়ন করেছে"।

পবিত্র কোরআনের এমনি বহু আয়াত রয়েছে যার মাধ্যমে মানুষকে আত্মসংশোধনের তথা চিন্তা-চেতনার পবিত্রতা অর্জনের জন্যে অনুপ্রাণিত করেছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একলক্ষ ত্রিশ হাজার সাহাবায়ে কেরামের যে পূণ্যাত্মা, পবিত্র দল তৈরী করে গেছেন, তাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ

"আল্লাহ্ পাক তাদের প্রতি সন্তুষ্ট"।

আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদের সম্পর্কে বলেছেনঃ

اصحابى كالنجوم -الحديث

"আমার সাহাবায়ে কেরাম হল নক্ষত্রপুঞ্জের ন্যায়, তোমরা তাদের মধ্যে যারই অনুসরণ কর, হেদায়েত লাভ করবে"।

প্রশ্ন হল কিভাবে এত অল্প সময়ে এই পবিত্র দল তৈরী হল? যাঁদের মধ্যে হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর ন্যায় মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী রয়েছেন, হযরত ওমর (রাঃ)-এর ন্যায় শ্রেষ্ঠ শাসনকর্তা রয়েছেন, রয়েছেন হযরত ওসমান (রাঃ)-এর ন্যায় দানশীল, হযরত আলী (রাঃ)-এর ন্যায় বীর পুরুষ, হযরত খালেদ এবনে ওলীদ (রাঃ)-এর ন্যায় শ্রেষ্ঠ সেনাপতি এবং হযরত আমর এবনুল আস (রাঃ)-এর ন্যায় অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তাঁরা কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী ছিলেন? কোন্ গ্রন্থ তাঁরা পাঠ করেছেন? কে তাঁদেরকে যোগ্যতার সনদ প্রদান করেছেন?

এসব প্রশ্নেরও একই জবাব তা হল তাঁরা শিক্ষা পেয়েছেন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট। একমাত্র যে গ্রন্থটি তাঁরা পাঠ করেছেন, তা হল পবিত্র কোরআন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আত্ম-সংশোধনের জন্যে তথা অন্তরের পবিত্রতা অর্জনের জন্যে একটি আট দফা কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন। আল্লামা এবনে কাসীর (রাঃ) লিখেছেনঃ উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এবাদত-বন্দেগী সম্পর্কে। তিনি প্রশ্নকারীকে বলেন, তুমি কি সূরায়ে মোজ্জাম্মেল পাঠ করনা?

يَاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلاً.........تَرْتِيْلاً

"হে বস্ত্রাবৃত! রাত্রিকালে দন্ডায়মান থাকুন তবে অল্পকাল (সমস্ত রাত নয়), অর্ধরাত অথবা কিছু কম বা তার চেয়ে বেশী, আর পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করতে থাকুন ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট ও সুন্দরভাবে"।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ পাক এ সূরার শুরুতে রাতের নামাজকে ফরজ করেছিলেন, তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) একটি বছর রাত্রি জাগরণ করলেন, এমনকি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কদম মোবারক ফুলে গেল, রস জমে গেল, একবছর পর রাত্রি জাগরণের এ ফরজকে নফল ঘোষণা করা হল। এতে আত্মসংশোধনের আটটি কর্মসূচি পাওয়া যায়।

(এক) قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلاً রাত্রিকালে দন্ডায়মান থাকুন তবে অল্পকাল (সমস্ত রাত নয়)।

(দুই) وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ধীরে ধীরে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করুন, সুস্পষ্ট ও সুন্দর ভাবে।

(তিন) اِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ... সারা দিন কর্মময় জীবন যাপন করুন।

(চার) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ আল্লাহ পাকের নাম স্মরণ করতে থাকুন।

(পাঁচ) وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য সব সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহ পাকের এবাদতে মশগুল হোন।

(ছয়) فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا তাওয়াক্কুল তথা এক আল্লাহর প্রতিই ভরসা রাখুন।

(সাত) وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ ধৈর্য ও সংকল্পের দৃঢ়তা অর্জন করুন।

(আট) وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا দুশমন থেকে সুন্দরভাবে নিরাপদ দূরত্বে থাকুন।

এ পর্যায়ে আত্মসংশোধনে পবিত্র কোরআন প্রদত্ত আট দফা কর্মসূচীর উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা যেতে পারে।

১. রাতের শেষ প্রহরে যখন সারা পৃথিবীর মানুষ ঘুমন্ত, তন্দ্রাহত থাকে, সব কিছু থাকে নীরব নিস্তব্ধ, নীলাকাশ চন্দ্র এবং তারকারাজির আলোতে আলোকময় থাকে, তখন স্রষ্টার সৃষ্টি-নৈপূণ্য দেখে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম উপলব্ধি করার এক সুবর্ণ সুযোগ আসে। তাই সূরায়ে মুজ্জাম্মেলে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِىَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا

"নিশ্চয় এবাদতের জন্যে রাত্রিবেলা উত্থান নিজের প্রতি নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার একটি কার্যকর মাধ্যম এবং সুস্পষ্ট উচ্চারণের সহায়ক"।

শাহ্ ওলিউল্লাহ দেহলভী (রঃ) তাঁর বিখ্যাত "হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা" গ্রন্থে এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে লিখেছেনঃ রাতের শেষ প্রহরের সময়টি হয় অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ। মানব-অন্তর যাবতীয় অস্থিরতা এবং ব্যাকুলতা থেকে হয় পবিত্র। মানব মন লাভ করে তখন একাগ্রতা, সর্বত্র থাকে নীরবতা, দুনিয়ার মানুষ থাকে ঘুমন্ত, লোক দেখানোর কোন সম্ভাবনা তখন থাকেনা, আল্লাহ পাকের এবাদতে মনোনিবেশ করার জন্যে পরিবেশ তখনই অনুকূল থাকে।

এতদ্ব্যতীত, ঐ সময়েই আল্লাহ পাকের রহমত নাজিল হতে থাকে এবং বন্দাগণ আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভে ধন্য হয়। মানুষের মধ্যে যে দানবীয় শক্তি থাকে তা দূরীকরণে রাত্রি জাগরণের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এজন্যেই আল্লাহ পাক রাত্রি জাগরণের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। আল্লাহ পাকের প্রিয় বন্দাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে সূরায়ে ফুরকানে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا (সূরা ফোরকান)

"আর যারা রাত্রি যাপন করে আল্লাহ পাকের দরবারে সেজদারত হয়ে অথবা

দন্ডায়মান অবস্থায়"।

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْاَسْحَارِهِمْ يَسْتَغْفِرُونَ

(সূরা যারিয়াত)

"পরহেজগার লোকেরা রাতে কমই নিদ্রিত হয়, আর তারা রাতের শেষ প্রহরে আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হয়"।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাকের দরবারে দন্ডায়মান হওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। তিনি সারা জীবন রাত্রি কালে দরবারে এলাহীতে দন্ডায়মান থাকতেন। যেহেতু আল্লাহ পাকের দরবারে রাত্রিকালে দন্ডায়মান হওয়ার কর্মসূচি আত্মিক উন্নতি অর্জনে অত্যন্ত গুরুত্ববহ, তাই এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে একাধিক স্থানে বিশেষ তাগিদ রয়েছে।

২. রাতের বেলা কোরআনে করীমের তেলাওয়াতের যে গুরুত্ব রয়েছে তা ব্যাখ্যা করার অপেক্ষা রাখেনা। পবিত্র কোরআন হল হেদায়েত-গ্রন্থ, এতে মানব জীবনের প্রত্যেকটি দিকের ব্যাপারে অত্যন্ত কার্যকর বিধি-বিধান রয়েছে। তাই রাতের সেই শুভ-মুহূর্তে পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত করা বা তার ব্যাখ্যার প্রতি চিন্তা ও গবেষণা করা একদিকে অন্তরের পবিত্রতা অর্জনে সহায়ক হয়, অন্যদিকে চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তনের মাধ্যমে নব জীবন লাভ হয়। যেন মানব অন্তরে আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামত ও রহমত উপলব্ধি করার সুযোগ হয়। রাত্রি জাগরণ, রাতের শেষ প্রহরে আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হওয়া এবং ইসলামী জীবন বিধান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা- এসব কিছু মানুষকে প্রাণবন্ত জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করে। এজন্যে ইসলামে দুনিয়াত্যাগী হয়ে নির্লিপ্ত জীবনের শিক্ষা নেই; বরং একটি কর্মময় জীবন যাপনের শিক্ষা রয়েছে। মানব জাতির ইতিহাসে যিনি সর্বাধিক কর্মময় জীবন যাপন করেছেন তিনি হলেন আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। তিনি হলেন সৈয়্যদুল মুরসালীন-নবী রসূলগণের দলপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ, একাধারে তিনি ছিলেন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান, সেনাপতি এবং সে সঙ্গে সুবিচারক, সংস্কারক এবং সমগ্র মানব জাতির মহান ও চিরন্তন শিক্ষক। বস্তুতঃ জীবন-সংগ্রামের এমন কোন দিক নেই, যেখানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেননি।

৩. দরবারে এলাহীতে রাত্রিকালে দন্ডায়মান থাকার কারণে মানুষ আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হয় এবং জীবনের মালিকের পরিচিতি লাভ করে তথা আল্লাহর মা'রেফাত হাসিল করে। আর এভাবেই মানুষ নব জীবন লাভ করে এবং একটি দায়িত্বপূর্ণ কর্মময় জীবনের আদর্শ গ্রহণ করে।

৪. আর এ কারণেই মানুষ জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে আল্লাহর জিকরে মশগুল থাকে।

ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, কথা-বার্তা, ব্যবসা-বাণিজ্য- এককথায় জীবনের সর্বাবস্থায় তার রসনায় স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাকের মোবারক নাম থাকে, যা তার অন্তরকে জীবন্ত করে রাখে।

৫. রসনায় যদি আল্লাহর নাম থাকে, তবে অন্তরে যেন আর কারো কথা না থাকে, তাই একাগ্রচিত্তে শুধু এক আল্লাহ্ পাকের সাথে সম্পর্ক রাখার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। হাদীস শরীফের ভাষায় এ অবস্থাকে "এহ্‌সান" বলা হয়েছে। আর "এহ্‌সান" হলোঃ

ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك

"তুমি এভাবে আল্লাহর এবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। যদি তোমার মনের এ অবস্থা না হয়, তবে একথা নিশ্চিত ভাবে জেনে রেখো যে তিনি তোমাকে দেখছেন"।

বস্তুতঃ যখন মানব মনের এ অবস্থা হয় তখন সে একদিকে জীবনের যাবতীয় কাজ আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করে, অন্য দিকে কোন কাজেই যেন আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী বা পাপাচার না হয় সেদিকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকে। এভাবে মানুষ সরল-সঠিক পন্থার অনুসারী হয় এবং সুন্দরতর, উন্নততর জীবন ধারায় উজ্জীবিত হয়।

৬. মানুষের এ জীবন কন্টকাকীর্ণ। প্রতি মুহূর্তেই নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়। মন্দ পথের আহবান আসে চতুর্দিক থেকে। ভালো কাজে বাধা থাকে সর্বত্র। এমন অবস্থায় মানুষ নিজেকে বড় অসহায় মনে করে। এ সময় যে কর্মসূচীটি একান্ত প্রয়োজনীয় তাহলো সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের প্রতি সম্পূর্ণ ভরসা করা। আল্লাহ্ পাকের প্রতি তাওয়াক্কুল বা ভরসার কারণে মানব মন শক্তি অর্জন করে, সংকল্পে আসে দৃঢ়তা, মনে আসে এক অনাবিল প্রশান্তি।

৭. জীবন-সংগ্রামে কোন কোন সময় অনেক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়। কখনো ব্যর্থতাও দেখা দেয়। এমনি সময়ের জন্যে পবিত্র কোরআন 'সবর' অবলম্বনের তথা ধৈর্য ধারণের কর্মসূচী পেশ করে।

'সবর' এর কর্মসূচী নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের একটি বিশেষ নেয়ামত যা মানুষকে চরম বাধা-বিপত্তি মোকাবেলায়ও হাসিমুখে জীবন-সংগ্রামে এগিয়ে যেতে উদ্ধুদ্ধ করে। 'সবর' ব্যতীত জীবন-সংগ্রামে সাফল্য অর্জন কল্পনাতীত, কেননা এর কোন বিকল্প নেই এজন্যে পবিত্র কোরআনে 'সবর' অবলম্বনের বিশেষ তাগিদ করা হয়েছে। এমনকি, যারা 'সবর' অবলম্বন করে তাদের জন্যে আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য-ধন্য হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

"নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক 'সবর' অবলম্বনকারীদের সঙ্গে রয়েছেন"।

৮. একজন সত্য-সাধককে শয়তান প্রতারণা করতে চেয়েছিল কিন্তু তার অপচেষ্টা ব্যর্থ হলো। তাই শয়তান পলায়নপর হয়েও বললো-'ঠিক আছে, আপনি আমার প্রতি

লা'নত করুন'। সত্য-সাধক বললেন-'তুই বিদায় বেলায়ও আমাকে ধোকা দিতে চেষ্টা করছিস', বরং যে সময় আমি তোকে লা'নত দেব, সে সময় আমি আমার আল্লাহর জিকর করবো। পবিত্র কোরআন জীবন-সাধনার সাফল্যের জন্যে অষ্টম কর্মসূচী প্রণয়ন করেছে, 'হিজরে জামিল', এর উদ্দেশ্য হলো যখন সত্য বিরোধীরা সত্য-সাধনায় বাধা-বিপত্তির সৃষ্টি করে তখন তাদের পেছনে না পড়ে মঞ্জিলে মকসুদের দিকে এগিয়ে যাওয়াই কর্তব্য। অহেতুক জীবনের মূল্যবান সময় নষ্ট করা উচিত নয়। এজন্যে কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا (সূরা ফোরকান)

"যখন অজ্ঞ লোকেরা আল্লাহর প্রিয় বন্দাগণকে সম্বোধন করে তখন তারা বলে, সালাম"।

এই হলো পবিত্র কোরআনে প্রদত্ত আত্মসংশোধনের আটটি কর্মসূচী। যার বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি উন্নতি সাধন করতে পারে এবং জীবন-সাধনাকে সার্থক ও সুন্দর করতে পারে। পবিত্র কোরআনের এ মহান শিক্ষা গ্রহণ এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের অনুসরণের মাধ্যমেই একদিন মুসলিম জাতির অভ্যুত্থান হয়েছিল এবং বিশ্বের বিস্ময় ইসলামী ইন্‌কেলাব সৃষ্টি হয়েছিল। আজও সে পথ রয়েছে উন্মুক্ত।

আজও পবিত্র কোরআন রয়েছে সম্পূর্ণ সংরক্ষিত, আজও সারা বিশ্বে পবিত্র কোরআন হলো সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ, আজও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শ রয়েছে সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, আজকের মুসলিম সমাজ পবিত্র কোরআনের মর্মবাণী থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। পৃথিবীর বহু ভাষায় এ পর্যন্ত পবিত্র কোরআনের তরজমা এবং তফসীর প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তফসীরের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় যে দৈন্য রয়েছে, তা অনস্বীকার্য। কয়েকটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু অত্যন্ত বেদনাদায়ক বিষয় এই যে, বাংলা ভাষায় আজও পবিত্র কোরআনের কোন মৌলিক, বিস্তারিত এবং প্রামাণ্য তফসীর গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়নি।

মূলতঃ এ কারণেই আমার অযোগ্যতার উপলব্ধি থাকা সত্ত্বেও ৮০-এর দশকের শুরু থেকে তফসীরে নূরুল কোরআনের এ সাধনায় আত্মনিয়োগ করি। আলহামদুলিল্লাহ! আজ এ মহান গ্রন্থের এয়োদশ খন্ড পেশ করার তওফিক পেয়েছি। এটি আল্লাহ পাকের অনন্ত করুণা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এজন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে পেশ করি সেজদায়ে শোকরানা এবং এ মহান গ্রন্থ পরিপূর্ণ করার তৌফিকের জন্যে দু'হাত তুলে মোনাজাত করি। পাঠক বৃন্দের খেদমতেও এ উদ্দেশ্যে দোয়ার দরখাস্ত করি। হে আল্লাহ! কবুল কর এ সাধনা, হে আল্লাহ! দয়া কর আমাদের উপর, আমীন।

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

বিনীত

মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

সূচীপত্র

১। পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	২
২। আধ্যাত্মিক সাধনার ফলশ্রুতি	৩
৩। কারাগার থেকে রাজমহলে	৬
৪। দোষনীয় নয়	৮
৫। আল্লাহ পাকের রহমত	১০
৬। জুলায়খার আরো কিছু ঘটনা	১১
৭। ক্ষমতা গ্রহণের পর মিশরের অবস্থা	১৩
৮। পরম উদারতার দৃষ্টান্ত	২০
৯। তদবীর ও তকদীর	২৯
১০। উম্মতে মোহাম্মদীয়ার বৈশিষ্ট্য	৫৫
১১। একটি প্রশ্ন	৫৬
১২। জবাব	৫৬
১৩। প্রিয়নবী (দঃ)-এর সৌন্দর্য	৫৮
১৪.। মাসায়েলুল কোরআন	৫৯
১৫। শানে নজুল	৬৫
১৬। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা	৬৫
১৭। হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর চিঠি	৬৮
১৮। জীবন-সাধনার সাফল্য	৭১
১৯। পিতার নয়ন যুগলে জামাটি রাখ	৭৪
২০। প্রেরিত জামাটির বৈশিষ্ট্য	৭৪
২১। বিস্ময়কর ঘটনা	৭৫
২২। হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর মোযেজা	৭৬
২৩। হযরত ওমর (রাঃ)-এর কারামাত	৭৬
২৪। অচিরেই আমি ক্ষমা প্রার্থনা করব	৮০
২৫। হযরত ইয়াকুব (আঃ) মিশরে	৮১
২৬। স্বপ্ন হলো সত্য	৮৪
২৭। আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম করুণা	৮৬
২৮। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর উদারতা	৮৬
২৯। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সম্পর্কে আরো কিছু কথা	৯০
৩০। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর দাফন	৯১
৩১। সবচেয়ে বড় গুনাহ	৯৬
৩২। সূরা রা'দ প্রসঙ্গে	১০৮
৩৩। পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক	১০৯

৩৪। আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের দলিল	১১০
৩৫। নবুওয়্যতের প্রতি অবিশ্বসীদের জবাব	১১৮
৩৬। পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	১২৭
৩৭। শানে নজুল	১৪৩
৩৮। মনের শান্তি আল্লাহ্র স্মরণে	১৭০
৩৯। তুবা'র ব্যাখ্যা	১৭১
৪০। শানে নজুল	১৭৪
৪১। আয়াতের মর্মকথা	১৭৯
৪২। শানে নজুল	১৮১
৪৩। আয়াতের মর্মকথা	১৯৩
৪৪। যা ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করে	১৯৪
৪৫। সন্দেহ খন্ডন	২০১
৪৬। সূরা ইব্রাহীম প্রসঙ্গে	২০৫
৪৭। পবিত্র কোরআন নাজিল করার উদ্দেশ্য	২০৬
৪৮। কঠিন শাস্তি কাফেরদের জন্য	২০৮
৪৯। কাফেরদের একটি সন্দেহ ও তার জবাব	২০৯
৫০। সবর ও তাওয়াক্কুল	২২৬
৫১। তাওয়াক্কুলের তাৎপর্য	২২৬
৫২। কেয়ামতের দিন কাফেরদের কথাবার্তা	২৩৫
৫৩। পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	২৪৩
৫৪। কালেমায়ে তৈয়্যেবার দৃষ্টান্ত	২৪৪
৫৫। আয়াতের মর্মকথা	২৪৭
৫৬। ঈমান ও কুফরের দৃষ্টান্ত	২৪৮
৫৭। মধ্য লোকের অবস্থা	২৫০
৫৮। শানে নজুল	২৫৪
৫৯। শেরকের মূল ভিত্তিতে আঘাত	২৬০
৬০। পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	২৬২
৬১। তৌহীদে বিশ্বাসের আহবান	২৬৩
৬২। দোয়ার আদব	২৬৩
৬৩। একটি প্রশ্ন ও তার জবাব	২৬৫
৬৪। মক্কা শরীফের পবিত্রতা ঘোষণা	২৬৮
৬৫। কেয়ামতের দিন আসমান জমিনের পরিবর্তন	২৮৬
৬৬। সর্তকতা অবলম্বনের নির্দেশ	২৯৪
৬৭। সূরা হিজর প্রসঙ্গে	২৯৬

بسم الله الرحمٰن الرحيم

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

তফসীরে নূরুল কোরআন

এয়োদশ খন্ড | ত্রয়োদশ পারা

وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِىٓ ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىٓ ۚ
إِنَّ رَبِّى غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٣﴾ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِى بِهِۦٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِى ۖ
فَلَمَّا كَلَّمَهُۥ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٤﴾ قَالَ ٱجْعَلْنِى
عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ ۖ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿٥٥﴾ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ
فِى ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءُ ۖ
وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ وَلَأَجْرُ ٱلْءَاخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟
وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ﴿٥٧﴾

তরজমা

(৫৩) আর আমি নিজেকে পাক-পবিত্র বলিনা, মানব মন অবশ্যই মন্দ কর্মপ্রবণ। তবে যাকে আমার প্রতিপালক দয়া করেন সে-ই রক্ষা পায়। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব করুণাময়।

(৫৪) আর রাজা বললো, তাকে আমার নিকট নিয়ে আস, আমি তাকে আমার কাজে বিশেষভাবে নিযুক্ত করতে চাই। এরপর রাজা যখন তাঁর সাথে কথা বললো, তখন রাজা বললো, আজ থেকে তুমি আমাদের নিকট অত্যন্ত মর্যাদাবান এবং অতীব বিশ্বস্ত।

(৫৫) ইউসুফ বললেন, আমাকে দেশের অর্থ-সম্পদের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করুন, নিশ্চয় আমি সুরক্ষক এবং বিশেষ অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন।

(৫৬) আর এভাবেই আমি ইউসুফকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করি। সে যেখানে ইচ্ছা স্থান লাভ করতে পারতো, আমি যাকে ইচ্ছা তার প্রতি দয়া করি, আর নেককারদের শ্রমফল বিনষ্ট করিনা।

(৫৭) আর যারা মোমেন এবং মুত্তাকী তাদের জন্যে আখেরাতের পুরস্কারই উত্তম।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّىْ لَمْ اَخُنْهُ بِالْغَيْبِ

এতে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বক্তব্য রয়েছে, আমি এজন্যে তদন্তের দাবী করেছি যেন এ সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় যে, আমি আজীজের অনুপস্থিতিতে কোন প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা করিনি, অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর পবিত্রতা এবং নিঃস্কলংকতা প্রমাণ করার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। কিন্তু এ কথায় কোন লোক সন্দেহ করতে পারে যে, এতে রয়েছে অহংকার এবং আত্মগরিমার ভাব। তাই হযরত ইউসুফ (আঃ) এ সন্দেহ দূরীভূত করার লক্ষ্যে বলেছেন, আমার পবিত্রতা এবং নিঃস্কলংকতার কথা প্রমাণ করার মধ্যে অহংকার এবং আত্মগরিমা উদ্দেশ্য নয়; বরং এতে রয়েছে আল্লাহ পাকের শোকর আদায়ের ইচ্ছা। আমার চরিত্রের পবিত্রতা এবং মাহাত্মে আমার নিজের কোন গর্ব বা কৃতিত্ব নেই। এটি নিতান্ত আল্লাহ পাকের দান ব্যতীত আর কিছুই নয়। আল্লাহ পাক দয়া করে আমাকে রক্ষা করেছেন বলেই আমি রক্ষা পেয়েছি। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَآ اُبَرِّئُ نَفْسِىْ ۚ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌۢ بِالسُّوْٓءِ

আর আমি নিজেকে পাক-পবিত্র মনে করিনা, মানব-মন অবশ্যই মন্দ কর্ম প্রবণ। অর্থাৎ আমি গর্ব করে একথা দাবী করিনা যে আমার দ্বারা কোন অন্যায় আচরণ অসম্ভব। কেননা, মানব প্রবৃত্তি স্বভাবগত ভাবেই মন্দ কার্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। মানুষের প্রবৃত্তি মানুষকে মন্দ কাজের দিকে ধাবিত করে, কু-প্রবৃত্তি তার প্রতি আক্রমণ করে, যদি আল্লাহ পাক দয়া করে তাকে কু-প্রবৃত্তির আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন তাহলেই সে রক্ষা পায়।

তফসীরকারগণ বলেছেন, হযরত ইউসুফ (আঃ) সর্বপ্রথম তাঁর চরিত্রের পবিত্রতা এবং নিঃষ্পাপ হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন এবং তা প্রমাণ করেছেন, এরপর তিনি আল্লাহর নবী হিসাবে স্বভাবগত বিনয়ের সঙ্গে তাঁর নিঃষ্পাপ হওয়ার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন, কারো চরিত্রের পবিত্রতা বা নিঃষ্পাপ ভাবমূর্তি তার নিজস্ব নয়; বরং এটি আল্লাহ পাকের দান। আল্লাহ পাকের রহমত এবং দানে ধন্য না হলে এবং আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হেফাজতের ব্যবস্থা না করা হলে কোন লোক পাপাচার থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেনা। অতএব, মানুষের কর্তব্য হলো গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারলে আল্লাহ পাকের

শোকর আদায় করা।

কেননা, আল্লাহ্ পাকের রহমত এবং হেফাজত না হলে কেউ গুনাহ্ থেকে বাঁচতে পারেনা, তাই আলোচ্য আয়াতে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর এ বক্তব্য রয়েছে যে, মানুষের মন পাপ-প্রবণ, কিন্তু আল্লাহ্ পাক যাকে দয়া করে রক্ষা করেন সে-ই রক্ষা পায়। যদি আল্লাহ্ পাক আমাকে রক্ষা না করতেন তবে আমার অবস্থা অন্য মানুষের ন্যায় হত।[১]

আধ্যাত্মিক সাধনার ফলশ্রুতি

এখানে উল্লেখ্য, মানুষের মধ্যে যে পাপ-প্রবৃত্তি তথা নফসে আম্মারা থাকে, যদি তওবা করে আধ্যাত্মিক সাধনা করা হয়, তবে নফসে আম্মারা নফসে লাওয়ামায় পরিণত হয়। অর্থাৎ মানুষ তখন গুনাহর কাজের ব্যাপারে ঘৃণা বোধ করে এবং নাফরমানীর কাজ থেকে বিরত থাকতে প্রয়াসী হয়, তখন আল্লাহ্ পাক তার কৃত গুনাহ্ সমূহ ক্ষমা করেন। এমনি অবস্থায় যখন আধ্যাত্মিক সাধনা অব্যাহত থাকে আর পর্যাক্রমে আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভের পথ তথা সুলুকের পথ সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করতে থাকে, তখন নফসে লাওয়ামা নফসে মুতমাইন্নায় পরিণত হয়। অবশ্য এজন্যে চাই সবর, আন্তরিকতা এবং একটানা সাধনা। এ সাধনার ফলশ্রুতি স্বরূপ মানুষ অন্যায়-অনাচারকে ঘৃণা করে এবং পাপাচার থেকে বিরত থাকে। তখন সৎকাজ বা নেক আমল মানুষের স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর এমন লোকদের উদ্দেশ্যে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক জান্নাতে প্রবেশের আদেশ দিয়েছেন।

এরশাদ হয়েছেঃ

يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ○ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً
مَّرْضِيَّةً ○ فَٱدْخُلِى فِى عِبَٰدِى ○ وَٱدْخُلِى جَنَّتِى

“হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট এভাবে ফিরে চল যে, তুমি তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনিও তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। এরপর তুমি আমার বিশিষ্ট বন্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর”।

إِنَّ رَبِّى غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○

নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়ালু। আল্লাহ্ পাক ক্ষমা করাকে পছন্দ করেন। যারা তওবা করে ক্ষমাপ্রার্থী হয় তিনি তাদেরকে ক্ষমা করেন যেমন কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ يَٰعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن
رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৪, পৃঃ ৩৯-৪০

الرَّحِيمُ ○

"(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, হে আমার বন্দাগণ! তোমরা যারা পাপাচারের কারণে নিজেদের প্রতি জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান"।

আল্লাহ্ পাক ক্ষমাপ্রার্থীকে ক্ষমা করে নফসে আম্মারা থেকে নফসে লাওয়ামায় উন্নীত করেন। আর তিনি পরম দয়ালু বলেই আম্বিয়ায়ে কেরামকে নফসে মুতমাইন্না দান করেন। আর যাদেরকে নফসে মুতমাইন্না দান করেন তাঁদেরকে জান্নাতের জন্যে আহ্বান করা হয়।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা তার প্রতি দয়া করেন এবং তাকে পাপাচার থেকে রক্ষা করেন। অথবা এর অর্থ হলো যে গুনাহ্গার সে আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হলে তিনি তাকে ক্ষমা করেন। আর যে তাঁর নিকট দয়া এবং রহমতের প্রার্থী হয় তিনি তার প্রতি দয়া করেন।[২]

আল্লামা এবনে কাসীর (রহঃ) এবং হাফেজ এবনে তাইমিয়া এ আয়াতের অন্য ব্যাখ্যা করেছেন। তারা বলেছেনঃ

ذٰلِكَ لِيَعْلَمَ اَنِّىْ لَمْ اَخُنْهُ থেকে আলোচ্য আয়াত اِنَّ رَبِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ পর্যন্ত একথাগুলো হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নয়; বরং এগুলো জুলায়খার উক্তি। তাঁরা বলেছেন যে এর অর্থ হলো হযরত ইউসুফ (আঃ) নন; বরং জুলায়খাই মুক্ত কণ্ঠে তার অপরাধ স্বীকার করেছে এবং সকলের সম্মুখে সে বলেছে, আমি আমার অপরাধ স্বীকার করছি আর এ অপরাধের স্বীকৃতির মাধ্যমে আজীজকে আমি বোঝাতে চাই যে তার অজ্ঞাতে এর চেয়ে বেশি কোন অপরাধ আমি করিনি, যদি আমার দ্বারা এর চেয়ে বেশি কোন অপরাধ হতো তবে তা এতদিন গোপন থাকতো না। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমি ইউসুফকে আকৃষ্ট করতে সচেষ্ট হয়েছি, তাঁকে বারে বারে বিভিন্নভাবে প্ররোচনা দিয়েছি, তাঁর সংযমের বাধ ভেঙ্গে ফেলার সকল চেষ্টা করেছি কিন্তু সফল হইনি। তাঁর মনে আমার প্রয়াস সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। তাঁব মনে এতটুকু রেখাপাত করেনি। তাই আমি নিজেকে নির্দোষ বলিনা, সমাজের আর দশজনের ন্যায় আমার মনেও পাপ প্রবণতা রয়েছে। আল্লাহ্ পাক দয়া করে যাকে রক্ষা করেন সে-ই রক্ষা পায় আর কেউ নয়।[৩]

আল্লামা এবনে জওজী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, যদিও কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন, এ আয়াত সমূহের বক্তব্য হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নয়; বরং

১। তফসীরে মাজেদী, খন্ড-৬, পৃঃ ৪৯৭
২। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ১৬৬
৩। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু), পারা-১৩, পৃঃ ২

জুলায়খার, কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো, এ আয়াত সমূহে যে বর্ণনা-শৈলী রয়েছে তা এ কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে কথাগুলো হযরত ইউসুফ (আঃ)-এরই। কেননা, এতে রয়েছে অত্যন্ত বিনয় যা আল্লাহর নবী হযরত ইউসুফ (আঃ)-এরই বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক, আর যেহেতু জুলায়খা তখন মূর্তিপূজক ছিল তাই তার ব্যাপারে এমন কথাবার্তা কল্পনাতীত।[১]

আবু হাইয়ান (রহঃ) বলেছেন, এ উক্তিগুলো মূলতঃ জুলায়খারই। তবে তাঁর মতে, لم اخنه এবং ليعلم এর সর্বনামের উদ্দেশ্য আজীজ নয়; বরং হযরত ইউসুফ (আঃ) অর্থাৎ জুলায়খা প্রকাশ্যে তার অপরাধ স্বীকার করেছে যে, আমি অপরাধী, আমি নিজেকে পবিত্র বলিনা কেননা, মানুষের কুপ্রবৃত্তি মানুষকে অন্যায় কাজে ধাবিত করে, তবে যার প্রতি আল্লাহ পাক দয়া করেন তাকে তিনি রক্ষা করেন। যেমন হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে আল্লাহ পাক রক্ষা করেছেন। আর আমি আমার অপরাধ এজন্যে স্বীকার করছি যেন ইউসুফ (আঃ) জানতে পারেন যে তাঁর অনুপস্থিত কালে অর্থাৎ তাঁর কারাজীবনের সময় আমি তাঁর প্রতি কোন প্রকার দোষারোপ করিনি, তাই আজ আমি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করছি যে, আমিই অপরাধী, তিনি নন। তিনি নিঃষ্পাপ, নিঃষ্কলংক, তিনি পবিত্র।[২]

আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রহঃ) "তফসীরে মাআ'রেফুল কোরআনে" এবং আল্লামা ফাতেহ মোহাম্মদ তায়েব লখনবী (রঃ) "খোলাসাতুত তাফাসীরে" লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত সমূহে যে কথা যেভাবে পেশ করা হয়েছে তা এমন একজন নারীর হতে পারেনা যে পাপ কার্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। এর প্রত্যেকটি বাক্যে যে নূর রয়েছে এবং যে বিনয় রয়েছে তা আল্লাহ পাকের রহমত এবং তওফিকের পরিচয় বহন করে। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে কথাগুলো হযরত ইউসুফ (আঃ)-এরই।[৩]

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي

"রাজা বললো, আমি তাকে আমার কাজে বিশেষভাবে নিযুক্ত করতে চাই"।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নিঃষ্পাপ ভাবমূর্তি এবং অসাধারণ নৈতিক গুণাবলী, তাঁর অসামান্য জ্ঞান এবং সততা, সাধুতা এবং পবিত্রতা সম্পর্কে যখন মিশরের রাজা রাইয়ান অবগত হলো তখন সে তার দরবারের লোকদেরকে বললো, তোমরা তাঁকে আমার নিকট নিয়ে আস, আমি তাঁকে আমার বিশেষ পরামর্শদাতা হিসেবে নিযুক্ত করতে চাই। আজীজ বা কারো মাধ্যমে নয়; বরং সরাসরি আমার কাছেই তাঁকে পেতে চাই।

আবদুল হাকাম কালবীর সূত্রে আবু সালেহের মাধ্যমে হযরত আবদুল্লাহ এবনে

১। জাদুল মাসীর, কৃত এবনে জওজী, খন্ড-৪, পৃঃ ২৪২
২। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃঃ ৩১৩
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ১৬৫
৩। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৪, পৃঃ ৪১
খোলাসাতুত তাফাসীর, খন্ড-২,পৃঃ ৪৩৯
তফসীরে কবীর, খন্ড-১৮, পৃঃ ১৫৭

আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। রাজার দূত হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নিকট পৌঁছে আবেদন করলো যে, আপনি কারাগারের পোশাক পরিহার করুন এবং নতুন পোশাক পরিধান করুন।

এবনে আবি শায়বা এবং এবনুল মুনজের ফরিদ আমীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত ইউসুফ (আঃ) যখন আজীজকে দেখলেন তখন তিনি এ দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তার তরফ থেকে কল্যাণের স্থলে তোমার কল্যাণ কামনা করি। আর তার অকল্যাণ থেকে তোমার আশ্রয় চাই।

আল্লামা বগভী (রহঃ) লিখেছেন, হযরত ইউসুফ (আঃ) দন্ডায়মান হয়ে বন্দীদের জন্যে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! নেককার লোকদের অন্তর সমূহকে তাদের প্রতি দয়াদ্র করে দাও এবং দেশের খবর তাদের নিকট গোপন রেখোনা, এরপর তিনি কারাগার থেকে বের হলেন এবং তার ফটকে লিখে দিলেনঃ এটি হলো জীবিত লোকদের সমাধি, দুঃখ-কষ্টের কেন্দ্র, বন্ধুদের পরীক্ষা এবং শত্রুদের আনন্দিত হওয়ার স্থান। এরপর তিনি কারাগারের ময়লা ধৌত করলেন এবং দেহকে পরিচ্ছন্ন এবং পবিত্র করলেন, অতি সুন্দর পোশাক পরিধান করে রাজ দরবারের দিকে রওয়ানা হলেন।

কারাগার থেকে রাজমহলে

ওয়াহাব এবনে মোনাব্বেহ (রঃ) বর্ণনা করেন, হযরত ইউসুফ (আঃ) রাজ মহলের প্রধান ফটকের সম্মুখে পৌঁছে বলেন, আমার পরওয়ারদেগার আমার জন্যে যথেষ্ট, তিনি আমাকে কোন সৃষ্টির মুখাপেক্ষী করবেন না, যে তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করে সে বিজয় লাভ করে। সব প্রশংসা তাঁরই, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। এরপর তিনি রাজমহলে প্রবেশ করেন এবং রাজার সম্মুখে গিয়ে দোয়া করেন, হে আল্লাহ! আমি তার কল্যাণ চাইনা, চাই তোমার কল্যাণ, তার এবং অন্যান্যদের অকল্যাণ থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করি। রাজা যখন হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর দিকে লক্ষ্য করলো, তখন তিনি তাকে আরবী ভাষায় সম্ভাষণ জানালেন। রাজা জিজ্ঞাসা করলো, এ কোন্ ভাষা? তিনি বললেন, আমার পিতৃব্য ইসমাইল (আঃ)–এর ভাষা। এরপর তিনি হিব্রু ভাষায় তার জন্যে দোয়া করলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করলো, এ কোন্ ভাষা? হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেন, এটি আমার পিতা-পিতামহের ভাষা। মিশরের রাজা রাইয়ান যদিও সত্তরটি ভাষায় কথা বলতে পারতো কিন্তু সে আরবী এবং হিব্রু জানতো না। রাজা যে ভাষায় কথা বলতো হযরত ইউসুফ (আঃ)-সে ভাষায়ই তাকে জবাব দিতেন। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বয়স তখন ছিল ৩০ বছর । রাজা তাঁর গুণাবলী দেখে এবং তাঁর জ্ঞান-গর্ভ কথাবার্তা শ্রবণ করে অত্যন্ত আশ্চর্যন্বিত হয় এবং তাঁকে তার অতি নিকটে আসন গ্রহণের ব্যবস্থা করে।

فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِيْنٌ اَمِيْنٌ ○

"পরে যখন তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হয় তখন রাজা বললো, আজ থেকে আপনি

আমাদের নিকট অত্যন্ত মর্যাদাবান এবং অতি বিশ্বস্ত”।

বর্ণিত আছে, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর গুণাবলীর কথা শ্রবণ করে মিশরের রাজা পূর্বেই তাঁর ভক্ত ও গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েছিল। আর সরাসরি আলোচনা করার পর তাঁর প্রতি রাজার ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং আস্থা শতগুণে বৃদ্ধি পেল। তাই সে বললো, আজ আপনি আমাদের নিকট অত্যন্ত সম্মানিত, অতি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং পরম বিশ্বস্ত। হযরত শাহ্ আবদুল কাদের (রহঃ) লিখেছেন, তখন থেকে আজীজের পরিবর্তে মিশরের রাজার সাথে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়।

আল্লামা বগভী লিখেছেন, রাজা হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে বললেন, আমি আমার স্বপ্নটি আপনার ভাষায় শ্রবণ করতে চাই, তিনি বললেন, বেশ ভাল, শ্রবণ করুন। হে রাজা! আপনি স্বপ্নে দেখেছেন, সাতটি সাদা বর্ণের অতি সুন্দর গাভী নীল নদ থেকে বের হয়ে এসেছে। নীল নদের তীর থেকে বের হয়ে তারা আপনার সম্মুখে এসেছে, তারা দুগ্ধে পরিপূর্ণ ছিল। এরপর অত্যন্ত জীর্ণ শীর্ণ আরও সাতটি গাভী নীলের কাদা থেকে বের হয়ে আসে। এগুলো ছিল ক্ষুধার্ত, পেট পিঠ একাকার হয়েছিল। তাদের নিকট দুগ্ধও ছিলনা। চতুঃস্পদ জন্তুর ন্যায় তাদের নাক ছিল, চতুঃস্পদ হিংস্র জন্তুর ন্যায় তারা মোটা তাজা গাভীগুলোকে চিরে ফেললো, চামড়া ছিড়ে ফেরলো এবং গোশ্‌ত খেয়ে ফেললো। এরপর আরো সাতটি কালো বর্ণের শীষ দেখা গেল। এগুলোর বুনিয়াদ ছিল কাদা ও মাটির মধ্যে। আপনি এ তামাশা দেখে আশ্চর্যন্বিত হচ্ছিলেন। কেননা, এ সবগুলোর বুনিয়াদ এক। আর তা পানির মধ্যে রয়েছে অথচ শীষ একটি সবুজ ফসলে ভরা আরেকটি কালো ও শুষ্ক। এ এক আশ্চর্য দৃশ্য! হঠাৎ দেখা গেল একটি বাতাস বয়ে যায়। যে কারণে শুষ্ক শীষগুলোর পাতাগুলো সবুজ শীষের উপর পড়ে এবং সবুজ শীষগুলোতে আগুন ধরে যায় এবং পুড়ে কালো হয়ে যায়। এ স্বপ্ন দেখে আপনি জাগ্রত হলেন এবং অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হলেন। তখন রাজা বললো, আল্লাহর শপথ! যদিও স্বপ্নটি অত্যন্ত বিস্ময়কর ছিল, কিন্তু তার বিস্ময়কর অবস্থা এ বিবরণ থেকে অধিকতর নয় যা আমি আপনার নিকট থেকে শ্রবণ করলাম। এ স্বপ্ন সম্পর্কে আপনি আমাকে কি পরার্শ দেন? তিনি বললেন, আমার অভিমত এই যে, সাত বছর ফসল উৎপন্ন হবে, এই সাত বছর আপনি অধিক পরিমাণে জমি চাষ করিয়ে যথাসাধ্য অধিকতর ফসল ফলানোর চেষ্টা করুন এবং যে ফসল ফলে তার গাছ এবং শীষসহ জমা করে রাখুন। যাতে করে দুর্ভিক্ষের সময় এই ফসল আপনাদের কাজে লাগে আর ফসলের গাছগুলো ভুষি হিসেবে চতুঃস্পদ জন্তুর খাদ্য হয়। আর মানুষকে আপনি আদেশ দিন যে প্রত্যেকে যেন তার উৎপন্ন ফসলের এক পঞ্চমাংশ ভিন্নভাবে সঞ্চয় করে রাখে। এভাবে প্রত্যেক বছরে উৎপন্ন ফসলের এক পঞ্চমাংশ ফসল জমা হতে থাকবে। এতে যে খাদ্যের মওজুদ হবে তা মিশর ও তার উপকণ্ঠের অধিবাসীদের জন্যে যথেষ্ট হবে। এরপর যখন দূর-দূরান্ত থেকে লোকেরা আপনার নিকট খাদ্য-দ্রব্যের অন্বেষণে হাযির হবে, তখন আপনি অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে তাদেরকে খাদ্য বস্তু সরবরাহ করবেন। ফলে আপনার নিকট এত অর্থ জমা হবে যা আপনার পূর্বে মিশরের কোন রাজার

নিকট জমা হয়নি। তখন রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, এ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন কার দ্বারা হবে? কে খাদ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করবে? সেগুলো কে বিক্রয় করবে? কে আমার পক্ষ থেকে এ কাজটি করবে?

قَالَ اجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَآئِنِ الْاَرْضِ ۚ اِنِّىْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ۝

"ইউসুফ বললেন, আমাকে মিশরের অর্থ-ভান্ডারের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ করুন। আমি নিশ্চয় এর সংরক্ষণকারী এবং আমি বিষয়টি সম্পর্কে অবগত"।

হযরত ইউসুফ (আঃ) এভাবে নিজের আমানতদারী, বিশ্বস্ততা এবং অভিজ্ঞতার কথা বললেন। আর এজন্যে দায়িত্ব অর্পণের কথা বললেন যাতে করে আল্লাহর বন্দাদের মাঝে আল্লাহর বিধান জারী হতে পারে এবং সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এবং সুবিচার কায়েম করতে পারেন। মূলতঃ এ দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যেই আম্বিয়ায়ে কেরামের আগমন হয়। তিনি জানতেন, তিনি ব্যতীত এ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা করার যোগ্যতা অন্য কারো নেই। তাই তিনি আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁকে এ পদ প্রদানের কথা নিজেই বলেছেন। এটি পদ বা ক্ষমতা লাভের লোভে নয়; বরং আল্লাহর বন্দাদের সেবা করার সদিচ্ছা।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, খোলাফায়ে রাশেদীন রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। তাঁদের এ সাধনার উদ্দেশ্যেও ছিল আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ। আর এ পর্যায়ে একথাও উল্লেখ্য, হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে হযরত মুআবিয়া (রাঃ)-এর যে বিবাদ হয়েছিল তা এ কারণে যে, হযরত আলী (রাঃ) হযরত মুআবিয়া (রাঃ) থেকে যোগ্যতর ছিলেন। কেননা হযরত মুআবিয়া (রাঃ) থেকে হযরত আলী (রাঃ) নিজেকে অধিকতর নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম ছিলেন এবং আল্লাহ পাকের বিধান সুপ্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারেও হযরত আলী (রাঃ) হযরত মুআবিয়া (রাঃ) থেকে অধিকতর যোগ্য ছিলেন। মূলতঃ সঠিক ভাবে আল্লাহ পাকের বিধান জারি করার লক্ষ্যেই হযরত আলী (রাঃ) ক্ষমতা পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন।[১]

ইমাম বয়জাভী (রহঃ) লিখেছেন, পদ লাভের জন্যে নিজের পক্ষ থেকে হযরত ইউসুফ (আঃ) যে প্রস্তাব দিয়েছেন তার কারণ হয়তো এই, তিনি উপলব্ধি করেছেন যে বাদশাহ তাঁকে কোন পদে অধিষ্ঠিত করতে চান। এজন্যে তিনি পদটি নির্দিষ্ট করে দেন এবং এমন কাজের দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব দিলেন যা আপামর জনসাধারণের জন্যে ছিল অত্যন্ত উপকারী এবং অতীব প্রয়োজনীয়। জনগণের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যেই তিনি এ পদ প্রদানের কথা বলেছেন।

দোষণীয় নয়

এ আয়াত দ্বারা একথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কোন মানুষের যখন এ আত্মবিশ্বাস

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ১৬৭

থাকে যে সে রাষ্ট্রের কোন বিশেষ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হবে, তখন তার যোগ্যতার কথা প্রকাশ করায় এবং উক্ত পদ চাওয়ায় দোষণীয় কিছু নেই।

দ্বিতীয়তঃ একথাও প্রমাণিত হচ্ছে যে, বাদশাহ কাফের হোক বা জালেম তার তরফ থেকে কোন পদে অধিষ্ঠিত হওয়া বা কোন কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করা বৈধ। তবে এজন্যে দু'টি শর্ত রয়েছে। ঐ কাজটি জনসাধারণের জন্যে উপকারী হতে হবে এবং ঐ ব্যক্তির মধ্যে পদ লোভ থাকবে না।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এ কথাও বর্ণিত আছে যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) তখন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেননি; বরং রাজার উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। রাজা তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করে আদেশ জারি করতো, কোন ব্যাপারেই তাঁর সাথে দ্বিমত করতো না, তাঁর কথাই মেনে নিত।

আল্লামা বগভী (রহঃ) লিখেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক আমার ভাই ইউসুফের (আঃ) প্রতি দয়া করুন। যদি তিনি

اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ

না বলতেন তবে রাজা তাঁকে তখনই ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতেন। কিন্তু একথাটি বলার কারণে সে এ ব্যাপারে এক বছর বিলম্ব করেছে। এ সময় হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর গৃহেই অবস্থান করেছেন।

আল্লামা বগভী (রহঃ) অন্য সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যে দিন হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর হাতে ক্ষমতা প্রদানের প্রস্তাব দিয়েছেন, ঠিক তার এক বছর পর বাদশাহ তাঁকে মুকুট পরালেন এবং রাজকীয় তলোওয়ার তাঁকে দিলেন, হিরা-জহরত খচিত সিংহাসন তাঁর জন্যে প্রস্তুত করা হলো। সিংহাসনের চারপার্শ্বে রেশমী পর্দা লাগানো হলো, সিংহাসনটি ত্রিশ হাত লম্বা এবং দশহাত চওড়া ছিল। এরপর মুকুট পরিধান করে তিনি জন-সমক্ষে আগমন করলেন। গৌরবর্ণ, চন্দ্রের ন্যায় অতি সুন্দর ছিল তাঁর চেহারা, যেহেতু দেহ অতি সুন্দর ছিল তাই মুখমন্ডলের বর্ণের প্রতিচ্ছবি তাঁর দেহে দেখা যেত। এমনি অভিনব অপূর্ব শানে জাঁকজমকপূর্ণ সিংহাসনে হযরত ইউসুফ (আঃ) উপবিষ্ট হলেন এবং রাজ দরবারের সকল কর্মচারী তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলো। এভাবে তাঁর অভিষেক হয়, মিশরের বাদশাহ রাইয়ান সমস্ত ক্ষমতা হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে দিয়ে নিজে তার বাসস্থানে চলে যায়। বর্ণিত আছে, রাজা কেতফীরকে তার পদ থেকে অব্যাহতি দেয় এবং হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে তার স্থানে নিযুক্ত করে। এ বর্ণনা এবনে এসহাকের।

এবনে জায়েদ বর্ণনা করেন, মিশরের বাদশাহ রাইয়ানের নিকট অনেক ধন-রত্ন ছিল, সে ঐ সমস্ত ধন-রত্ন ইউসুফ (আঃ)-এর নিয়ন্ত্রণে দিয়ে দেয়।

এবনে জরীর, এবনে আবি হাতেম এবনে এসহাকের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ সময় কেতফীরের মৃত্যু হয় এবং তার স্ত্রী জুলায়খার সঙ্গে রাজা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বিয়ের ব্যবস্থা করে, বিয়ের পর হযরত ইউসুফ (আঃ) জুলায়খাকে বলেন, এ ব্যবস্থাটি কি উত্তম নয়? সে পন্থা থেকে যা তুমি চেয়েছিলে। তখন তিনি বলেন, হে সত্যবাদী! আপনি আমাকে তিরস্কার করবেন না। আপনি অবগত আছেন যে, সৌন্দর্য, সম্পদ, ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি সবই আমার ছিল। কিন্তু আপনাকে দেখার পর আমি সবর অবলম্বন করতে পারিনি। বর্ণিত আছে, জুলায়খার ঘরে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর দু' সন্তান "আফ্রায়েম" এবং "মাইসা" জন্মগ্রহণ করে।[১]

এভাবে মিশরে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَكَذٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِى الْاَرْضِ ۚ يَتَبَوَّاُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ۭ

"আর এভাবে (বিস্ময়কর পন্থায়) আমি ইউসুফকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব প্রদান করি, সে যেখানে ইচ্ছা সেখানে স্থান লাভ করতে পারে। আমি যাকে ইচ্ছা তাকে রহমত দান করে থাকি, আর আমি নেককারদের বিনিময় বিনষ্ট করিনা"।

আল্লাহ পাকের রহমত

অর্থাৎ যেভাবে হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে আল্লাহ পাক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছেন, তা যেমন বিস্ময়কর তেমনি অভূতপূর্ব। বৈমাত্রের ভাইয়েরা যাঁকে অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করেছিল, যাঁকে মিশরের বাজারে বিক্রয় করা হয়েছিল, যাঁকে কারাগারে বহুদিন বন্দী জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছিল, আল্লাহ পাক তাঁকে কত বিস্ময়কর পন্থায় সে দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছেন, শুধু তাই নয়; সমগ্র মিশরের যেখানে ইচ্ছা সেখানে অবস্থান করতে পারেন- এ অধিকারও তাঁকে দেয়া হয়েছে। কেননা, তিনিই ছিলেন মিশরের শাসন ক্ষমতায় সর্বেসর্বা। সমগ্র মিশরবাসী ছিল তাঁর ভক্ত-অনুরক্ত, তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। নিঃসন্দেহে এসব কিছুই হলো আল্লাহ পাকের রহমত। আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে তাঁর রহমত দ্বারা ধন্য করেন, কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারেনা।

وَلَا نُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝

"আর আমি নেককারদের সওয়াব বিনষ্ট করিনা"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে "রহমত" অর্থ নেয়ামত, আর اجر শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে সৎকাজের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিকে এবং المحسنين শব্দটির ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), ওহাব এবনে

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ১৬৭-৬৯

মোনাব্বেহ (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো সবর অবলম্বনকারী।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, হযরত ইউসুফ (আঃ) সর্বদা মিশরের রাজা রাইয়ান এবনে লবীদকে ইসলাম গ্রহণের আহবান জানাতেন। অবশেষে সে তাঁর আহবানে সাড়া দেয় এবং ইসলাম গ্রহণ করে আর তার সঙ্গে আরো অনেকে মুসলমান হয়।[১]

তফসীরকারগণ লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে চারটি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে (এক) হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে আল্লাহ পাক মিশরে সু-প্রতিষ্ঠিত করেছেন-তথা মিশরের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছেন। (দুই) আল্লাহ পাক তাঁকে বিশেষ রহমত দান করেছেন অর্থাৎ তাঁকে নবুওয়্যতের উচ্চ মর্যাদা এবং ফজিলত দান করেছেন। (তিন) এহসান তথা আল্লাহ পাকের বন্দেগীর সঠিক হক্ব আদায়ের তওফিক তাঁকে দিয়েছেন অর্থাৎ জুলায়খার ঘটনায় হযরত ইউসুফ (আঃ) আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। (চার) আখেরাতের মহান পুরস্কার যা আম্বিয়ায়ে কেরামের জন্যে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট রয়েছে, এ সমস্ত নেয়ামত আল্লাহ পাক হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে প্রদান করেছেন।[২]

জুলায়খার আরো কিছু ঘটনা

মওলানা ফতেহ মোহাম্মদ তায়েব লখনবী (রহঃ) তাঁর "খোলাসাতুত্যাফাসীর" গ্রন্থে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর মিশরের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পরের একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি জুলায়খা সম্পর্কে। জুলায়খার স্বামী কেতফীরের মৃত্যু হলে স্বাভাবিক কারণেই সে অসহায় হয়ে পড়ে। এর পাশাপাশি তার আত্মীয়-স্বজন ইয়েমেনের শাসনকর্তা দুশমনদের দ্বারা নিহত হয়। পরিণামে সে আরো বেশি অসহায় হয়ে পড়ে। অর্থ-সম্পদও নিঃশেষ হয়ে যায়। সে দারিদ্র-প্রপীড়িত অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করতে বাধ্য হয়, তারা ছিল মূর্তি পূজক। তাই সে প্রস্তর-নির্মিত মূর্তির সম্মুখেই ইউসুফ (আঃ)-এর জন্যে আরাধনা করত। কিন্তু মূর্তি যেভাবে কোন দিন কারো আকাংক্ষা পূর্ণ করেনি এবং তার সকল পূজারীকে সে নিরাশ করেছে, ঠিক সেভাবে জুলায়খাকেও সে নিরাশ করেছে। এমন অবস্থায় সে মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেছে এবং এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। পূর্বকৃত অন্যায় থেকে তওবা করেছে এবং আল্লাহ পাকের দরবারেই তার বিপদ মুক্তির জন্যে ফরিয়াদ করেছে। অবশেষে আল্লাহ পাকের রহমত তার প্রতি বর্ষিত হয়েছে। একদিনের ঘটনা। মিশরের শাসনকর্তা হযরত ইউসুফ (আঃ) কোথাও গমন করছিলেন, দেখা গেল একজন বৃদ্ধা মহিলা উচ্চস্বরে বলছেঃ পবিত্র সেই আল্লাহ পাক, যিনি গোলামকে তাঁর আনুগত্যের কারণে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, আর বাদশাহদেরকে তাদের অপকর্মের কারণে অপমানিত করেছেন।[৩]

একথা শ্রবণ করে হযরত ইউসুফ (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, এই বৃদ্ধা কে? জবাব দেয়া হলো জুলায়খা। হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেন, তাকে দরবারে হাযির করা হোক। এরপর

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ১৬৯
২। খোলাসাতুত তাফাসীর, খন্ড-২,পৃঃ ৪৪০
৩। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু), পারা-১৩, পৃঃ ২-৩

জুলায়খাকে তাঁর দরবারের হাযির করা হলো। সে তার দুর্গতির বিবরণ পেশ করলো। হযরত ইউসুফ (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, এখন তুমি কি চাও?

সে বললোঃ

(১) শোকে-দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে আমার দৃষ্টি শক্তি বিদায় নিয়েছে। আমি আমার দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেতে চাই। হযরত ইউসুফ (আঃ) তার জন্যে দোয়া করলেন, ফলে আল্লাহ পাক তার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিলেন। সে সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুষ্মান হলো। হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে দেখতে পেয়ে তার সকল দুঃখ-যাতনা যেন সে ভুলে গেল।

(২) এরপর সে আরজ করলোঃ আপনি দোয়া করুন যেন আল্লাহ পাক আমার যৌবন ফিরিয়ে দেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) দোয়া করলেন। আল্লাহ পাক তার আরজী মঞ্জুর করলেন।

এরপর সে বললোঃ আপনার নৈকট্য-ধন্য হওয়ার এবং আপনার খেদমত করার সুযোগ দানে বাধিত করুন। হযরত ইউসুফ (আঃ) এ ব্যাপারে নীরব রইলেন। তখন হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আগমন করে বললেন, হে ইউসুফ (আঃ)! আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ "জুলায়খা এতদিন চক্রান্তের মাধ্যমে আপনাকে পেতে চেয়েছিল কিন্তু এখন সে ঈমান এনেছে এবং আমার কাছে তার আকাংক্ষা পূরণের জন্যে আরজী পেশ করেছে। অতএব তুমি তার দরখাস্ত মঞ্জুর কর"। এরপর হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ সম্পাদিত হয়। হযরত ইউসুফ (আঃ) জুলায়খার জন্যে তাঁর ঘরে একটি এবাদতের স্থান নির্দিষ্ট করে দিলেন। তিনি সেখানে আল্লাহ পাকের এবাদত-বন্দেগীতে মশগুল হলেন।

وَلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ○

আখেরাতের সওয়াব বা শুভ-পরিণতিই তাদের পক্ষে ভাল যারা ঈমান এনেছে এবং সতর্কতা অবলম্বন করেছে অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে, সৎ এবং মহৎ কাজে জীবন অতিবাহিত করে, আল্লাহর নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষা করে চলে, আল্লাহ পাক শুধু যে তাদেরকে দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে সুখ-শান্তি দান করেন তাই নয়; বরং আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীতেও রয়েছে তাদের জন্যে অনন্ত অসীম নেয়ামত। যেহেতু দুনিয়ার নেয়ামত ক্ষণস্থায়ী এবং আখেরাতের নেয়ামত চিরস্থায়ী, তাই প্রকৃত মোমেনের নিকট আখেরাতের নেয়ামতই সর্বাধিক গুরুত্বের অধিকারী। দুনিয়ার সুখ, সম্পদ সে যতই লাভ করুক না কেন, আখেরাতের নেয়ামত লাভের জন্যে সে থাকে কর্মতৎপর এবং উদগ্রীব। আখেরাতের মোকাবেলায় দুনিয়ার নেয়ামতকে সে গুরুত্ব দেয় না। আলোচ্য আয়াতে প্রকৃত মোমেনদের জন্যে রয়েছে বিশেষ সান্ত্বনা।

হযরত শাহ আবদুল কাদের (রহঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত সমূহে বণী ইসরাঈল কিভাবে মিশর এসেছিলো তার বিবরণ স্থান পেয়েছে। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা যেভাবে তাঁকে হিংসা করেছিলো, তাঁর প্রতি বর্ণনাতীত নির্যাতন করেছিলো এবং

তাঁকে দেশ থেকে নির্বাসনে বাধ্য করেছিলো, এতদসত্ত্বেও আল্লাহ পাক তাঁকে সম্মান এবং মর্যাদার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করেছেন এবং তদানীন্তন মিশরের সকল ক্ষমতা তাঁকে দান করেছেন, ঠিক এমননিভাবে মক্কার পৌত্তলিকরা প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) প্রতি যে অকথ্য নির্যাতন-উৎপীড়ন করেছে, অবশেষে একদিন আল্লাহ পাক তাদের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করে তাঁকে সম্মান এবং মর্যাদার উচ্চ শিখরে আরোহন করিয়েছেন। পরবর্তী ঘটনাবলী একথারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে।[১]

এ পর্যায়ে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ দ্বারা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এ স্বাক্ষ্য প্রদান করা হয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) ছিলেন নেককারদের অন্তর্ভুক্ত, তিনি ছিলেন মোত্যাকীন ও মোখলেসীনদের অন্তর্ভুক্ত।[২]

ক্ষমতা গ্রহণের পর মিশরের অবস্থা

বর্ণিত আছে, হযরত ইউসুফ (আঃ) ক্ষমতা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য-দ্রব্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করলেন। খাদ্য-দ্রব্য সংরক্ষণের জন্যে বড় বড় গুদামঘর নির্মাণ করলেন। অধিক পরিমাণে খাদ্য-দ্রব্য উৎপাদনের যাবতীয় বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন, দুর্ভিক্ষের সময়ের জন্যে হযরত ইউসুফ (আঃ) একটি বিরাট আকারের গুদামঘর নির্মাণ করেছিলেন, যা দৈর্ঘে ছিলো ১৫ মাইল এবং প্রস্থেও ছিলো ১৫ মাইল। আপদকালীন সময়ের জন্যে এই বিরাট গুদামে খাদ্য-দ্রব্য সংরক্ষণ করা হয়।[৩]

বর্ণিত আছে যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) শুধু যে খাদ্য সংরক্ষণ করেছেন তাই নয়; বরং খাদ্য বিতরণের ব্যাপারেও সু-ব্যবস্থা করেছেন। এর জন্যে নিয়ম-কানুন প্রর্বতন করেছেন, যেমন স্বয়ং রাজা রাইয়ান এবং তার মোসাহেবদেরকে দিনের বেলা দুপুরে শুধু একবার খাদ্য সরবরাহ করা হতো। ঘটনাক্রমে একরাত্রির মধ্যভাগে রাজা রাইয়ান ক্ষুধায় কাতর হয়ে চিৎকার দিয়ে বললো, 'ক্ষুধা', 'ক্ষুধা'। হযরত ইউসুফ (আঃ) একথা শ্রবণ করে বললেন, দুর্ভিক্ষের সময় এসে গেল। হযরত ইউসুফ (আঃ) নগদ অর্থের বিনিময়ে মানুষের নিকট খাদ্য-দ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা করলেন (বর্তমান যুগে রেশন ব্যবস্থার অনুরূপই ছিলো তাঁর ব্যবস্থাপনা)।

বর্ণিত আছে, দুর্ভিক্ষের প্রথম বছরই মানুষের হাতের সকল নগদ অর্থ শেষ হয়ে গেল। দ্বিতীয় বছর খাদ্য-দ্রব্যের বিনিময়ে মানুষ অর্থ জমা দিতে পারেনি; বরং অলংকার এবং হীরা-জহরত যার কাছে যা ছিল তা দিয়েই তারা খাদ্র-দ্রব্য ক্রয় করে। এভাবে দ্বিতীয় বছর অতিবাহিত হয়। তৃতীয় বছর মিশরবাসী খাদ্য-দ্রব্যের বিনিময়ে তাদের সকল গৃহপালিত চতুঃস্পদ জন্তুগুলো দিয়ে দেয়। এভাবে তারা তাদের প্রয়োজন পূরণ করে। চতুর্থ বছর মানুষ তাদের গোলাম-বাঁদীদের বিনিময়ে খাদ্য সংগ্রহ করে। প্রত্যেকে তার

১। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃঃ ৩১৩
২। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৮, পৃঃ ১৬৪
৩। খোলাসাতুত তাফাসীর, খন্ড-২,পৃঃ ৪৪২

গোলাম-বাঁদী সরকারের তহবিলে জমা দিতো এবং প্রয়োজনীয় খাদ্র-দ্রব্য সরকারী তহবিল থেকে সংগ্রহ করতো। পঞ্চম বছরে মিশরবাসী তাদের স্থাবর সম্পত্তি, ঘর-বাড়ী সরকারের নিকট বিক্রয় করে এবং তার বিনিময়ে খাদ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করে। ষষ্ঠ বছরে তাদের নিকট কিছুই ছিলো না যার বিনিময়ে তারা খাদ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করতে পারে, তাই বাধ্য হয়ে তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে সরকারের নিকট বিক্রয় করে দেয় এবং এর বিনিময়ে প্রাণ ভিক্ষা করার নিমিত্তে খাদ্য সংগ্রহ করে। সপ্তম বছরে মিশরবাসীর নিকট স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, গোলাম-বাঁদী এমনকি সন্তান-সন্ততি বলতে কিছুই ছিলনা। প্রাণ রক্ষার জন্যে কোন উপায় না দেখে তারা নিজেদের প্রাণের বিক্রয় দলিল সই করলো। আর প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ রক্ষার জন্যে সরকারের তহবিল থেকে খাদ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করলো। তখন মিশরবাসীর নিকট নগদ, অলংকার, হীরা-জহরত, জীবজন্তু, গোলাম-বাদী, সন্তান-সন্ততি এক কথায় কিছুই রইলনা। সব কিছুই হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর হয়ে গেলো, সবই হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর গোলামে পরিণত হলো।[১]

তত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, একদিন ব্যবসায়ীরা হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে মিশরের বাজারে বিক্রয় করেছিলো। মিশরের আজিজ তাকে ক্রয় করেছিল এবং গোলাম হিসেবে রেখেছিল। আল্লাহ পাক তাই সমগ্র মিশরবাসীকে হযরত হউসুফ (আঃ)-এর গোলামে পরিণত করেছেন। অবশেষে মিশরবাসী হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করে এবং তাঁর খেদমত ও তা'জীম করে তজ্জন্যে আল্লাহ পাক তাঁর প্রচেষ্টায় এবং বরকতে মিশরবাসীর প্রাণ রক্ষা করেন। দ্বিতীয়তঃ সুদীর্ঘ কয়েক বছর যাবত কোন অপরাধ ব্যতীত মিশর সরকার হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে বন্দী করে রেখেছিল। তাই সাতটি বছর যাবত মিশরবাসীকে ক্ষুধা-তৃষ্ণার কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে এবং দুর্ভিক্ষের যে পরিণতি হয় তা ভোগ করতে হয়েছে।[২]

বর্ণিত আছে যে, দুর্ভিক্ষের সময় হযরত ইউসুফ (আঃ) নিজেও ক্ষুধার্থ থাকতেন। লোকেরা বললো সমগ্র মিশরের যাবতীয় খাদ্য-দ্রব্য আপনার নিয়ন্ত্রণে, তবুও কেন আপনি ক্ষুধার্ত থাকেন? তিনি জবাব দিয়েছিলেন,"যদি আমার উদর পূর্ণ থাকে তবে আশংকা আছে যে আমি ক্ষুধার্ত লোকদেরকে ভুলে যাব। এজন্যে আমি খাদ্য মওজুদ থাকা সত্তেও তা গ্রহণ করিনা"। তিনি মিশরের রাজা রাইয়ানের জন্যে এ আদেশ দিয়ে রেখেছিলেন, শুধু দ্বিপ্রহরে তাকে খাদ্য দেয়া হবে। সকাল থেকে সে ক্ষুধার্থ অবস্থায় থাকবে যাতে করে ক্ষুধার্ত লোকদের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সর্বদা তার অনুভূতি থাকে।

তৃতীয়তঃ মিশরবাসীর জন্যে তিনি যে সুন্দর বাস্তব এবং ইনসাফ-ভিত্তিক বিতরণ ব্যবস্থা করেছিলেন, এর ফলে সকলেই খাদ্য-দ্রব্য সমান ভাবে পাচ্ছিল। "কেউ খাবে আর কেউ খাবে না" এমন অবস্থা কোনদিন হয়নি আর কোনদিনও হবে না। এসব কথার প্রচার

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ১৭০
খোলাসাতুত তাফাসীর, খন্ড-২,পৃঃ ৪৪২
তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু), পারা-১৩, পৃঃ ৪
২। খোলাসাতুত তাফাসীর, খন্ড-২,পৃঃ ৪৪২

তদানীন্তন পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই মিশর ব্যতীত অন্যান্য দেশের মানুষ খাদ্য-দ্রব্যের জন্যে মিশরে আসতে থাকে। মিশরবাসী হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়, তারা বলে এমন বাদশাহ পৃথিবীতে আর কোন দিন কেউ দেখেনি, যিনি সারা মিশরের সকলের জান-মালের মালিক হয়ে গেছেন, অথচ তাঁর মধুর ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ।

হযরত ইউসুফ (আঃ) রাজা রাইয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন, মিশরবাসী সম্পর্কে এখন আপনার কি অভিমত? রাজা বললো যা আপনার মত তা-ই আমার মত। আমি যে আপনার অনুগত ও অনুসারী। হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেন, আমি আপনাকে এবং স্বয়ং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনকে সাক্ষী করে বলছি যে, আমি সমগ্র মিশরবাসীকে মুক্ত করে দিলাম। তাদের সকল ধন-সম্পদ, অলংকার, হীরা জহরত, তাদের চতুঃষ্পদ জন্তু, তাদের সকল সন্তান-সন্ততি এক কথায় সবকিছু তাদেরকে ফেরত দিলাম।

এখানে উল্লেখ্য, যারা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নিকট খাদ্য-দ্রব্য নিতে আসতো তাদেরকে তিনি এক উষ্ট্রের বোঝা সমান খাদ্য-দ্রব্য দিতেন। যত বড়লোকই হোক অথবা যত প্রভাবশালী ব্যক্তিই হোক তিনি এর বেশি কাউকে দিতেন না। যাতে করে অল্প অল্প করে হলেও খাদ্য-দ্রব্য সকলের নিকট পৌঁছে যায়।

ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, এ দুর্ভিক্ষ শুধু মিশরেই হয়নি, তদানীন্তন বিশ্বের অনেক দেশেই এই মহাবিপদ দেখা দেয়। তাই বিভিন্ন দেশের লোকেরা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সুব্যবস্থার কথা শ্রবণ করে বিভিন্ন স্থান থেকে তাঁর নিকট হাযির হয়। কেনান এবং সিরিয়াও এ দুর্ভিক্ষের আওতামুক্ত ছিল না। তাই হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁর পুত্রদেরকে বলেছিলেন, মিশরের বর্তমান বাদশাহ অত্যন্ত নেককার ব্যক্তি। মানুষের নিকট তিনি খাদ্য-দ্রব্য বিক্রয় করেন। তোমরা তৈরী হও এবং মিশর যাও। তিনি হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর আপন ভাই বিন-ইয়ামিনকে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন এবং অন্যদেরকে মিশরে প্রেরণ করেছিলেন।[১]

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ১৭০

وَجَآءَ اِخْوَةُ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَ
هُمْ لَهٗ مُنْكِرُوْنَ ﴿٥٨﴾ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُوْنِىْ بِاَخٍ
لَّكُمْ مِّنْ اَبِيْكُمْ ۚ اَلَا تَرَوْنَ اَنِّىْۤ اُوْفِى الْكَيْلَ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ﴿٥٩﴾
فَاِنْ لَّمْ تَاْتُوْنِىْ بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِىْ وَلَا تَقْرَبُوْنِ ﴿٦٠﴾ قَالُوْا
سَنُرَاوِدُ عَنْهُ اَبَاهُ وَاِنَّا لَفٰعِلُوْنَ ﴿٦١﴾ وَقَالَ لِفِتْيٰنِهِ اجْعَلُوْا
بِضَاعَتَهُمْ فِىْ رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَاۤ اِذَا انْقَلَبُوْۤا اِلٰۤى اَهْلِهِمْ
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٦٢﴾ فَلَمَّا رَجَعُوْۤا اِلٰۤى اَبِيْهِمْ قَالُوْا يٰۤاَبَانَا مُنِعَ مِنَّا
الْكَيْلُ فَاَرْسِلْ مَعَنَاۤ اَخَانَا نَكْتَلْ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ﴿٦٣﴾

তরজমা

(৫৮) ইউসুফের ভাইয়েরা আসল এবং তাঁর নিকট হাযির হলো। তিনি তাদেরকে চিনতে পারেন কিন্তু তারা তাঁকে চিনতে পারেনি।

(৫৯) এবং ইউসুফ যখন তাদের দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিলেন তখন বলেন, তোমরা আমার নিকট তোমাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে নিয়ে আসবে, তোমরা কি লক্ষ্য করনা যে আমি পরিমাপ পুরোপুরিই দিয়ে থাকি, আর অতি উত্তম ভাবে মেহমানদের আপ্যায়ন করে থাকি।

(৬০) কিন্তু যদি তোমরা তাকে আমার নিকট না নিয়ে আস, তবে আমার নিকট তোমাদের রসদের কোন বরাদ্দ থাকবেনা, (একথা জেনে রেখ) আর তোমরা আমার ধারে কাছেও আসবেনা।

(৬১) তারা বললো, আমরা এ বিষয়ে তার পিতাকে সম্মত করার চেষ্টা করবো। আর নিশ্চয় আমরা এ কাজ করবো।

(৬২) আর ইউসুফ তাঁর ভৃত্যদেরকে বললেন, তারা যে পণ্যমূল্য আদায় করেছে, তা তাদের আসবাবপত্রের মধ্যে রেখে দাও। যাতে করে আত্মীয়-স্বজনের নিকট ফিরে যাওয়ার পর তারা উপলব্ধি করতে পারে যে তা প্রত্যর্পণ করা হয়েছে, হয়তো তারা পুনরায়

আসবে।

(৬৩) এরপর যখন তারা তাদের পিতার নিকট উপস্থিত হয় তখন তারা বলে, হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্যে রসদ নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। তাই আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন, যেন আমরা রসদ নিয়ে আসতে পারি। আর নিশ্চয় আমরা তার হেফাজত করবো।

তফসীরুল কোরআন

হযরত ইউসুফ (আঃ) যখন মিশরের রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, তখন মিশরের রাজা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তার তা'বীর মোতাবেক সাত বছর পর্যন্ত মিশরে বিপুল পরিমাণে খাদ্য-শস্য উৎপন্ন হয়। তিনি তাঁর পরিকল্পনা মোতাবেক ঐ ফসল গুদামজাত করেন। এরপর যে সাত বছর আসে তা ছিল অত্যন্ত কঠিন। দুর্ভিক্ষের কালো ছায়া নেমে আসে সারা দেশে, শুধু মিশরেই নয়; বরং চারিপার্শ্বের আরো বহু দেশ দুর্ভিক্ষের শিকার হয়। হযরত ইউসুফ (আঃ) আল্লাহ পাক প্রদত্ত বিবেক-বিবেচনা এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে এ কঠিন সমস্যার সমাধানে যত্নবান হন। দুর্ভিক্ষ শুরু হওয়ার পর অগণিত অনাহারী মানুষ মিশর এবং তার উপকণ্ঠের দেশগুলো থেকে খাদ্যের সন্ধানে সমবেত হতে থাকে। তিনি এ নিয়ম প্রবর্তন করেছিলেন যে, এক উষ্ট্র বোঝাই পরিমাণের অধিক খাদ্য-শস্য কোন লোককে দিতেন না, যাতে করে সকলের নিকট কিছু কিছু খাদ্য পৌঁছানো যায় এবং কেউ বঞ্চিত না হয়।

মিশরে খাদ্য পাওয়া যায় এবং মিশরের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা একজন নেককার ব্যক্তির হাতে- এ দু'টি কথার প্রচার হয় তদানীন্তন পৃথিবীতে। ফলে খাদ্যের সন্ধানে প্রত্যহ কত লোক যে হাযির হতো তার কোন ইয়ত্তা নেই। কেনান এবং সিরিয়ায়ও দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তাই হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর যে বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা ঈর্ষান্বিত হওয়ার কারণে তাঁকে শৈশবে অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করেছিল, তারা খাদ্য-শস্যের জন্যে তাঁরই দরবারে হাযির হয়। আল্লাহ পাকের কুদরতের খেলা বুঝবার ক্ষমতা কার আছে? যাঁকে তারা পথের কাঁটা মনে করে মৃত্যুর কোলে ঠেলে দিয়েছিল, আল্লাহ পাক শুধু তাঁকে রক্ষাই করেননি; বরং মিশরের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছেন এবং তাঁর সম্মুখে হিংসা ও ঈর্ষার প্রতিমূর্তি বৈমাত্রেয় ভাইদেরকে দু'মুঠো অন্নের জন্যে মুখাপেক্ষী করে হাযির করেছেন। আলোচ্য আয়াতে তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ○

"ইউসুফের ভাইয়েরা আসল এবং তাঁর নিকট হাযির হলো, তিনি তাদেরকে চিনতে পারেন কিন্তু তারা তাঁকে চিনতে পারেনি"।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাই ছিল দশ জন, তারা সকলেই সেদিন হাযির হয়েছিল, তিনি তাদের সকলকেই চিনে ফেলেছিলেন কিন্তু তারা তাঁকে চিনতে পারেনি।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, হযরত ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে দেখা মাত্রই চিনে ফেলেছিলেন, আর হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, প্রথম দর্শনে চিনতে পারেননি তবে যখন তারা তাদের পরিচয় দিয়েছে তখন চিনতে পেরেছেন। তারা কেন চিনতে পারেনি তার কারণ সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যখন তারা হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে অন্ধকার কূপে ফেলেছিল, তখন তাঁর শৈশব কাল, আর এ ঘটনার ৪০ বছর পর তারা তাঁর সম্মুখে হাযির হয়েছে, এ সুদীর্ঘ কালের বিচ্ছেদের কারণে তারা তাঁকে চিনতে পারেনি। আতা (রঃ) বলেছেন, হযরত ইউসুফ (আঃ) তখন রাজকীয় সিংহাসনে মুকুট পরিধান করে জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থায় দেশের সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, এ কারণে তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে চিনতে পারেনি।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, রাজকীয় শান-শওকত, অতি মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ, রাজ দরবারের জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশের কারণে বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে চিনতে পারেনি।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, হযরত ইউসুফ (আঃ) দেখলেন যে, তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা হিব্রু ভাষায় কথা বলে। তখন তিনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাকে তোমাদের পরিচয় দাও। বল তোমরা কি কাজ কর। তারা বললো আমরা সিরিয়ার কৃষিজীবি মানুষ। দুর্ভিক্ষের কারণে কষ্ট পেয়ে খাদ্য-দ্রব্যের জন্যে আপনার নিকট এসেছি।

হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেন, হয়তো তোমরা আমাদের দেশে তোমাদের দেশের চর হিসেবে এসেছ এবং এখানকার অবস্থা জানার চেষ্টা করছো। তারা বললো, আল্লাহর শপথ! আমরা চর নই। আমরা সকলে একই পিতার সন্তান। আমাদের পিতা আল্লাহর নবীদের অর্ন্তগত।

হযরত ইউসুফ (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কয় জন? তারা বললো আমরা বার ভাই ছিলাম, আমাদের এক ভাই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে।

সে জঙ্গলে যাবার পর মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। পিতার দৃষ্টিতে আমাদের সে ভাই-ই অত্যন্ত প্রিয় ছিল।

হযরত ইউসুফ (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এখন কতজন আছ? তারা বললো, আমরা দশজন আছি। তিনি বললেন, আরেকজন কোথায়?

তারা বললো, সে পিতার নিকট রয়ে গেছে। যখন তার আপন ভাইয়ের মৃত্যু হয়, তখন থেকে পিতার মনে সান্ত্বনার জন্যে সে তাঁর কাছেই থাকে। হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেন, কে জানে তোমরা সত্য কথা বলছো কি-না। তারা তখন বললো, হে বাদশাহ! আমরা এখানে আগন্তুক, এই দেশে কেউ আমাদেরকে চেনে না। অবশেষে হযরত ইউসুফ

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ১৭১

(আঃ) তাদের প্রত্যেককে একটি উটের বোঝা পরিমাণ খাদ্য-দ্রব্য দান করলেন এবং সকলের ভ্রমণের আসবাবপত্র তৈরী করিয়ে দিলেন।[১]

وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ

"আর ইউসুফ (আঃ) যখন তাদের আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করে দিলেন তখন তিনি বললেন, "পিতার তরফ থেকে তোমাদের যে ভাই রয়েছে তাকে আমার নিকট নিয়ে আসবে। তোমরা কি লক্ষ্য করনা যে, আমি পরিপূর্ণরূপে পরিমাপ দিয়ে থাকি এবং উত্তমরূপে মেহমানদের আপ্যায়ন করি"।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইয়েরা তাঁর প্রতি যে অকথ্য নির্যাতন করেছে তার কথা তিনি আদৌ তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেননি; বরং তাদের খাতির-যত্নে তিনি এতটুকু ক্রটি করেননি এবং তাদের মেহমানদারীর হক আদায় করেছেন। তাদের প্রত্যেককে একটি করে উট বোঝাই খাদ্য-দ্রব্য দিয়েছেন।

এ পর্যায়ে কোন কোন তফসীরকার একথাও লিখেছেন, হযরত ইউসুফ (আঃ) তাদের প্রতি যে অসাধারণ উদারতা, মহানুভবতা দেখিয়েছেন, তা ছিল তাদের জন্যে সম্পূর্ণ কল্পনাতীত। তাই তারা তাঁর কাছে বলে যে, দেখুন! দেশে আমাদের আরেক ভাই রয়েছে তার নাম হলো বিন-ইয়ামীন। আমাদের পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ, তাঁর সেবা-যত্নের প্রয়োজনেই আমরা তাকে তাঁর নিকট রেখে এসেছি। বিন-ইয়ামীনের ইউসুফ নামক আরেকটি ভাই ছিল, সে বহুদিন পূর্বে হারিয়ে গেছে, আপনি যদি দয়া করে আমাদের অনুপস্থিত ভাই বিন-ইয়ামীনের রসদের অংশটিও আমাদের নিকট দিয়ে দিতেন তবে আমরা কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ থাকব। হযরত ইউসুফ (আঃ) তাদের এ আরজীর জবাবে বললেন, আমাদের নিয়ম হলো যে উপস্থিত হয় তাকেই আমরা খাদ্য-দ্রব্যের বরাদ্দ দিয়ে থাকি কিন্তু যে অনুপস্থিত তাকে দেয়া হয়না। অবশ্য এ ব্যবস্থা হতে পারে যে, তোমরা পুনরায় যখন আসবে তখন তাকেও সঙ্গে নিয়ে আসবে। এমন অবস্থায় তোমরা তার অংশ অবশ্যই পাবে। তোমরা লক্ষ্য করেছ যে আমি কিভাবে প্রত্যেককে তার রসদ যথা নিয়মে দিয়ে থাকি।

فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ

কিন্তু যদি তোমরা তাকে নিয়ে না আস, তবে একথা প্রমাণিত হবে যে, তোমরা মিথ্যাবাদী, ধোকা, প্রতারণা এবং ছলচাতুরীর মাধ্যমে কিছু অতিরিক্ত খাদ্য-দ্রব্য আমাদের নিকট থেকে নিতে চেয়েছিল।

فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ ○

এমন অবস্থায় আমাদের নিকট তোমাদের জন্যে রসদের কোন বরাদ্দ থাকবেনা এবং

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ১৭১
তফসীরে কবীর, খন্ড-১৮, পৃঃ ১৬৭

তোমরা আমার কাছেও আসবেনা।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কথায় একদিকে তাদেরকে দ্বিতীয়বার আসার জন্যে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে, অন্যদিকে তাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণীও উচ্চারণ করা হয়েছে, যদি দ্বিতীয়বার আসার সময় বিন-ইয়ামীনকে না আন তবে খাদ্য-দ্রব্যের একটি দানাও তোমরা পাবেনা।

قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ○

তারা বললো, আমরা তার পিতার নিকট থেকে তাকে নিয়ে আসার সর্বাত্মক চেষ্টা করবো তবে কাজটি খুব সহজ নয়। কেননা, ইউসুফের বিদায়ের পর বিন-ইয়ামীনই তাঁর মনের সান্ত্বনার একমাত্র উপকরণ। তবে আপনার নির্দেশ মোতাবেক কাজ করার জন্যে আমরা যথাসাধ্য সচেষ্ট থাকব।

وَقَالَ لِفِتْيَٰنِهِ

আর হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভৃত্যদেরকে নির্দেশ দিলেন খাদ্য-দ্রব্যের বিনিময়ে তারা যে মূল্য আদায় করেছে তা তাদের আসবাবপত্রের মধ্যে রেখে দাও। বাড়ী ফিরে হয়তো তারা চিনতে পারবে এবং এ কারণে পুনরায় ফিরে আসবে অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভ্রাতাদের নিকট থেকে মূল্য গ্রহণ করা পছন্দ করলেন না কেননা ভদ্রতা, নম্রতা এবং মহানুভবতা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আর আপনজন থেকে মূল্য গ্রহণ না করাও তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তাই তিনি তাঁর সুচতুর ভৃত্যদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, ভাইদের আসবাবপত্রের মধ্যে গোপনে তাদের দেয় অর্থ রেখে দাও। তারা বাড়ী ফিরে যখন দেখবে যে, রসদ পাওয়া গেছে অথচ বিনিময় মূল্য ফেরত দেয়া হয়েছে তখন হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বদান্যতায় তারা মুগ্ধ হবে এবং পুনরায় আসতে আগ্রহী হবে।

পরম উদারতার দৃষ্টান্ত

তফসীরকারগণ বলেছেন, বৈমাত্রেয় ভাইদের তরফ থেকে দেয়া বিনিময় মূল্য গোপনে ফেরত দেয়ার একাধিক কারণ রয়েছে।

(১) হযরত ইউসুফ (আঃ) স্বীয় পিতা ও ভ্রাতাদের প্রতি দুর্ভিক্ষের সময় এহসান করতে চেয়েছিলেন।

(২) একান্ত আপনজনদের থেকে খাদ্য-দ্রব্যের বিনিময় মূল্য গ্রহণ করাকে তিনি ভদ্রতা এবং শরাফতের খেলাফ মনে করেছেন।

(৩) হযরত ইউসুফ (আঃ) এ ধারণা করেছেন, হয়তো এছাড়া তাদের নিকট আর কোন অর্থ-সম্পদ নেই। আর এমন অবস্থায় তারা দ্বিতীয়বার খাদ্য-শস্যের জন্যে আসতে পারবে না। তাই তাদেব নিকট খাদ্য-শস্যের মূল্য ফেরত দেয়া হয়েছে যেন তারা পুনরায় আসতে পারে।

(৪) গোপনে মূল্য ফেরত দেয়ার আরেকটি কারণ এই, হযরত ইউসুফ (আঃ) তাদের সাথে এভাবে এহসান করতে ইচ্ছা করলেন যেন তারা লজ্জা না পায়। যদি প্রকাশ্যে মূল্য ফেরত দেয়া হতো তবে হয়তো তারা গ্রহণ করতো না।

(৫) হযরত ইউসুফ (আঃ) হয়তো এরূপ ধারণা করেছেন যে, বাড়ী ফিরে যখন তারা তাদের দেয় মূল্য ফেরত পাবে তখন তাদের ঈমানদারী, আমানতদারী এবং ভদ্রতা তাদেরকে বাধ্য করবে যেন তারা ফিরে আসে ও তাদের দেয়া পুঁজি ফেরত দেয়ার কারণ জানতে চেষ্টা করে এবং এ বিনিময় মূল্য পুনরায় জমা দিতে সচেষ্ট হয়।

(৬) হযরত ইউসুফ (আঃ) এর দ্বারা হয়তো এ ইচ্ছাও করেছেন যে, তারা তাঁর পিতার নিকট একথা প্রকাশ করবে যে, মিশরের বাদশাহ তাদের সাথে এমনভাবে ব্যবহার করেছেন এবং এজন্যে তাদেরকে তিনি দ্বিতীয়বার প্রেরণ করতে দ্বিধাবোধ করবেন না। আর যখন তাদের নিকট মূলধন থাকবে তখন পুনরায় আসতেও কোন অসুবিধা হবে না।

মূলতঃ হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইদের সাথে পরম উদারতার পরিচয় দিয়েছেন, যেমন তারা তাঁর প্রতি চরম অত্যাচার করেছিল।[১]

فَلَمَّا رَجَعُوٓا

"যখন তারা তাদের পিতার নিকট উপস্থিত হয় তখন তারা বলে, হে আমাদের পিতা! আমাদের রসদ নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। অতএব, আমাদের সঙ্গে আমাদের ভাইকে প্রেরণ করুন যেন আমরা রসদ নিয়ে আসতে পারি, আর আমরা নিশ্চয় তার হেফাজত করবো"।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা যখন বাড়ী ফিরে গেল তখন তারা হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর নিকট মিশরের বাদশাহর উদারতা ও মহানুভবতার কথা বর্ণনা করলো যে, তিনি অত্যন্ত দয়াবান এবং ন্যায় বিচারক ব্যক্তি। আমাদেরকে তিনি অনেক সম্মান দিয়েছেন এবং আমাদের মেহমানদারীতে তিনি অত্যন্ত বেশী গুরুত্বারোপ করেছেন।

মিশরের বাদশাহর এহেন উদারতা ও মহানুভবতার কথা শ্রবণ করে হযরত ইয়াকুব (আঃ) অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং তাঁর জন্যে বিশেষভাবে দোয়া করলেন। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা একথাও বললো, মিশরের বাদশাহ আমাদের সাথে যে মধুর ব্যবহার করেছেন তা ছিল সম্পূর্ণ কল্পনাতীত। যদি আপনার বংশীয় কোন লোক হতো তবুও হয়তো এমন সম্মান এবং মর্যাদা আমাদেরকে দিত না। হযরত ইয়াকুব (আঃ) এসব কথা শ্রবণ করে বললেন, তোমরা পুনরায় মিশরের বাদশাহর নিকট যাও এবং তাকে আমার সালাম বলে আস, একথাও বলো আপনি আমাদের প্রতি যে সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন তার কারণে আমরা আপনার জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করি, আল্লাহ পাক আপনার প্রতি অশেষ রহমত নাযিল করুন।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৩, পৃঃ ৫৯৪
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ১৭৩

এরপর হযরত ইয়াকুব (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন শামউন কোথায়? তখন তাঁর পুত্ররা বললো তাকে মিশরের বাদশাহ জামিন হিসেবে রেখে দিয়েছে। এরপর পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করেছে।

يَٰٓأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ

হে আমাদের পিতা! ভবিষ্যতে যদি আমরা বিন ইয়ামীনকে সঙ্গে না নিয়ে যাই তবে আমাদেরকে কোন প্রকার খাদ্য-শস্য দেয়া হবেনা বলে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। মিশরের বাদশাহ আমাদের প্রত্যেকের নামে খাদ্য-দ্রব্য দিয়েছে কিন্তু বিন ইয়ামীনের নামে দেয়নি। কেননা সে অনুপস্থিত ছিল।

فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ○

অতএব, আপনি আমাদের সাথে বিন ইয়ামীনকে প্রেরণ করুন যাতে করে আমরা খাদ্য-দ্রব্য নিয়ে আসতে পারি এবং কোন বিষয়ে বাধাপ্রাপ্ত না হই।

অথবা এর অর্থ হলো যাতে করে আমরা তার অংশের খাদ্য-দ্রব্য নিয়ে আসতে পারি আর আপনি বিন ইয়ামীনকে আমাদের সঙ্গে দিতে কোন প্রকার দ্বিধা করবেন না। কেননা, নিশ্চয় আমরা তার হেফাজত করবো। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন এবং বিন ইয়ামীনকে আমাদের সঙ্গে দিয়ে দিন।[১]

এ পর্যায়ে তওরাতে যে বিবরণ রয়েছে তা হলো, অবশেষে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা তাদের পিতা হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর নিকট হাযির হলো এবং যা কিছু মিশরে ঘটেছে তার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করলো এবং বললো, যে ব্যক্তি সে দেশের মালিক সে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় আমাদেরকে বলেছে যে, তোমরা বিদেশী চর। আমরা বলেছি আমরা চর নই। আমরা বার ভাই ছিলাম। আমাদের মধ্যে একজনকে পাওয়া যায় না। আরেকজন যে সর্ব কনিষ্ঠ, আমাদের পিতার নিকট কেনানে রয়েছে। যিনি মিশরের বাদশাহ তিনি বলেছেন তোমরা এ ব্যাপারে সত্যবাদী কি-না তা আমি পরীক্ষা করে দেখব। তোমাদের এক ভাইকে আমার নিকট রেখে যাও এবং দুর্ভিক্ষের কারণে নিজেদের পরিবারবর্গের জন্যে খাদ্য-শস্য নিয়ে যাও। আর তোমাদের পিতার নিকট কেনানে যে ভাই রয়েছে তাকে নিয়ে আস। তখন আমি বিশ্বাস করবো যে, তোমরা বিদেশী চর নও; বরং সত্যবাদী আর তখনই আমি তোমাদের ভাইকে তোমাদের নিকট ফেরত দেব এবং তোমরা এমন অবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্য করবে।

১। তফসীরে তবরী, খন্ড-১৩, পৃঃ ৭
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ১৭৩

قَالَ

هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَآ اَمِنْتُكُمْ عَلٰٓى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ ؕ فَاللّٰهُ
خَيْرٌ حٰفِظًا ۪ وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٦٤﴾ وَلَمَّا فَتَحُوْا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوْا
بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَيْهِمْ ؕ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا مَا نَبْغِيْ ؕ هٰذِهٖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ
اِلَيْنَا ۚ وَنَمِيْرُ اَهْلَنَا وَنَحْفَظُ اَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ؕ ذٰلِكَ كَيْلٌ
يَّسِيْرٌ ﴿٦٥﴾ قَالَ لَنْ اُرْسِلَهٗ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُوْنِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ
لَتَاْتُنَّنِيْ بِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّآ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّٰهُ عَلٰى
مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ ﴿٦٦﴾

তরজমা

(৬৪) ইয়াকুব বললেন, ইতিপূর্বে তার ভাইয়ের ব্যাপারে আমি তোমাদের উপর যেমন বিশ্বাস করেছিলাম এ সম্পর্কেও কি সে প্রকার বিশ্বাস করবো? মূলতঃ আল্লাহ পাকই সর্বোত্তম রক্ষাকর্তা। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।

(৬৫) আর যখন তারা তাদের আসবাবপত্র খুললো তখন তারা দেখতে পেল যে, তাদের (আদাযকৃত) পণ্য মূল্য তাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। তারা বললো, হে আমাদের পিতা! আমরা আর কি আশা করতে পারি? আমাদের প্রদত্ত অর্থ আমাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে। আমরা আবার আমাদের পরিবারবর্গকে খাদ্য সামগ্রী এনে দেব। আমাদের ভ্রাতার হেফাজত করবো। আর আমরা অতিরিক্ত আরেক উষ্ট্র বোঝাই রসদ নিয়ে আসব। যা আমরা এনেছি তা পরিমাণে অল্প।

(৬৬) ইয়াকুব বললেন, আমি তাকে কখনো তোমাদের সাথে পাঠাব না যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ পাকের নামে এ মর্মে অঙ্গীকার কর যে, তোমরা তাকে আমার নিকট অবশ্যই নিয়ে আসবে। কিন্তু যদি তোমরা সকলেই অসহায় হয়ে পড় তবে অন্য কথা। ফলে যখন তারা সকলেই অঙ্গীকার করে তখন তিনি বলেন, আমরা যে বিষয়ে কথা বলছি আল্লাহ পাক তা লক্ষ্য করছেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর নিকট তাঁর সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র বিন ইয়ামীনকে মিশরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে অনুমতি চায়। তারা এর পাশাপাশি কথাও বলে, আমরা তার হেফাজতের

দায়িত্ব নেব। তাদের একথার জবাবে হযরত ইয়াকুব (আঃ) যা বলেছিলেন তাই আলোচ্য আয়াতে স্থান পেয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

قَالَ هَلْ اٰمَنُكُمْ عَلَيْهِ اِلَّا كَمَآ اَمِنْتُكُمْ عَلٰٓى اَخِيْهِ مِنْ قَبْلُ

অর্থাৎ ইতিপূর্বে তার ভাইয়ের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি যেমন বিশ্বাস করেছিলাম এর ব্যাপারেও কি তেমনি বিশ্বাস করবো? অর্থাৎ ইতিপূর্বে ইউসুফকে নেয়ার সময়ও তোমরা বলেছিলে যে, তার হেফাজতের দায়িত্ব তোমরা গ্রহণ করেছ। আমি তোমাদের কথায় বিশ্বাস করেছিলাম এবং ইউসুফকে তোমাদের সঙ্গে দিয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা তোমাদের কথা রক্ষা করোনি। এমনি অবস্থায় আমি বিন ইয়ামীনের ব্যাপারে কিভাবে তোমাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারি? একবার তোমাদের কথা বিশ্বাস করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, পুনরায় কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবো? তা কখনো হতে পারেনা। কিন্তু যদি বিন ইয়ামীনকে নিয়ে যাওয়া একান্তই প্রয়োজনীয় হয় তবে আমি একমাত্র আল্লাহ্ পাকের প্রতিই ভরসা করবো কেননা-

فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا ۖ وَّهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ

আল্লাহ্ পাকই সর্বোত্তম হেফাজতকারী। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। তাঁর দয়া মায়ার কোন সীমা নেই। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান, সর্বশ্রেষ্ঠ হেফাজতকারী। অতএব, আমি বিন ইয়ামীনকে তোমাদের সাথে দিলেও তোমাদের প্রতি বিশ্বাস করে এবং তোমাদের হেফাজতের কথা মনে রেখে দেব না; বরং এক আল্লাহ্ পাকের প্রতি সম্পূর্ণ ভরসা রেখে আমি তাকে তোমাদের সঙ্গে দেব। কেননা একথা সর্বজনবিদিত যে, আল্লাহ্ পাক যদি হেফাজত করেন তবে কেউ তার ক্ষতি করতে পারবে না। অতএব, আমার আশা আল্লাহ্ পাকের প্রতি এবং আমার ভরসা শুধু তাঁরই প্রতি।

ইমাম রাজী (রহঃ) এ প্রসঙ্গে এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছেনঃ ইতিপূর্বে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা তাঁর সাথে যে অন্যায় আচরণ করেছে তার তিক্ত অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও হযরত ইয়াকুব (আঃ) কিভাবে তাদের সাথে বিন ইয়ামীনকে দিতে রাজী হলেন? ইমাম রাজী (রহঃ)-এর জবাবে বলেছেনঃ

(১) হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা তখন বয়োবৃদ্ধ হবার কারণে আত্মসংশোধন করেছে এবং কল্যাণকর কাজের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে।

(২) হযরত ইয়াকুব (আঃ) লক্ষ্য করেছেন যে, বিন ইয়ামীন এবং তার বৈমাত্রেয় ভাইদের মধ্যে কোন হিংসা-বিদ্বেষ নেই, যেমন ইউসুফ (আঃ) ও তাদের মধ্যে ছিল।

(৩) হয়তো দুর্ভিক্ষের কারণে তাঁকে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছে।

(৪) এমনও হতে পারে, হয়তো আল্লাহ্ পাক ওহীর মাধ্যমে তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, বিন ইয়ামীনকে আল্লাহ্ পাক হেফাজত করবেন, আর তিনি এজন্যে বলেছেনঃ আল্লাহ্ পাক সর্বোত্তম হেফাজতকারী।[১]

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৮, পৃঃ ১৭০

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ

আর যখন তারা তাদের মালপত্র খুললো তখন তারা দেখতে পেল যে, তাদের মূলধন ফেরত দেয়া হয়েছে। তখন তারা বললো এর চেয়ে বেশী আমরা আর কি আশা করতে পারি? মিশরের বাদশাহ আমাদের মেহমানদারী করেছেন, এরপর খাদ্য-দ্রব্য আমাদের নিকট বিক্রয় করেছেন, এমনকি আমাদের আদায়কৃত মূল্যও ফেরত দিয়েছেন।

অথবা এর অর্থ হলো আমরা এর চেয়ে অধিকতর কল্যাণের কথা আশা করতে পারি না, বা এর অর্থ হলো মিশরের বাদশাহর উপকার সম্পর্কে কথা বলতে হলে আর কি কোন কিছু বলার দরকার আছে? কিংবা এর অর্থ হলো বাদশাহর উদারতার বিবরণে আমরা আর কিছু বলতে চাইনা। আপনার নিকট আমাদের কথার সত্যতার সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ উপস্থাপিত হয়েছে। অথবা পুনরায় খাদ্য-শস্যের জন্যে মিশর গমনের ব্যাপারে আমরা আপনার নিকট আর কোন মূলধন চাইনা। কেননা আমাদের নিকট মূলধন রয়েছে। তাই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছে ঃ[১]

هَٰذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا

"এই হলো আমাদের পূঁজি যা আমাদেরকে ফেরত দেয়া হয়েছে"।

ইমাম রাজী (রহঃ) বাক্যটির ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ মিশরের বাদশাহ আমাদেরকে খাদ্য-দ্রব্য দিয়েছেন এবং এর বিনিময় মূল্য যা আদায় করেছি তা-ও ফেরত দিয়েছেন। এরপর চাওয়ার মত আর কি থাকতে পারে?[২]

যেহেতু আমাদেরকে আমাদের মূলধন ফেরত দেয়া হয়েছে, তাই আমাদের পরিবারবর্গের জন্যে আমরা পুনরায় খাদ্য-শস্য নিয়ে আসব এবং আমাদের ভাইয়ের হেফাজত করবো, আর তার নামে আরেকটি বাড়তি উষ্ট্র বোঝাই রসদ নিয়ে আসব, কেননা প্রত্যেকের জন্যে এক উষ্ট্র বোঝাই খাদ্য-শস্য দেয়া হতো।

ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ۝

তফসীরকারগণ এ বাক্যটির একাধিক অর্থ লিখেছেনঃ

(১) অর্থাৎ আমরা এবার যে খাদ্য-শস্য নিয়ে এসেছি তা অতি সামান্য, আমাদের পরিবারবর্গের জন্যে আদৌ যথেষ্ট নয়।

(২) অথবা এর অর্থ হলো আরো অধিক পরিমাণে খাদ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করা সহজ হবে, কেননা মিশরের বাদশাহ অত্যন্ত দানবীর ব্যক্তি। তফসীরকার মোকাতেল (রহঃ) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যা করেছেন।

(৩) অথবা এর অর্থ হলো আমাদের ভাই বিন ইয়ামীনকে না নেয়ার কারণে আমাদের

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ১৭৪
২। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৮, পৃঃ ১৭১

খাদ্য-শস্য কম হয়েছে। অতএব, ভাই বিন ইয়ামীনকে আমাদের সঙ্গে প্রেরণ করুন যেন আমরা আরো অধিক পরিমাণে খাদ্য-শস্য নিয়ে আসতে পারি অর্থাৎ শুধু বিন ইয়ামীনকে সঙ্গে নিয়ে গেলেই আমরা আরো একটি উষ্ট্র বোঝাই খাদ্য নিয়ে আসতে পারি। অতএব এ কাজটি অত্যন্ত লাভজনক, তাই তাকে আমাদের সঙ্গে দিয়ে দিন।[১]

এ ব্যাপারে আশা করি আপনি আর কোন প্রকার আপত্তি করবেন না।

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتّٰى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ

হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁর পুত্রদেরকে বললেনঃ তোমরা বিন ইয়ামীনের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে কোন প্রকার গাফলত করবে না বলে যে পর্যন্ত আল্লাহ পাকের নামে অঙ্গীকার না করবে এবং আমাকে প্রতিশ্রুতি না দেবে, সে পর্যন্ত আমি কখনো বিন ইয়ামীনকে তোমাদের সঙ্গে প্রেরণ করবো না। অতএব, তোমরা আল্লাহর নামে শপথ করে বল যে, বিন ইয়ামীনকে আমার নিকট ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু যদি তোমরা নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যাও তবে তা স্বতন্ত্র কথা।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেনঃ সে যুগে সফর অত্যন্ত কঠিন ছিল। বিশেষতঃ কেনান থেকে মিশর পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ পথের সফর আরো কঠিনতর এবং কন্টকাকীর্ণ ছিল। তাই হযরত ইয়াকুব (আঃ) বিন ইয়ামীনের ব্যাপারে চিন্তিত ছিলেন এবং তাঁর অন্য সন্তানদের থেকে তার হেফাজতের ব্যাপারে তিনি অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন।

এ পর্যায়ে তওরাতের বিবরণ হলো এরূপঃ আর তাদের পিতা হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাদেরকে বললেন, তোমরা আমাকে নিঃসন্তান করে ফেলেছ। ইউসুফ পূর্ব থেকেই নেই, শামউনও নেই, এখন বিন ইয়ামীনকেও তোমরা নিয়ে যেতে চাও। এসব কথা আমার মর্জির খেলাফ। তখন রুবীল নামক ছেলেটি পিতাকে সম্বোধন করে বললো, যদি আমি বিন ইয়ামীনকে আপনার নিকট হাযির না করি তবে আপনি আমার দু' পুত্রকে হত্যা করবেন। তাই বিন ইয়ামীনকে আমাদের হাতে সোপর্দ করুন। আমরা অবশ্যই আপনার নিকট তাঁকে পৌঁছে দেব।[২]

فَلَمَّآ اٰتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ

এরপর যখন হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁর পুত্রদের থেকে কঠিন অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন তখন তিনি বললেন, আমার যা সাধ্য ছিল তা আমি করলাম অর্থাৎ বিন ইয়ামীনের হেফাজতের জন্যে তোমাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম। তবে প্রকৃত অবস্থা এই যে, বিন ইয়ামীনকে আমি আল্লাহর সোপর্দ করলাম।

قَالَ

হযরত ইয়াকুব (আঃ) বললেনঃ

اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ

---

১ তফসীরে কবীর, খন্ড-১৮, পৃঃ ১৭১
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ১৭৫
তফসীরে মাজেদী, খন্ড-১, পৃঃ ৪৯৯

২। তফসীরে মাজেদী, খন্ড-১, পৃঃ ৪৯৯

আমরা যা কিছু বলছি, যা কিছু অঙ্গীকার গ্রহণ করছি এসব নিতান্ত আমাদের কর্তব্য হিসেবেই করছি। কিন্তু প্রকৃত নিরাপত্তা এবং হেফাজত এক আল্লাহ পাকেরই। তিনি সবকিছু প্রত্যক্ষকারী, আমাদের কথার উপর তিনিই সাক্ষী, তাই আমি তাকে আল্লাহ পাকেরই হাতে সোপর্দ করলাম।

কা'ব বলেছেনঃ হযরত ইয়াকুব (আঃ) যখন فَاللّٰهُ خَيْرٌ حٰفِظًا বলেছেন তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ "আমার ইজ্জতের শপথ! তুমি আমার প্রতি ভরসা করেছ, তাই আমি তোমার উভয় পুত্রকে (ইউসুফ ও বিন ইয়ামীনকে) তোমার নিকট পৌঁছে দেব"।[১]

اِلَّآ اَنْ يُّحَاطَ بِكُمْ

কিন্তু যদি তোমরা সকলেই ঘেরাও হয়ে যাও বা সকলেই অসহায় হয়ে যাও।

এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় ইমাম রাজী (রহঃ) বলেছেন, যদি তোমরা সকলেই কোন কারণে ধ্বংস হয়ে যাও তবে ভিন্ন কথা। আর মুজাহেদ (রহঃ) বাক্যটির অর্থ বলেছেন, যদি তোমরা সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হও তবে তা আমার নিকট তোমাদের ওজর হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে। আর কাতাদা (রহঃ) এর অর্থ বলেছেন, যদি তোমরা পরাজিত, অসহায় এবং নিরূপায় হয়ে যাও এবং আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে অক্ষম হও তবে তা স্বতন্ত্র কথা।

قَالَ اللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ وَكِيْلٌ

অর্থাৎ আমরা যা কিছু অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম, তোমরা যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিলে, আল্লাহ পাক তার উপর সাক্ষী। যদি তোমরা এ অঙ্গীকার যথাযথভাবে পূর্ণ কর তবে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে এর উত্তম বিনিময় দান করবেন। পক্ষান্তরে যদি তোমরা এ অঙ্গীকার ভঙ্গ কর তবে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি দেবেন।[২]

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, হযরত ইয়াকুব (আঃ) বিন ইয়ামীনের হেফাজতের ব্যাপারে মানুষের পক্ষে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব তা তিনি করেছেন, তবে বিন ইয়ামীনের হেফাজতের বিষয়টি আল্লাহ পাকের উপরই সোর্পদ করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ তাঁর প্রত্যেকটি সন্তান থেকে বিন ইয়ামীনের হেফাজতের ব্যাপারে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ প্রত্যেকেই এ ব্যাপারে দায়ী থাকবে। যদি কোন বিপদাপদ দেখা দেয় তবে তা সকলের জন্যেই হবে, বিশেষ কারো জন্যে নয়, যেমন ইতিপূর্বে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ব্যাপারে তারা বলেছিলঃ আমরা দৌড়ে প্রতিযোগিতা করছিলাম, এই সময় বাঘ ইউসুফকে খেয়ে ফেলেছিল। বিন ইয়ামীনের ব্যাপারে এই ধরণের কথা গ্রহণযোগ্য হবে না।[৩]

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ১৭৫
২। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৮, পৃঃ ১৭২
৩। আল জামাল ওয়াল কামলে তফসীরে সূরা ইউসুফ, পৃঃ ১৭০

وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْۢ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا
مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ؕ وَمَآ اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ؕ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا
لِلّٰهِ ؕ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ﴿٦٧﴾ وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ
حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ ؕ مَا كَانَ يُغْنِيْ عَنْهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا
حَاجَةً فِيْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضٰىهَا ؕ وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ وَلٰكِنَّ
اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٦٨﴾

তরজমা

(৬৭) আর ইয়াকুব বললেনঃ হে আমার পুত্রগণ! তোমরা একই দ্বার দিয়ে প্রবেশ করোনা, ভিন্ন ভিন্ন দ্বারে পৃথক পৃথক ভাবে প্রবেশ করবে, আল্লাহ্ পাকের বিধানের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্যে কিছুই করতে পারি না। হুকুম তো শুধু আল্লাহ্ পাকেরই। আমি তাঁর প্রতি ভরসা করি। আর যারা ভরষা করতে চায় তাদের এক আল্লাহ্ পাকের উপরই ভরসা করা উচিত।

(৬৮) আর তাদের পিতা যেখান থেকে তাদেরকে প্রবেশের জন্যে বলেছিলেন, তারা যখন সেখান থেকেই প্রবেশ করলো, তখন আল্লাহ্ পাকের বিধানের বিরুদ্ধে পিতার নির্দেশ তাদের কোন কাজে আসলো না। শুধু ইয়াকুবের মনের যা বাসনা ছিল, তা তিনি পূর্ণ করে নিলেন। আর নিশ্চয় সে ছিল জ্ঞানী। কেননা, আমি তাকে শিক্ষা দিয়েছিলাম কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা অবগত নয়।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র বিন ইয়ামীনের হেফাজতের ব্যাপারে তার বৈমাত্রেয় ভাইদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। এরপর তিনি বলেছেনঃ আমাদের একথার উপর স্বয়ং আল্লাহ্ পাক সাক্ষী। এমন অবস্থায় তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তাদের সঙ্গে বিন ইয়ামীনকে প্রেরণ করা হবে। যখন তারা সকলে মিশরের দিকে রওয়ানা হলো তখন হযরত ইয়াকুব (আঃ) সতর্কতামূলক ব্যবস্থা

হিসেবে তাঁর পুত্রদেরকে মিশর প্রবেশের সময় একটা পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ দিলেন। আলোচ্য আয়াতে সে নির্দেশের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَقَالَ يٰبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوْا مِنْ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ ط

"হে আমার পুত্রগণ! তোমরা সকলে একই দ্বার দিয়ে প্রবেশ করোনা; বরং ভিন্ন ভিন্ন দ্বারে পৃথক পৃথক ভাবে প্রবেশ কর"।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা ইতিপূর্বেও তাঁর নিকট হাযির হয়েছিল। কিন্তু এবারের উপস্থিতি ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, এবার তারা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর উদারতায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর নিকট গমন করছিল। দ্বিতীয়তঃ এবার তাদের সঙ্গে রয়েছে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিন ইয়ামীন। এভাবে একই পিতার সন্তান-১১জন সুশ্রী, সুদর্শন, বলিষ্ঠ যুবকদের এই দল অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে একথা চিন্তা করা অস্বাভাবিক নয়। এতদ্ব্যতীত, মিশরের বাদশাহর দরবারে তাদের বিশেষ মর্যাদা ও মর্তবা রয়েছে, এমনি অবস্থায় তাদের প্রতি কোন প্রকার বদনজর হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এজন্যে হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাদেরকে বদনজর থেকে রক্ষা করার জন্যে একটি তদ্‌বীর হিসেবে বলেছেনঃ তোমরা একই দ্বার দিয়ে সকলে প্রবেশ করোনা; বরং ভিন্ন ভিন্ন দ্বার দিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে প্রবেশ কর।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর প্রত্যেকটি পুত্রই ছিল সুন্দর সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং আকর্ষণীয়। এতদ্ব্যতীত, মিশরের বাদশাহর দরবারে তাদের যে উচ্চ মর্যাদা ছিল, এরই মধ্যে তার প্রচারও হয়েছিল অনেক বেশি। তাই হযরত ইয়াকুব (আঃ) মনে করলেন, এভাবে তারা যদি একত্রিত হয়ে প্রবেশ করে তবে কারো বদনজর তাদের ক্ষতির কারণ হতে পারে, যেমন হাদীস শরীফে বদনজরের সত্যতার কথা ঘোষিত হয়েছে।

العين حق

"নজর ধ্রুব সত্য"। তাই বদনজর থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর সন্তানদেরকে নির্দেশ দেনঃ "তোমরা একসঙ্গে একই দ্বারে প্রবেশ করোনা; বরং বিভিন্ন দ্বার দিয়ে পৃথক পৃথক ভাবে প্রবেশ কর" (যেন বদনজর থেকে আত্মরক্ষা করা যায়)।

তদবীর ও তকদীর

একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, এটি একটি তদবীর মাত্র তথা আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা। কিন্তু যদি অদৃষ্টের লিখন কিছু থাকে তবে তার ব্যতিক্রম হয়না। আল্লাহ পাক যা স্থির করে রাখেন তাই হয়। তবে এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবে; বরং চেষ্টা তাকে অবশ্যই করতে হবে। চেষ্টা-তদবীর বাদ দেয়া সঠিক পন্থা নয়, এর পাশাপাশি নিজের চেষ্টা-তদবীরের উপর ভরসা রাখাও সঠিক পন্থা নয়; বরং ভরসা রাখতে হবে

একমাত্র আল্লাহ পাকের প্রতি। কেননা, তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর ইচ্ছা এবং মর্জিই কার্যকর হয় সর্বত্র। মোট কথা, একদিকে উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা-তদবীর করতে হবে, অন্যদিকে আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ ভরসা রাখতে হবে। চেষ্টা-তদবীর না করা যেমন ভুল তেমনি আল্লাহ পাককে ভুলে গিয়ে শুধু চেষ্টা-তদবীরের উপর নির্ভর করে থাকাও ভুল। এজন্যেই হযরত ইয়াকুব (আঃ) বলেছেন, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَمَآ أُغْنِىْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ ط

"আর আল্লাহর কোন কিছু থেকেই আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারবো না"

এতে মানব জাতির জন্যে রয়েছে এক পরম শিক্ষা। নিজেদের হেফাজত বা নিরাপত্তার যথাযথ ব্যবস্থা করা যেমন উচিত, ঠিক তেমনি এ উদ্দেশ্যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও ভরসা রাখাও একান্ত কর্তব্য।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ মানুষের নজর যে সত্য, এর প্রতিক্রিয়া যে হয়ে থাকে আলোচ্য আয়াতে রয়েছে এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এজন্যেই হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইমাম হাসান হোসাইন (রাঃ)-এর হেফাজতের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করে বলতেনঃ

اعيذ كما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة

এমনিভাবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পুত্রদ্বয় ইসমাঈল (আঃ) ও ইসহাক (আঃ)-এর জন্যে আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।

হাদীস শরীফে এ পর্যায়ে আরও কিছু বর্ণনা সংকলিত হয়েছে। ইমাম রাজী (রহঃ) এসব বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[২]

আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয়, আল্লাহ পাকের যা হুকুম তা কার্যকর হবেই, হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা তকদীরের লিখনকে খন্ডাতে পারে না। (হাকেম, আহমদ)

এ হাদীস হযরত মাআজ এবনে জবল (রাঃ) ও হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) থেকেও বর্ণিত আছে।

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ ط

"হুকুম তো শুধু আল্লাহরই"।

অর্থাৎ যা আল্লাহ পাকের হুকুম হয়েছে তা অবশ্যই তোমার নিকট পৌঁছবে। আর এজন্যেই হযরত ইয়াকুব (আঃ) আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করার কথা ঘোষণা করেছেন

১। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃঃ ৩১৫
২। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৮, পৃঃ ১৭২

যা পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۚ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ○

"আল্লাহ পাকের প্রতিই আমি ভরসা করেছি আর ভরসাকারীদের এক আল্লাহ পাকের প্রতিই ভরসা করা উচিত"।

وَلَمَّا دَخَلُوْا مِنْ حَيْثُ اَمَرَهُمْ اَبُوْهُمْ ۭ

"আর তাদের পিতা যেখান থেকে তাদেরকে প্রবেশ করার জন্যে বলেছিলেন তারা সেখান থেকে প্রবেশ করে, পিতার নির্দেশ তাদেরকে আল্লাহ পাকের কোন কিছু থেকেই বাঁচাতে পারতো না, শুধু ইয়াকুবের মনে বাসনা ছিল তা পূর্ণ করলেন মাত্র"।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেনঃ বর্ণিত আছে যে, শহরের চারটি ফটক ছিল। প্রত্যেকটি ফটক দিয়েই তারা প্রবেশ করে এবং এ তদবীরের মাধ্যমে তারা বদনজর থেকে রক্ষা পায় সত্য, কিন্তু অদৃষ্টের লিখন কে করবে খন্ডন তাই দেখা যায় বিন ইয়ামীন চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হলো; আর সকল ভাই এজন্যে অপমানিত অপদস্ত হলো।

وَاِنَّهٗ لَذُوْ عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنٰهُ

আর আমি তাকে শিখিয়েছিলাম, তাই তিনি ছিলেন অবগত, অর্থাৎ আল্লাহ পাক ওহীর মাধ্যমে হযরত ইয়াকুব (আঃ)-কে এসব বিষয় অবগত করেছেন। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আল্লাহ পাক হযরত ইয়াকুব (আঃ)-কে যে এলম দান করেছেন তার উপর তিনি আমল করেছেন। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো যেহেতু আল্লাহ পাক তাঁকে এলম দান করেছেন তাই তিনি এসব বিষয়ে ছিলেন অভিজ্ঞ। হযরত সুফিয়ান সওরী (রহঃ) বলেছেন, যে আলেম তার এলমের উপর আমল করে না সে প্রকৃত আলেম নয়।[১]

وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

"কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না"।

যেমন হযরত ইয়াকুব (আঃ) জানতেন। অথবা এর অর্থ হলো হযরত ইয়াকুব (আঃ) এসব বিষয়ে যে অবগত ছিলেন অধিকাংশ লোক তা জানে না। আর আলোচ্য আয়াতে অধিকাংশ লোক বলতে মুশরেকদেরকে বোঝানো হয়েছে। কেননা, তারা জানতো না আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় বন্দাদেরকে কিভাবে এমন এলম দান করেন যা দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে তাঁদের জন্যে হয় উপকারী।[২]

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ১৭৭
২। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৮, পৃঃ ১৭৭

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ
أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٩﴾ فَلَمَّا
جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ
أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ﴿٧١﴾
قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ
زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا
كُنَّا سَارِقِينَ ﴿٧٣﴾ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ ﴿٧٤﴾ قَالُوا جَزَاؤُهُ
مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿٧٥﴾

তরজমা

(৬৯) আর তারা যখন ইউসুফের নিকট উপস্থিত হলো তখন তিনি তাঁর আপন ভাইকে নিজের কাছে রাখেন এবং বলেন, নিশ্চয় আমিই তোমার আপন ভাই। অতএব, তারা (তোমার সাথে) যা করেছে এজন্যে দুঃখিত হয়োনা।

(৭০) এরপর ইউসুফ যখন তাদের আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করে তখন তাঁর ভাইয়ের আসবাবপত্রের মধ্যে পান-পাত্র রেখে দেন। এরপর এক ঘোষক ঘোষণা করে হে যাত্রীদল! তোমরা নিশ্চয় চোর।

(৭১) তারা তাদের দিকে চেয়ে বললো, তোমরা কি হারিয়েছো?

(৭২) তারা বললো, আমরা রাজার পান-পাত্র হারিয়েছি। যে কেউ তা এনে দেবে তাকে এক উষ্ট্র বোঝাই রসদ দেয়া হবে। আর আমি সে দায়িত্ব গ্রহণ করছি।

(৭৩) ইউসুফ ভ্রাতারা বললো, আল্লাহ্ পাকের শপথ! তোমরা ভালভাবেই জান আমরা এদেশে দুস্কার্য করার জন্যে আসিনি, আর আমরা চোরও নই।

(৭৪) তারা বললো, তোমরা যদি মিথ্যাবাদী হও তবে তার শাস্তি কি হবে?

(৭৫) তারা বললো, যার মালপত্রের মধ্যে পাত্রটি পাওয়া যাবে, সে-ই হবে তার বিনিময়। এটিই তার শাস্তি। আমরা সীমা লংঘনকারীদেরকে এ শাস্তিই দিয়ে থাকি।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত পর্যন্ত হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নিকট তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইদের প্রথমবার উপস্থিত হওয়ার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াত থেকে তাদের তাঁর দরবারে দ্বিতীয়বার উপস্থিতির বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ

"আর তারা যখন ইউসুফের নিকট প্রবেশ করে", তখন বিন ইয়ামিনকে তাঁর সম্মুখে পেশ করে বলে, আপনার নির্দেশ মোতাবেক আমরা তাকে নিয়ে এসেছি। তখন হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেনঃ তোমরা ভাল কাজ করেছ। তোমাদেরকে অচিরেই এর উত্তম বিনিময় দান করা হবে। এরপর তিনি তাদের অবস্থানের উত্তম ব্যবস্থা করার নির্দেশ প্রদান করেন। তাদেরকে রাজকীয় মেহমান হিসেবে গণ্য করা হয় এবং মেহমানদারীর যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয় এবং তিনি নির্দেশ দেন দস্তরখানে দু'জন করে মুখোমুখি হয়ে বসবে। দশজন বৈমাত্রেয় ভাই মুখোমুখি হয়ে বসল। বিন ইয়ামীন একা রয়ে গেল। এ অবস্থায় সে ক্রন্দন করে বলতে লাগল যদি আমার ভাই ইউসুফ আজ জীবিত থাকত, তবে সে আমাকে নিয়ে বসত। হযরত ইউসুফ (আঃ) তখন বললেনঃ তোমাদের এই ভাইটি একা রয়ে গেছে, তাকে আমার সাথে বসিয়ে দিচ্ছি। তখন হযরত ইউসুফ (আঃ) তাকে সম্মুখে বসিয়ে খাবার দিলেন। এরপর রাত হলো। হযরত ইউসুফ (আঃ) আদেশ দিলেন, দু'ভাই এক বিছানায় ঘুমাবে। তখনও বিন ইয়ামীন একা রয়ে গেল। তখন ইউসুফ (আঃ) বললেনঃ তোমাদের এ ভাইটি আমার সঙ্গে থাকবে। বিন ইয়ামীনকে রাত্রে তিনি তাঁর কাছেই রাখলেন। সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরের বিরহের পর আপন ছোট ভাইটিকে পেয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে অনেক আদর করলেন। সারা জীবনের পুঞ্জীভূত স্নেহ-মায়া যেন বন্যার পানির ন্যায় ছুটে এসেছিল। সারারাত এমনিভাবে অতিবাহিত হয়ে গেল। রুবিল নামক বৈমাত্রেয় ভাই বললো, এমন ঘটনা আর কোনদিন দেখিনি। কোথায় আমরা আর কোথায় মিশরের বাদশাহ! আমাদের প্রতি তাঁর এ দয়া মায়া সত্যিই বিস্ময়কর। বিশেষতঃ বিন ইয়ামীনের প্রতি তাঁর যে বিশেষ সুনজর তা শুধু বিস্ময়কর নয়, বরং তাৎপর্যবহও। সকালে ইউসুফ (আঃ) তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইদেরকে বললেনঃ আমি লক্ষ্য করছি যে এ ব্যক্তি (অর্থাৎ বিন ইয়ামীন) সম্পূর্ণ একা। তার কোন বন্ধু নেই, সেজন্যে তাকে আমি আমার মহলেই রাখব। এরপর বিন ইয়ামীন হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সঙ্গেই থাকতে লাগল। তাই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর আপন ভাই বিন ইয়ামীনকে নিজের কাছেই রাখলেন।

যখন মজলিস শেষ হয়ে গেল, লোকেরা সকলেই নিজ নিজ স্থানে চলে গেল। বিন ইয়ামীনকে একা পেয়ে হযরত ইউসুফ (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি?

সে বললো, বিন ইয়ামীন।

হযরত ইউসুফ (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, বিন ইয়ামীন অর্থ কি?

বিন ইয়ামীন বললো, মৃত মায়ের পুত্র।

অর্থাৎ বিন ইয়ামীনের জন্মের সময় তাঁর মাতা এন্তেকাল করেন।

হযরত ইউসুফ (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি পছন্দ করবে তোমার মরহুম ভাইয়ের স্থলে আমি তোমার ভাই হয়ে যাই?

বিন ইয়ামীন বললোঃ বাদশাহের ভাই হবার মতো ভাগ্য ক'জনের হয়? কিন্তু আপনি যে আমার পিতা ইয়াকুব এবং মাতা রাহীলের পুত্র নন।

তখন হযরত ইউসুফ (আঃ) কেঁদে ফেললেন এবং দন্ডায়মান হয়ে বিন ইয়ামীনকে আলিঙ্গন করে বললেন, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

قَالَ اِنِّىْٓ اَنَا اَخُوْكَ

তিনি বললেন, সত্যিই আমি তোমার ভাই অর্থাৎ আমিই ইউসুফ।

فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

অতএব, তারা যে অন্যায় আচরণ করেছে তজ্জন্যে দঃখিত হয়োনা।

অর্থাৎ তোমার সাথে তাঁরা যে মন্দ ব্যবহার করেছে বা আমার সাথে ইতিপূর্বে তারা যে অমানবিক ব্যবহার করেছে তজ্জন্যে দুঃখিত হয়োনা, আমার ও আমার পিতার মধ্যে যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে এবং আমাদের সকলকে যে দুঃখের সাগরে ভাসিয়েছে, এজন্যেও দুঃখ করোনা। আল্লাহ পাক আমাদের বিরহ-জ্বালা দূর করে দিয়েছেন। এজন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে অগণিত শোকর। তারা হিংসা করেছে কিন্তু আল্লাহ পাকের রহমত হয়েছে, তিনি আমাদেরকে জীবনের এ পর্যায়ে পৌঁছিয়েছেন। তারা আমাকে কেনান থেকে নির্বাসিত করেছে, গোলাম বানিয়ে বিক্রয় করেছে, কিন্তু আল্লাহ পাক আমাকে মিশরের বাদশাহ বানিয়েছেন। অতএব এটি দুঃখ করার সময় নয়, বরং আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময়, সেজদায়ে শোকরানা আদায় করাব সময়।[১]

বিন ইয়ামীন এসব কথা শ্রবণ করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল। তার আনন্দ ও খুশীর কোন সীমা রইলনা। তার অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করার মতো ছিল না।

কবির ভাষায়ঃ

انچ می بینم به بیداری است یارب یا بخواب
خویشتن را در چنیں راحت پس از چنیں عذاب

"হে পরওয়ারদেগার! আমি যা দেখছি তা কি বাস্তব না স্বপ্ন? আপনজনকে চরম কষ্টের পর এত আরাম, এত আনন্দ, এত শান্তিতে দেখছি"।[২]

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ১৮১
২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৪, পৃঃ ৫১

فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِىْ رَحْلِ اَخِيْهِ

"অতঃপর ইউসুফ (আঃ) যখন তাদের মালপত্রের ব্যবস্থা করেন তখন তাঁর ভাইয়ের মালপত্রের মধ্যে পান-পাত্র রেখে দেন"।

অর্থাৎ যখন হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ভ্রাতাদের মালপত্র তৈরী হয়, তখন তাঁর আপন ভাই বিন ইয়ামীনের মালপত্রের সঙ্গে বাদশাহর পান-পাত্রটি রেখে দেয়া হয়।

سِقَايَةَ

শব্দটির অর্থ হলো পান-পাত্র, বাদশাহ এর দ্বারা পানি পান করতেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, পাত্রটি জবরযদ পাথর দ্বারা তৈরী ছিল।

এবনে এছহাক (রঃ) বলেছেন, পাত্রটি রুপার তৈরী ছিল আর কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এটি স্বর্ণ নির্মিত ছিল। একরামা (রঃ) বলেছেন, পাত্রটি রুপার তৈরী ছিল তবে তাতে সোনালী কাজ করা ছিল, দুর্ভিক্ষের সময় যে খাদ্য-শস্য বিতরণ করা হত তা এ পান-পাত্র দ্বারাই পরিমাপ করা হত। খাদ্য-দ্রব্যের সম্মানার্থে হযরত ইউসুফ (আঃ) তার পান-পাত্রটি এ কাজে ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, আপন ভাই বিন ইয়ামীনের মালপত্রের সঙ্গে এ পান-পাত্রটি গোপনে রাখা হয়। কা'ব (রঃ) বলেছেন, হযরত ইউসুফ (আঃ) যখন বিন ইয়ামীনকে বললেন, আমিই তোমার ভাই ইউসুফ, তখন বিন ইয়ামীন বললো, এখন আর আমি তোমাকে ছেড়ে যাবনা। হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেন, তুমি অবগত আছ যে, আমার কারণে পিতা কত চিন্তিত হয়েছেন। যদি আমি তোমাকে রেখে দেই তবে তাঁর দুশ্চিন্তা বেড়ে যাবে।

এতদ্ব্যতীত, তোমাকে এখানে রাখতে হলে কোন একটা পন্থা অবলম্বন করতে হবে। যে পর্যন্ত তোমাকে কোন ব্যাপারে বদনাম না করা হয় তথা কোন অন্যায় আচরণ তুমি করেছ বলে প্রচার না করা হয় সে পর্যন্ত তোমাকে আইনতঃ এখানে রাখা যাবেনা। আর যদি কোন মিথ্যা অপবাদ তোমার প্রতি দেয়া হয় তাতে তোমার বদনাম হবে। বিন ইয়ামীন বললো, যা কিছু করার করুন, আমি কিন্তু আপনাকে ছেড়ে যাবনা। হযরত ইউসুফ (আঃ) তখন বললেন, তাহলে আমার পান-পাত্র তোমার মালপত্রে রেখে দেয়া হবে এবং এভাবে তোমার উপর চুরি অপবাদ দেয়া হবে। এ পন্থায় তোমাকে রেখে দেয়া সম্ভব হবে এবং বৈমাত্রেয় ভাইদের জুলুম থেকে তুমি রক্ষা পাবে।[১]

পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক বিন ইয়ামীনের মালপত্রের সঙ্গে শাহী পান-পাত্র রেখে দেয়া হয়। ইমাম কুরতবী (রঃ) লিখেছেন, হযরত ইউসুফ (আঃ) নিজেই পান-পাত্রটি বিন ইয়ামীনের মালপত্রের সঙ্গে রেখে দিয়েছিলেন।[২]

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ১৭৮
২। তফসীরে কুরতবী, খন্ড-৯, পৃঃ ২২৯

আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) লিখেছেনঃ হতে পারে যে তিনি তাঁর কোন বিশেষ খাদেমের মাধ্যমে পান-পাত্রটি রাখার ব্যবস্থা করেছেন, বা নিজেও রাখতে পারেন, যাতে করে আর কেউ এ সম্পর্কে অবগত না হতে পারে।

যাহোক, মালপত্র নিয়ে বিন ইয়ামীন সহ ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাইদের এ কাফেলা রওয়ানা হয়ে গেল। এরপর রাজকীয় মেহমানখানার পরিচারকরা পান-পাত্রটি না পেয়ে কাফেলার লোকদেরকে সন্দেহ করলো, কেননা তারাই শাহী মেহমানখানায় অবস্থান করেছিল। তারা ব্যতীত এ সময় আর কেউ সেখানে ছিলনা। এদিকে কাফেলা কিছুদূর অগ্রসর হয়েছিল।

ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَيَّتُهَا الْعِيْرُ اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ ○

"তখন শাহী পরিচারকদের একজন পেছন থেকে ডাক দিয়ে বললো, হে কাফেলার লোক! থাম, নিশ্চয় তোমরা চোর"।

প্রশ্ন হতে পারে, তারা চুরি করেনি কিন্তু তবু তাদেরকে চোর কেন বলা হলো এবং তাদের প্রতি চুরির অপবাদ কেন দেয় হলো? তফসীরকারগণ এ প্রশ্নের জবাবে বলেছেনঃ হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নির্দেশ ব্যতীতই হয়তো ঘোষক নিজের তরফ থেকে একথা বলেছে অথবা হযরত ইউসুফ (আঃ) আদেশ দিয়েছিলেন অনুসন্ধানের জন্যে, কিন্তু পরিচারকের মুখ থেকে এ শব্দটি অনিচ্ছাকৃত বের হয়ে গেছে অথবা সত্যিই তারা চুরি করেছে। যদিও কোন ধন-সম্পদ চুরি করেনি কিন্তু একদিন হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে তারাই চুরি করেছে। তাই তাদের প্রতি চুরির অপবাদ অসত্য নয়। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) এসব কথা লিপিবদ্ধ করার পর লিখেছেনঃ হয়তো আল্লাহ পাকই এভাবে কথা বলার আদেশ দিয়েছেন আর আল্লাহ পাকের নিকট কোন কথা জিজ্ঞাসা করা যায় না। এর মধ্যে হেকমত রয়েছে আর তা এইঃ হযরত ইয়াকুব (আঃ)-কে আরো পরীক্ষা করা তথা বিন ইয়ামীনের বিরহের কষ্ট সহ্য করা।[১]

قَالُوْا وَاَقْبَلُوْا عَلَيْهِمْ مَّاذَا تَفْقِدُوْنَ ○

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা রাজ দরবারের পরিচারকদের দিকে মুখ করে বললো, তোমরা কি হারিয়েছো যা তোমরা অনুসন্ধান করছো? তারা বললো, আমরা বাদশাহর পান-পাত্র হারিয়েছি এবং তারই অনুসন্ধান করছি। যে পান-পাত্রটি এনে দেবে তার জন্যে পুরস্কার রয়েছে। আর সে পুরস্কার হলো এক উষ্ট্র বোঝাই খাদ্য-দ্রব্য। ঘোষক একথাও বললো, পুরস্কার প্রদানের দায়িত্ব আমি নিজেই গ্রহণ করছি।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেনঃ এক উষ্ট্র বোঝাই খাদ্য-দ্রব্য প্রদানের যে ঘোষণা করা হয়েছে তা পারিশ্রমিক হিসেবে হতে পারে বা পুরস্কার হিসেবেও হতে পারে। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, কোন শ্রমিক থেকে কাজ নেয়ার পূর্বে তার পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট করে নেয়া

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ১৭৯

বৈধ।[১]

قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ

তখন তারা বললোঃ আল্লাহর শপথ! তোমরা নিশ্চিতভাবে জান যে, আমরা এদেশে কোন প্রকার অশান্তি সৃষ্টি করার জন্যে আসিনি। আর আমরা চোরও নই। তারা এ পর্যন্ত দু'বার মিশরে এসেছে। তাদের ঈমানদারী আমানতদারী সম্পর্কে মিশরবাসী অবগত হয়েছে। ইতিপূর্বে তাদের যে মূলধন ফেরত দেয়া হয়েছিল তারা তা পুনরায় জমা দেয়ার জন্যে নিয়ে এসেছে। এতদ্ব্যতীত তারা যে জন্তুর উপর আরোহন করে এসেছে সেগুলোর মুখে তারা জালী পরিয়ে রেখেছিল যাতে করে তাদের জন্তুগুলো কারো ফসল খেয়ে ফেলতে না পারে। এসব তাদের আমানতদারীর প্রকৃষ্ট প্রমাণ এবং মিশরবাসী তাদের এ আমানতদারী সম্পর্কে অবগত ছিল।[২]

قَالُوْا فَمَا جَزَآؤُهٗٓ اِنْ كُنْتُمْ كٰذِبِيْنَ ○

শাহী ঘোষক এবং তার সঙ্গীরা বললো, তোমরা যে নিজেদেরকে নিঃষ্পাপ বলে দাবী করছো যদি এ দাবীতে তোমরা মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হও, তবে তার শাস্তি কি হওয়া উচিৎ?

قَالُوْا جَزَآؤُهٗ

তারা বললো, যার মালপত্রে তোমাদের হারানো পান-পাত্র পাওয়া যাবে সে ব্যক্তিই তার শাস্তি অর্থাৎ যে চোর প্রমাণিত হবে সে ব্যক্তিকে গোলাম বানিয়ে নেয়া হবে। আমরা জালেমদের তথা চোরদের এ শাস্তিই দিয়ে থাকি। যখন কারো চুরি প্রমাণিত হতো তখন চোরকে চুরি করা বস্তুর মালিকের হাতে সোপর্দ করা হতো আর সে চোরকে গোলাম বানিয়ে নিতো। বর্ণিত আছে যে, সরকারী লোকেরা তাদেরকে পথ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। হযরত ইউসুফ (আঃ) তাদের মালপত্রে রাজকীয় পান-পত্র অনুসন্ধানের আদেশ দেন।

جَعَلَ السِّقَايَةَ فِىْ رَحْلِ اَخِيْهِ

"তাঁর ভাইয়ের মালপত্রে পান-পাত্র রেখে দেন"।

অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাই বিন ইয়ামীনের মালপত্রে রাজকীয় পান-পাত্রটি রেখে দিলেন। পরবর্তী ঘটনায় দেখা যায় যে, পান-পাত্রটি চুরির দায়ে বিন ইয়ামীন অভিযুক্ত হলেন। প্রশ্ন হতে পারে, এ কাজটি কিভাবে হলো? আর এ কাজটি একজন নবীর শানের খেলাফ।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ এর জবাবে বলেছেনঃ কোন ভাল উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে এমন কৌশল অবলম্বন করা অবৈধ নয়। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় একে "তৌরিয়া" বলা

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ১৮০
২। তফসীরে কুরতবী, খন্ড-৯, পৃঃ ২৩৬
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৪, পৃঃ ৫২

হয়। কোন বিপদাপদ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে এমনি কাজের অনুমতি রয়েছে। পবিত্র কোরআনেই রয়েছে এর দৃষ্টান্ত। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর যুগে পৌত্তলিকদের বানানো এবং পূজনীয় মূর্তিগুলো ভেঙ্গে দিলেন। যে কুড়ালের আঘাতে তিনি এ কাজটি করেছিলেন তা বড় মূর্তিটির সঙ্গে ঝুলিয়ে দিলেন। মূর্তির পূজারী এবং সমর্থকরা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর উপর অত্যন্ত রাগান্বিত হলো। তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলোঃ এ কাজটি কে করেছে? তিনি জবাবে বললেন পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

بَلْ فَعَلَهٗ كَبِيْرُهُمْ

"বড় মূর্তিটি এ কাজ করেছে"।

এমনিভাবে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন, এ অভিযানে শরীফ হওয়ার জন্যে দশ হাজার সাহাবায়ে কেরাম তৈরী হচ্ছিলেন কিন্তু অভিযান কোথায় হবে কেউ জানতো না। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কৌশলগত কারণে বিষয়টি গোপন রেখেছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন, তিনি তাঁর অঙ্গুলী মোবারক দ্বারা বিভিন্ন দিকে ইঙ্গিত করতেন। এভাবে বিষয়টি গোপন রাখা সম্ভব হয়েছে আর এ গোপনীয়তা রক্ষার ফলশ্রুতিস্বরূপ বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয় করা সম্ভব হয়েছে। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ উদ্দেশ্যে তৌরিয়া করেছিলেন। আল্লাহর দুশমনের মোকাবেলায় ক্ষেত্র বিশেষে এভাবে তৌরিয়া করার প্রয়োজন হয়েছে। এমনিভাবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কাফের রাজার জুলুম থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে বলেছিলেন هٰذَا اُخْتِىْ "এ হলো আমার ভগ্নি"। কোন প্রকার ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে অথবা কোন সৎ উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্যে এমনি তৌরিয়া করা শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ নয়; বরং প্রশংসনীয়। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ক্ষেত্রেও একথাই প্রযোজ্য। কেননা, যে বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে চরম কষ্ট দিয়েছে এবং কেনান থেকে মিশরের এ সফরে বিন ইয়ামীনকেও নির্যাতন করেছে তাদের কাছ থেকে বিন ইয়ামীনকে রক্ষার জন্যে হযরত ইউসুফ (আঃ) এ কৌশল গ্রহণ করেছিলেন।

আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি একথাও লিখেছেন, বিন ইয়ামীনকে রক্ষা করার জন্যে হযরত ইউসুফ (আঃ) যে কৌশল গ্রহণ করেছেন তা আল্লাহ্ পাকের হুকুম মোতাবেকই করেছেন। তাই পবিত্র কোরআনের এ বাক্যটি كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ একথারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তবে পবিত্র কোরআনের বর্ণনা-শৈলী দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, এমন কৌশল সে ব্যক্তিই গ্রহণ করতে পারেন যাকে আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে বিশেষ এলম দান করা হয়েছে আর এমন এলম মানুষের উচ্চ মর্তবার কারণ হয়। এজন্যেই এ ঘটনার বিবরণের পর আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ[১]

نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৪, পৃঃ ৫২

"আমি যাকে ইচ্ছা তার মর্তবা বুলন্দ করি"।

ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেনঃ যখন বিন ইয়ামীন জানতে পারলো যে, মিশরের বর্তমান রাজা স্বয়ং তার ভ্রাতা হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে আল্লাহ্ পাক জীবিত রেখেছেন এবং এত উচ্চ মর্তবায় অধিষ্ঠিত করেছেন তখন সে বললো, আমি আর তোমাকে ছেড়ে যাবো না। হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেনঃ তোমাকে এখানে রাখতে হলে কোন কৌশল অবলম্বন করতে হবে আর সে কৌশলে তোমার সুনাম ক্ষুন্ন হবে। বিন ইয়ামীন বললো, যে কৌশলই করুন না কেন আমি তাতে রাজী আছি। তাই এ কৌশল অবলম্বন করা হলো। যেহেতু বিন ইয়ামীন এ কৌশল বা পরিকল্পনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ছিল এজন্যে সে নিশ্চিন্ত ছিল এবং কোন প্রকার ভুল ধারণা সে করেনি। দ্বিতীয়তঃ যখন হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর পরিচারকরা বলেছিলঃ

اِنَّكُمْ لَسٰرِقُوْنَ

"নিশ্চয় তোমরা চোর"।

এ বাক্যের সঙ্গে আরো একটি কথা অপ্রকাশ্য রয়েছে তা হলোঃ

يوسف من ابيه

অর্থাৎ তোমরা ইউসুফকে তাঁর পিতার নিকট থেকে চুরি করেছ। আর একথা সত্য।

তৃতীয়তঃ হয়তো এ বাক্যটি প্রশ্নবোধক ছিল অর্থাৎ তারা জিজ্ঞাসা করেছে তোমরা কি চোর? অর্থাৎ যে কথা বলছে তার পূর্ণ বিশ্বাস নেই যে, তারা চুরি করেছে। তাই সে এভাবে কথা বলেছে। ফেকাহাবিদগণ লিখেছেনঃ নিশ্চিত ধারণার বশবর্তী হয়ে যদি কোন লোককে চোর বলা হয় তবে তাকে মিথ্যাবাদী বলা যাবে না।

فَبَدَاَ
بِاَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ اَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَآءِ اَخِيْهِ ؕ
كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ؕ مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ اِلَّاۤ اَنْ
يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ ﴿۷۶﴾
قَالُوْۤا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِيْ
نَفْسِهٖ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ اَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا
تَصِفُوْنَ ﴿۷۷﴾ قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ اِنَّ لَهٗۤ اَبًا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ اَحَدَنَا
مَكَانَهٗ ۚ اِنَّا نَرٰىكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۷۸﴾ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا
مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗۤ ۙ اِنَّاۤ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ ﴿۷۹﴾

তরজমা

(৭৬) এরপর ইউসুফ তাঁর ভাইয়ের মালপত্র তল্লাশীর পূর্বে তাদের মালপত্র তল্লাশী করতে থাকেন। অবশেষে তাঁর ভাইয়ের মালপত্র থেকে উক্ত পান-পাত্র বের করেন। এভাবে আমি ইউসুফের জন্যে কৌশল করেছিলাম। আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা ব্যতীত ইউসুফ আপন ভাইকে রাজার আইন মতে রাখতে পারতেন না। মূলতঃ আমি যাকে ইচ্ছা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করি। প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপরই আছেন সর্বজ্ঞানী।

(৭৭) ইউসুফ ভ্রাতারা বলে, সে যদি চুরি করে থাকে তবে ইতিপূর্বে তার ভাইও চুরি করেছিল। কিন্তু ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে গোপন রাখলেন। তাদের নিকট প্রকাশ করলেন না। তিনি মনে মনে বললেন, তোমরাই নিকৃষ্ট স্তরের। তোমরা যা বলছ আল্লাহ্ পাক সে সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত।

(৭৮) ইউসুফ ভ্রাতারা বলে, হে আজীজ! এর পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ। অতএব, এর স্থলে আমাদের একজনকে রেখে দিন। নিশ্চয় আমরা দেখছি আপনি মহানুভব লোকদের অন্যতম।

(৭৯) তিনি বললেন, যার নিকট আমাদের মাল পেয়েছি তাকে ব্যতীত অন্য কাউকে ধরে রাখা থেকে আমরা আল্লাহ্ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করছি। এমন কাজ করলে আমরা অবশ্যই জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।

তফসীরুল কোরআন

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর পরিচারকরা তাঁর আপন ভাই বিন ইয়ামীনের মালপত্রের তল্লাশীর পূর্বে বৈমাত্রেয় ভাইদের মালপত্র তল্লাশী করে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেছেনঃ বর্ণিত আছে যে, প্রত্যেকের মালপত্র খোলার সময় আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে "আস্তাগফিরুল্লাহ্" বলতেন। এভাবে প্রত্যেকের মালপত্রে শাহী পান-পাত্র খোঁজ করা হয় কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না। তখন শুধু বিন ইয়ামীনের মালপত্র রয়েছিল। হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেনঃ হয়তো বিন ইয়ামীন পান-পাত্র চুরি করেনি (অতএব, তার মালপত্র তল্লাশীর প্রয়োজন নেই)। কিন্তু বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা বললোঃ না, তার মালপত্রও তল্লাশী করুন যাতে করে আপনার মনেও কোন সন্দেহ না থাকে, আর আমরাও নিশ্চিন্ত হই।

ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِّعَاءِ أَخِيهِ

অবশেষে বিন ইয়ামীনের মালপত্র থেকে রাজকীয় পান-পাত্র বের করা হলো, তখন বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা লজ্জিত হলো এবং বিন ইয়ামীনের দিকে লক্ষ্য করে বললো ঃ তুমি কিভাবে এ অন্যায় কাজ করেছ? আমাদেরকে তুমি অপমানিত করেছ। হে রাহীলের সন্তান! তোমার কারণে সর্বদাই আমাদের উপর বিপদ এসেছে। বিন ইয়ামীন বললোঃ তোমাদের

কারণে রাহীলের সন্তানরা সর্বদা কষ্ট পেয়েছে। তোমরাই আমার ভাই ইউসুফকে জঙ্গলে নিয়ে ধ্বংস করেছ। তবে যে তোমাদের মালপত্রে তোমাদের অজান্তে মূলধন রেখে দিয়েছে, সে-ই আমার মালপত্রে এ পান-পাত্র রেখেছে।

যাহোক, বিন ইয়ামীনকে তখন শাহী পান-পাত্র চুরির অপরাধে বন্দী করা হলো এবং হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সম্মুখে পেশ করা হলো।

كَذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ ؕ

আমি ইউসুফের জন্যে এ কৌশল করেছি অর্থাৎ ইউসুফকে আমি এ কৌশল শিক্ষা দিয়েছি। আল্লামা বগভী লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে كيد শব্দটির অর্থ হলো হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাইদের চক্রান্তের প্রতিশোধ কেননা, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে তারা চক্রান্ত করেছিল। আল্লামা বগভী (রহঃ) একথাও লিখেছেনঃ এ শব্দটি যখন মানুষের সাথে সম্পর্কিত হয়, তখন এর অর্থ হয় 'প্রতারণা', 'ষড়যন্ত্র' আর যখন এ শব্দটি আল্লাহ্ পাকের সাথে সম্পর্কিত হয়, তখন এর অর্থ হয় সঠিক তদবির।

مَا كَانَ لِيَاْخُذَ اَخَاهُ فِىْ دِيْنِ الْمَلِكِ

"(তদানীন্তন) মিশর সরকারের আইন মোতাবেক হযরত ইউসুফ (আঃ) বিন ইয়ামীনকে তাঁর নিজের কাছে রাখতে পারতেন না"।

কি আশ্চর্য ঘটনা! চল্লিশ বছর পূর্বে একদিন যারা পিতার নিকট থেকে হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে চুরি করে জঙ্গলের অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করেছিল, আল্লাহ্ পাকের অশেষ মেহেরবানীতে অজানা মুসাফিরের কাফেলা যখন তাঁকে কূপ থেকে তুললো, তখন তারা তাঁকে তাদের পলাতক গোলাম বলে দাবী করলো এবং তাদের নিকট তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করেছিল। আজ তারা সেই হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সম্মুখে প্রথমে খাদ্য-দ্রব্যের জন্যে মুখাপেক্ষী হয়ে হাযির হয়েছে। পরে চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হয়েছে। চোরের ন্যায় তাঁর দরবারে দন্ডায়মান হয়েছে। আল্লাহ্ পাক এভাবেই কোন লোককে সম্মানিত করেন এবং কোন লোককে অপমানিত করেন। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ وَفَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ

"আমি যাকে ইচ্ছা তার মর্তবা বৃদ্ধি করি, প্রত্যেক জ্ঞানীর উপর এক মহাজ্ঞানী রয়েছেন"।

একথার ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক আলেমের উপর বড় আলেম রয়েছে, এ অবস্থা অবশেষে শেষ হয় মহান আল্লাহ্ পাকের পবিত্র সত্ত্বার উপর। কেননা, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ মহাজ্ঞানী। সব কিছুর জ্ঞান তাঁরই রয়েছে, যা কোন সৃষ্টিরই নেই।

অতএব, আলোচ্য আয়াতে عليم শব্দের দ্বারা মহান আল্লাহ্ পাককে বোঝানো

হয়েছে। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ সৃষ্টির মধ্যে এলমের ব্যাপারে একজনের উপর আরেকজনের প্রাধান্য থাকে। যেমন, হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহর প্রেরিত নবী ছিলেন, তাঁর প্রতি আসমানী কিতাব তওরাত নাজিল হয়েছে। স্বয়ং আল্লাহ পাক তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। হযরত খিজির (আঃ)-এর চেয়ে স্বাভাবিক ভাবেই তিনি অধিকতর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সৃষ্টি-রহস্যের ব্যাপারে কিছু বিশেষ এলম হযরত খিজির (আঃ)-এর ছিল যা হযরত মুসা (আঃ)-এর ছিলনা। এজন্যে হযরত খিজির (আঃ) হযরত মুসা (আঃ)-কে বলেছিলেন, হে মুসা! আল্লাহ পাক যে এলম আমাকে দান করেছেন সে সম্পর্কে আপনি অবগত নন। আর যে এলম আল্লাহ পাক আপনাকে দান করেছেন তা আমি জানিনা।

বোখারী শরীফে হযরত খিজির (আঃ)-এর সম্পর্কে যে বিস্তারিত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তাতে একথাটি রয়েছে এবং পবিত্র কোরআনেও হযরত মুসা (আঃ) এবং হযরত খিজির (আঃ)-এর ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, মানুষের মধ্যে এলমের ব্যাপারে কম-বেশী বা বড়-ছোট এর পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু যেখানে পৌঁছে এ বিষয়ের পরিসমাপ্তি ঘটে তা হলো, স্বয়ং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের মহান পবিত্র সত্ত্বা। সকল জ্ঞানের তিনিই মূল উৎস। পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই, সবকিছুই তাঁর নখদর্পণে।[১]

হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর কঠিন পরীক্ষা- প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র ইউসুফ (আঃ)-এর বিরহে সবর অবলম্বন করা, ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাইদের হিংসা-বিদ্বেষের শিকার হওয়া, মিশরের বাজারে গোলাম হিসেবে বিক্রি হওয়া, কারাগারে বন্দী হওয়া, এসব কষ্টকর অবস্থায় ধৈর্য ও সহনশীলতার কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, অবশেষে তাঁর মিশরে সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া, হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার প্রতীক বৈমাত্রেয় ভাইদের হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সম্মুখে সাহায্য প্রার্থী হিসেবে হাযির হওয়া এবং তাদের প্রতি হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর উদারতা, মহানুভবতা প্রকাশ করা, দু' সহোদরের পুনঃমিলন– এসব ঘটনার মধ্যে যত রহস্য রয়েছে এবং পূর্বে কি ঘটেছে, বর্তমানে কি ঘটছে ও ভবিষ্যতে কি ঘটবে, এসব বিষয় সম্পর্কে এক আল্লাহ পাকই সম্পূর্ণ অবগত। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَوْقَ كُلِّ ذِىْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ

অর্থাৎ সকল জ্ঞানীর উপরে রয়েছেন মহাজ্ঞানী আল্লাহ পাক।

قَالُوْا اِنْ يَّسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخٌ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা বললো, বিন ইয়ামীন যদি চুরি করে থাকে তবে তা বিস্ময়কর নয়; কেননা ইতিপূর্বে তার ভাইও চুরি করেছিল।

---

[১] তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ১৮২

অর্থাৎ তাদের ভাষায় ইউসুফ (আঃ)-ও চুরি করেছিলেন। তফসীরকারগণ একথাটির একাধিক ব্যাখ্যা করেছেনঃ

সাঈদ এবনে জুবাইর (রহঃ) এবং কাতাদা (রহঃ) বলেছেন, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নানার একটি মূর্তি ছিল, সে তার পূজা করতো। হযরত ইউসুফ (আঃ) গোপনে তা ভেঙ্গে ফেলে দিয়েছেন, যেন তাঁর মাতা রাহীলের পিতা মূর্তি পূজা না করতে পারে। এবনে মরদবিয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এবনে জরীর, এবনুল মুনজের, এবনে আবি হাতেম, আবুশ শেখ, সাঈদ এবনে জুবায়েরের সূত্রেও এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আল্লামা বগভী লিখেছেন, মুজাহেদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেনঃ ফকীর আসলে হযরত ইউসুফ (আঃ) দস্তরখান থেকে খাবার উঠিয়ে ফকীরকে দিয়ে দিতেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, হযরত ইউসুফ (আঃ) এমন পরিবারের লোক ছিলেন যাঁদের বৈশিষ্ট্য ছিল দানশীলতা। তাই ফকীরকে দান করাতে হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর আদৌ কোন অসন্তুষ্টি ছিলনা। কিন্তু হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা হিংসার কারণেই হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সম্পর্কে এমন আপত্তিকর মন্তব্য করেছিল।

মোহাম্মদ এবনে এসহাক (রহঃ) মুজাহেদ (রহঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর মাতা এন্তেকালের পর তিনি তাঁর ফুফু বিনতে ইসহাকের নিকট বাস করতে লাগলেন। ফুফু তাঁকে অত্যধিক স্নেহ করতেন। অত্যন্ত যত্ন সহকারে তিনি তাঁকে লালন-পালন করেন। যখন তিনি বড় হলেন তখন পিতা ইয়াকুব (আঃ) তাঁর বোনকে বললেন, এবার ইউসুফকে দিয়ে দাও, আমি এখন আর ক্ষণিকের জন্যেও ইউসুফের বিরহ সইতে পারিনা। তাঁর বোন বললেন, তা হতে পারেনা। হযরত ইয়াকুব (আঃ) বললেন, আমি আর তোমার কাছে তাকে ছেড়ে যাব না। বোন বললেন, আচ্ছা! তাহলে আর কয়েকটি দিন তাকে আমার কাছে থাকতে দাও হয়তো আল্লাহ পাক তার ব্যাপারে আমাকে সবর করার তওফিক দান করবেন। হযরত ইয়াকুব (আঃ)-তাঁর বোনের একথা মেনে নিলেন।

হযরত ইসহাক (আঃ)-এর একটি কোমরবন্দ ছিল যা ওয়ারিশ সূত্রে পরিবারের বড় সন্তানকে দেয়া হত। হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর বোন তাঁর বড় ছিলেন, তাই কোমরবন্দটি তিনিই পেয়েছিলেন। হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর বোন ঐ কোমরবন্দটি হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কোমরে পরিয়ে দিলেন। এরপর নিজেই বললেন, হযরত ইসহাক (আঃ)-এর কোমরবন্দটি পাওয়া যাচ্ছেনা। প্রত্যেকের নিকট তা তল্লাশি করা হলো। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নিকট তা পাওয়া গেল। তখন তাঁর ফুফু বললেন, এখন ইউসুফ আমার নিকটই থাকবে। হযরত ইয়াকুব (আঃ) বলেন, যদি সে এমন কাজ করে থাকে তবে অবশ্যই থাকবে কেননা হযরত ইসহাক (আঃ)-এর বিধান হলো, যদি কেউ কারো কিছু অপহরণ করে তবে অপহরণকারী ব্যক্তির মালিক হয় ঐ জিনিসের মালিক। হযরত ইয়াকুব

(আঃ)-এর বোন এ তদবিরে আমৃত্যু তাঁকে নিজের কাছেই রেখেছিলেন। আর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা এ ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেঃ

إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ

(যদি বিন ইয়ামীন চুরি করে থাকে তবে তা বিস্ময়কর কিছু নয়, কেননা ইতিপূর্বে তার ভাইও চুরি করেছিল।)[১]

তফসীরকারগণ বলেছেন, সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও নির্বোধ বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করলোনা। নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করার লক্ষ্যে তারা বিন ইয়ামীনের বিরুদ্ধেও কথা বললো। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর উদারতা-মহানুভবতা এবং ধৈর্য ও সহনশীলতা ছিল অপরিসীম, তাঁর প্রতি এমন নির্জলা অপবাদ দিল তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা তবুও তিনি ক্ষণিকের জন্যে সংযম হারাননি, বরং ধৈর্যের পাহাড় হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তখনও তিনি বললেন না যে, যার বিরুদ্ধে তোমরা এত মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছ তিনি তোমাদের সম্মুখে বর্তমান। তোমরা তাঁরই নিকট সাহায্যের জন্যে হাযির হয়েছ। অতএব, মিথ্যা কথা পরিহার কর। তিনি এমন কোন কথাই বললেন না, তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ

ইউসুফ তখন মনের কথা মনেই চেপে রাখলেন, কিছুই প্রকাশ করলেন না, যেন তিনি কোন কিছুই শ্রবণ করেননি। আর তাদের নিকট একথাও প্রকাশ করলেন না যে আমি তোমাদের কথা শুনেছি, তিনি মনে মনে বললেনঃ

قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا

অর্থাৎ তোমরাই অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্তরের লোক। কেননা তোমরা পিতা থেকে তাঁর পুত্রকে চুরি করেছ (অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে) অথচ যে নেককার, তার প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছ। মূলতঃ তোমরা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলছো।

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۝

তোমাদের কথার সঠিক তত্ত্ব সম্পর্কে আল্লাহ পাক সর্বাধিক অবগত, অর্থাৎ আল্লাহ পাক ভালভাবেই জানেন যে, তোমরা মিথ্যা কথা বল। আর আল্লাহ পাক প্রকৃত অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থাও করবেন।[২]

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ১৮৩
তফসীরে তবরী, খন্ড-১৩, পৃঃ ১৯-২০
তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু), পারা-১৩, পৃঃ ৮
২। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-১৩, পৃঃ ৩৩
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৪, পৃঃ ৫৫

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা যখন উপলব্ধি করলো যে বিন ইয়ামীনকে তারা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেনা, তখন তারা অত্যন্ত রাগান্বিত হয়। হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর সন্তানদের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই, তারা যখন রাগান্বিত হত তখন সহ্য করার শক্তি কারোরই থাকতো না। তন্মধ্যে রুবিল নামক ভ্রাতার অবস্থা এই ছিল, যখন সে রাগান্বিত হতো এবং রাগের কারণে চিৎকার করতো তখন অন্তসত্বা মহিলাদের সন্তান ভয়ের কারণে পড়ে যেত। এর পাশাপাশি তার অন্য একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল, এই রাগের সময় হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর বংশধরদের মধ্যে যদি কেউ তাকে স্পর্শ করতো তবে তার রাগ থেমে যেতো। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, এ বৈশিষ্ট্য ছিল সামউনের।

যাহোক, তারা সকলে একত্রিত হয়ে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নিকট পৌঁছল। তখন রুবিল বললো, আমাদের ভাইকে ফেরত দাও নতুবা আমি এমন উচ্চস্বরে চিৎকার দেব যে মিশরের প্রত্যেকটি অন্তসত্বা নারীর উদরস্থ সন্তান নিক্ষিপ্ত হবে। ক্রোধের কারণে রুবিলের দেহের পশমগুলো দাড়িয়ে গেল। হযরত ইউসুফ (আঃ) তখন তাঁর কনিষ্ঠ শিশুকে বললেন, তুমি রুবিলের নিকট যাও এবং তার হাত স্পর্শ কর। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি তার কনিষ্ঠ পুত্রকে বলেছেন তার হাত ধরে আমার নিকটে নিয়ে আস, শিশু যখন রুবিলের হাত স্পর্শ করলো তখন তার রাগ থেমে গেল। সে তখন বললো, মনে হয় এখানে হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর কোন বংশধর আছে। হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেন, হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর পুত্রই এখানে বর্তমান রয়েছে।

বর্ণিত আছে যে, রুবিল দ্বিতীয় বার রাগান্বিত হয়। তখন হযরত ইউসুফ (আঃ) তার দেহ স্পর্শ করলেন এবং তাকে ধরে জমীনে ফেলে দিলেন এবং বললেন, তোমরা ধারণা করেছ দুনিয়াতে তোমাদের চেয়ে শক্তিশালী কেউ নেই। যখন বিষয়টি এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেল তখন বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা উপলব্ধি করলো যে বিন ইয়ামীনকে তারা কোনভাবেই ফেরত নিতে পারবে না। তখন তারা অত্যন্ত বিনীত হলো এবং অনুনয় বিনয় করে বললোঃ

قَالُوا يَاأَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا

হে আজীজ! বাড়ীতে তার একমাত্র পিতা রয়েছে, তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ লোক, তাঁর পুত্র ইউসুফের অবর্তমানে বিন ইয়ামীনই তাঁর সান্ত্বনার একমাত্র উপকরণ। আমরা লক্ষ্য করছি আপনি অত্যন্ত দয়া পরবশ এবং অতি নেককার। দয়া করে আপনি তাকে ছেড়ে দিন এবং তার স্থলে আমাদের একজনকে রেখে দিন। আপনি আমাদের প্রতি অনেক দয়া করেছেন, আমাদেরকে সরকারী মেহমানখানায় রেখেছেন, আমাদের খাদ্য-দ্রব্য পূর্ণ পরিমাপে দিয়েছেন, আমরা তার বিনিময়ে যে মূল্য আদায় করেছি তা আপনি দয়া করে ফেরত দিয়েছেন, নিঃসন্দেহে এটি আপনার মহানুভবতা, তাই আমাদের এ অনুরোধটি রাখুন। আপনি দয়া করতে অভ্যস্ত, আপনি আপনার এ দয়ার অভ্যাস অব্যাহত রাখুন এবং দয়া

করে বিন ইয়ামীনের স্থলে আমাদের একজনকে ধরে রাখুন এবং তাকে ছেড়ে দিন।[১]

قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ

হযরত ইউসুফ (আঃ) তাদের কথার জবাবে বললেনঃ যার নিকট আমাদের মাল পাওয়া গেছে তার স্থলে আমরা অন্যকে আটক করতে পারিনা। এটি একান্ত জুলুম। আমরা জুলুম করা থেকে আল্লাহ্ পাকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, যে অপরাধী তারই শাস্তি হবে, অন্যের নয়।

اِنَّاۤ اِذًا لَّظٰلِمُوْنَ ۝

যদি আমরা তা করি তবে এমন অবস্থায় আমরা জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হব, অর্থাৎ যার নিকট আমাদের মাল পাওয়া গেছে তাকে আটক রাখা হবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্যে। কিন্তু তার স্থলে অন্যকে ধরে রাখা হবে জুলুম। আমরা জুলুম করতে পারিনা। বস্তুতঃ ইসলামী শরীয়ত এর অনুমতি দেয়না যে একজন অপরাধ করবে আর শাস্তি ভোগ করবে অন্যজন। এমনকি কেউ যদি অন্যের অপরাধের শাস্তি ভোগ করার জন্যে নিজেকে পেশ করে তবে এমন প্রস্তাব গ্রহণের অধিকার বিচারকের বা ফরিয়াদীর নেই।[২]

فَلَمَّا اسْتَيْـَٔسُوْا مِنْهُ
خَلَصُوْا نَجِيًّا ؕ قَالَ كَبِيْرُهُمْ اَلَمْ تَعْلَمُوْۤا اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ
مَّوْثِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُّمْ فِيْ يُوْسُفَ ۚ فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ
حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْۤ اَبِيْۤ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِيْ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۝٨٠ اِرْجِعُوْۤا
اِلٰۤى اَبِيْكُمْ فَقُوْلُوْا يٰۤاَبَانَاۤ اِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ۚ وَمَا شَهِدْنَاۤ اِلَّا بِمَا عَلِمْنَا
وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ۝٨١

তরজমা

(৮০) এরপর যখন তারা তাঁর নিকট থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয় তখন তারা নির্জনে

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ১৮৪-৮৫
২। তফসীরে মাজেদী, খন্ড-১, পৃঃ ৫০২

বসে পরামর্শ করলো, তাদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিল সে বললো, তোমরা কি জাননা যে তোমাদের পিতা তোমাদের নিকট থেকে আল্লাহ্ পাকের নামে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন, আর ইতিপূর্বে তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে কি অপরাধ করেছিলে? অতএব, যে পর্যন্ত না পিতা আমাকে আদেশ প্রদান করেন অথবা আল্লাহ্ পাক আমার জন্যে কোন ব্যবস্থা করেন সে পর্যন্ত আমি এ দেশত্যাগ করবো না। আর আল্লাহ্ পাকই সর্বোত্তম মীমাংসাকারী।

(৮১) তোমরা তোমাদের পিতার নিকট ফিরে যাও এবং বল হে আমাদের পিতা! আপনার পুত্র চুরি করেছে, আমরা যা জানি তারই বিবরণ দিলাম। অদৃশ্য বিষয়ে আমরা অবহিত ছিলাম না।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাইদের দ্বিতীয় বার মিশর সফরের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াতে সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের বিষয় আলোচিত হয়েছে।[১]

এ পর্যায়ে ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন, যখন বিন ইয়ামীনের মালপত্রে শাহী পান-পাত্র পাওয়া গেল এবং হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর শরীয়ত মোতাবেক বিন ইয়ামীনকে মিশরে রেখে দেয়ার সিদ্ধান্ত হলো, তখন ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা একটি প্রস্তাব দিল। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ

"বিন ইয়ামীনের স্থলে আমাদের একজনকে ধরে রাখুন"।

কিন্তু হযরত ইউসুফ (আঃ) তাদের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন, যার কাছে আমাদের মাল পাওয়া গেছে শুধু তাকেই আটক রাখা হবে, অন্য কাউকে নয়। যদি অন্য কাউকে তার স্থলে আটক রাখা হয় তবে তা হবে জুলুম আর আমরা জুলুম করতে পারি না।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর এ জবাব শ্রবণ করে বিন ইয়ামীনের মুক্তির ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়। এ অবস্থার বিবরণ দিয়ে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াত এরশাদ করেছেনঃ

فَلَمَّا اسْتَيْئَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا

এরপর যখন তারা বিন ইয়ামীনের মুক্তির ব্যাপারে হযরত ইউসুফ (আঃ) থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয় তখন তারা একান্তে পরামর্শ করতে বসলো আর এ পরামর্শের কারণ এই, তারা পিতার নিকট থেকে আল্লাহ্ পাকের নামে অঙ্গীকার করে বিন ইয়ামীনকে নিয়ে এসেছিল।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৪, পৃঃ ৫৫

এমন অবস্থায় বিন ইয়ামীনকে এখানে রেখে কিভাবে তারা পিতার নিকট হাযির হবে? দ্বিতীয়তঃ যদি তারা পিতার নিকট ফিরে না যায় যিনি একজন অতি বৃদ্ধ মানুষ এমন অবস্থায় তাঁর কি অবস্থা হবে?

তৃতীয়তঃ পরিবারবর্গের লোকদের খাদ্য-দ্রব্যের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি অথচ খাদ্য-দ্রব্য তাদের নিকটই রয়েছে। এতদ্ব্যতীত, যদি তাদের কেউ পিতার নিকট ফিরে না যায় তবে তিনি উপলব্ধি করবেন, হয়তো তাঁর সকল সন্তানই এ সফরে ধ্বংস হয়ে গেছে, আর তা হবে তাঁর জন্যে অত্যন্ত কষ্টদায়ক ব্যাপার। পক্ষান্তরে, যদি তারা বিন ইয়ামীনকে রেখে পিতার নিকট ফিরে যায় তবে তাদের জন্যে তা-ও হবে অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার। কেননা এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হবে যে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ব্যাপারে ইতিপূর্বে তারা যে চক্রান্ত করেছিল হয়তো বিন ইয়ামীনের ব্যাপারেও অনুরূপ চক্রান্তই করেছে। এমন অবস্থায়-

قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا

তাদের মধ্যে বয়স এবং বুদ্ধিতে যে বড়, সে বললো, তোমরা বাড়ী যেতে চাও যেতে পার, কিন্তু আমি যেতে পারবনা।

أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ

তোমাদের কি মনে নেই? বিন ইয়ামীনের হেফাজতের ব্যাপারে আল্লাহ্ পাকের নামে পিতার নিকট যে কঠিন অঙ্গীকার করেছিলে। এতদ্ব্যতীত, ইউসুফের ব্যাপারে তোমরা যে অপরাধ করেছিলে, সে কলংক আজও মুছে যায়নি। এমন অবস্থায় কিভাবে আমি পিতাকে মুখ দেখাব? আমার পক্ষে তা সম্ভব হবেনা।

আলোচ্য আয়াতে যাকে كبير বা বড় বলা হয়েছে তিনি কে? আর বড় কোন্ হিসেবে? বয়সে? না, জ্ঞান-বুদ্ধিতে?

এ প্রশ্নের জবাবে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে বড় বলতে জ্ঞান-বুদ্ধিতে বড় বোঝানো হয়েছে। এখানে বয়সে বড় হওয়ার কথা উদ্দেশ্য নয় আর জ্ঞান-বুদ্ধিতে বড় ছিল ইয়াহুদা। কালবী (রঃ)-ও এ মতই পোষণ করেছেন।

কাতাদা (রঃ), সুদ্দী (রঃ) এবং যাহ্যাক (রঃ) প্রমুখ তফসীরকারগণের মতে, বড় বলতে যে বয়সে বড়, তাকেই উদ্দেশ্য করা হয়ছে, আর সে হলো রুবিল। আর এ রুবিলই হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে হত্যা করার ব্যাপারে তার ভাইদেরকে বাধা দিয়েছিল।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেনঃ এ ব্যক্তি ছিল সামউন, কেননা সফরে সে-ই ছিল তাদের নেতা।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ পর্যায়ে লিখেছেনঃ বড় বলতে কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর দ্বারা বয়সে বড় উদ্দেশ্য করা হয়েছে আর সে হলো রুবিল। আর কোন কোন

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ১৮৫

তফসীরকার বলেছেন, এর দ্বারা বয়সে নয়, বরং জ্ঞান-বুদ্ধিতে যে বড় তাকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে সে হলো ইয়াহুদা।[১]

এ পর্যায়ে আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেনঃ বড় বলতে তাদের নেতাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে আর সে ছিল সামউন। মুজাহেদ (রঃ) এ মতই পোষণ করেছেন। আর কাতাদা (রঃ)-এর মতে বয়সে যে বড় তাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে সে হলো, রুবিল। অথবা জ্ঞান-বুদ্ধিতে যে বড়, তার উদ্দেশ্যেই এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, সে হলো ইয়াহুদা। এ মত প্রকাশ করেছেন ওয়াহাব এবনে মোনাব্বেহ (রঃ) এবং কালবী (রঃ)। আর মোহাম্মদ এবনে মোনাব্বেহ (রঃ) বলেছেন, সে ছিল লাওয়া।[২]

فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ حَتّٰى يَاْذَنَ لِىْٓ اَبِىْٓ اَوْ يَحْكُمَ اللّٰهُ لِىْ

"অতএব, আমি এদেশ ছাড়বো না যে পর্যন্ত না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ পাক আমার ব্যাপারে আদেশ জারী করেন"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ এর অর্থ হলো, যে পর্যন্ত আল্লাহ পাক আমার ব্যাপারে হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর মাধ্যমে এখান থেকে চলে যাওয়ার বা ভাই বিন ইয়ামীনকে রেখে যাওয়ার আদেশ জারী না করেন সে পর্যন্ত আমি এ দেশ ছেড়ে যাবনা।

অথবা আল্লাহ পাক যদি আমার মৃত্যুর আদেশ জারী করেন, যদি আল্লাহ পাক আমার ভাই বিন ইয়ামীনকে মুক্ত করার জন্যে মিশর সরকারকে আদেশ দেন অথবা ভাইকে মুক্ত করার জন্যে মিশরবাসীর সঙ্গে যুদ্ধ করার আদেশ দেন। এসব ব্যবস্থা ব্যতীত আমি এদেশ ছেড়ে যাবনা।[৩]

وَهُوَ خَيْرُ الْحٰكِمِيْنَ ۝

"আর আল্লাহ পাকই উত্তম মীমাংসাকারী"।

কেননা তিনি যে আদেশ দেন তার মধ্যেই থাকে সার্বিক কল্যাণ। আল্লাহ পাকের আদেশের বৈশিষ্ট্য হলো তাতে থাকে ন্যায়বিচার, সত্য, সুন্দর এবং কল্যাণ। অতএব যদি এসব ঘটনা শ্রবণ করে আব্বাজান আমাকে মিশর থেকে বিদায় গ্রহণের অনুমতি দান করেন অথবা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে কোন ব্যবস্থা হয়, শুধু এ অবস্থায়ই আমি মিশর থেকে বের হব।[৪]

সে তাদেরকে বলে, তোমরা পিতার নিকট ফিরে যাও এবং তাঁকে বল, আমরা বিন ইয়ামীনের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে আপনার নিকট অঙ্গীকার করেছিলাম, আমরা সে অঙ্গীকার অক্ষরে অক্ষরে রক্ষা করেছি, তার রক্ষণাবেক্ষণে আমরা সামান্যতম ত্রুটিও

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৮, পৃঃ ১৮৭-৮৮
২। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-১৩, পৃঃ ৩৫
৩। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ১৮৬
৪। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৮, পৃঃ ১৮৮

করিনি। কিন্তু এতদসত্বেও অদৃষ্টের লিখনকে কেউ খন্ডন করতে পারেনা। আর এ ব্যাপারে অদৃষ্টের সিদ্ধান্তই কার্যকর হয়েছে। আমরা গায়বী খবর জানতাম না। বিন ইয়ামীন যে চুরি করতে পারে বা চুরি করেছে একথা আমাদের জন্যে ছিল কল্পনাতীত। আমরা যা দেখেছি তাই বর্ণনা করছি। আমরা দেখেছি যে বিন ইয়ামীনের মালপত্র থেকে রাজকীয় পান-পত্র বের করা হয়েছে। এর দ্বারা জানা যায় যে সে চুরি করেছে। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, মিশরের শাসনকর্তাতো জানতো না চুরির শাস্তি স্বরূপ চোরকে গোলাম বানানো হয়, একথা সে তোমাদের কাছ থেকেই জানতে পেরেছে। তখন তারা বলে, আমরা আমাদের ধর্মে চোরের যে শাস্তি রয়েছে তা তাকে জানিয়ে দেই। পরিণামে নিজেদের কথায় নিজেরাই জড়িয়ে পড়ি। আমরা যখন আপনার নিকট তার হেফাজতের অঙ্গীকার করি তখন আমরা আদৌ জানতাম না যে সে চুরি করবে।

وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ○

আর গায়বী কথার প্রতি আমাদের কোন লক্ষ্য ছিলনা", তথা অদৃশ্য অবস্থা সম্পর্কে আমরা অবগত ছিলাম না। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ বাক্যটির তরজমা করেছেন এভাবে, রাত-দিন, ওঠা-বসা, চলা-ফেরায় আমরা তার নেগাহবান ছিলাম না। হয়তো রাত্রি কালে কেউ তার মালপত্রে রাজকীয় পান-পাত্র গোপনে রেখে দিয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে সে চুরি করেনি।

মুজাহেদ (রহঃ) এবং কাতাদা (রহঃ) বাক্যটির এ অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, আমরা যখন শপথ করে অঙ্গীকার করেছিলাম যে আমরা তার হেফাজত করবো তখন আমরা জানতাম না যে আপনার পুত্র চুরি করবে বা চুরির অপরাধে ধৃত হবে। আপনার উপর এমন বিপর্যয় আসবে যেমন বিপর্যয় এসেছিল ইউসুফের ব্যাপারে। এতদ্ব্যতীত, আমরা এমন বিষয়ে হেফাজত করার অঙ্গীকার করেছি যা থেকে হেফাজত করা সম্ভব ছিল, কিন্তু যে ঘটনা এখন ঘটেছে তা ছিল আমাদের জন্যে কল্পনাতীত।[১]

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, বাক্যটির অর্থ হলো, আমরা দেখেছি যে রাজকীয় পান-পাত্র বিন ইয়ামীনের মালপত্র থেকে বেরিয়েছে তবে প্রকৃত অবস্থা কি তা আমাদের জানা নেই। কেননা, গায়বী খবর তো আল্লাহ পাকই জানেন।[২]

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ১৮৬
তফসীরে কবীর, খন্ড-১৮, পৃঃ ১৯০

وَسْـَٔلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ
الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٨٢﴾ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ
أَمْرًا ۖ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ
هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٨٣﴾ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ
وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٨٤﴾ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ
تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ ﴿٨٥﴾
قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٦﴾

তরজমা

(৮২) আমরা (এ সফরে) যে জনপদে ছিলাম তাদেরে অধিবাসীদেরকে আপনি জিজ্ঞাসা করুন, আর যে কাফেলার সঙ্গে আমরা এসেছি, তাদেরকেও। আর নিশ্চয় আমরা সত্য বলছি।

(৮৩) ইয়াকুব বলেনঃ না, (এসব কিছুই নয়) তোমাদের মন একটি কাহিনী তোমাদের জন্যে সাজিয়ে দিয়েছে। অতএব, সবর অবলম্বন করাই উত্তম। বিচিত্র নয় যে, তাদের সকলকে আল্লাহ্ পাক এক সঙ্গে আমার নিকট এনে দেবেন। নিশ্চয় তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি বিজ্ঞানময়।

(৮৪) ইয়াকুব তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, হায় ইউসুফ! ইউসুফের শোকে তাঁর চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গিয়েছিল, তবুও তিনি আত্মসংযম করে রয়েছেন।

(৮৫) ইউসুফের বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা বললো, আল্লাহর শপথ! আপনি দেখছি ইউসুফের কথা ভুলবেন না যে পর্যন্ত না আপনি নিশ্চিহ্ন হয়ে যান অথবা মৃত্যু বরণ করেন।

(৮৬) ইয়াকুব বললেন, আমি আমার অসহনীয় দুঃখ-বেদনা আমার আল্লাহর নিকটই প্রকাশ করছি। আর আমি আল্লাহ্ পাকের নিকট থেকে এমন কিছু জানি যা তোমরা জাননা।

তফসীরুল কোরআন

হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর অন্তরে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ব্যাপারে তাঁর পুত্রদের প্রতি সন্দেহ ছিল। বিন ইয়ামীনের ব্যাপারেও যেন তিনি সন্দিহান না হন এ উদ্দেশ্যে তারা

যা বলেছে তা আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ

অর্থাৎ আমাদের কথা বিশ্বাস না হয় তবে আমরা মিশরের যে জনপদে বাস করেছি তার অধিবাসীদেরকে আমাদের কথার সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন এবং আমরা যে কাফেলার সাথে মিশর থেকে দেশে ফিরেছি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে قرية দ্বারা মিশরকে বোঝানো হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, قرية শব্দ দ্বারা মিশরের সে গ্রামকে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, যে গ্রামে সরকারী ঘোষক তাদেরকে বাধা দিয়েছিল এবং যেখান থেকে তাদেরকে মিশরে ফেরত যেতে হয়েছে।

وَالْعِيْرَ الَّتِىْٓ اَقْبَلْنَا فِيْهَا

আর যে কাফেলার সঙ্গে আমরা এসেছি তাদেরকে আপনি জিজ্ঞাসা করুন, ঐ কাফেলায় কেনানের কয়েকজন অধিবাসী ছিল। এবনে এসহাক বলেছেন, তাদের যে ভাই মিশরে থেকে যায় সে জানতো যে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনার কারণে তাদের পিতা হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর দৃষ্টিতে তারা অপরাধী। এজন্যে সে তার ভাইদেরকে বলেছে যে পিতার নিকট তোমরা একথা বলবেঃ

وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ۝

"আর নিশ্চয় আমরা সত্যবাদী"।

অর্থাৎ ইউসুফের ব্যাপারে আমাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করুন বা না করুন কিন্তু বিন ইয়ামীনের ব্যাপারে আমরা সত্যবাদী।[১]

আল্লামা আলুসী (রহঃ) বাক্যটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো আমরা এমন সম্প্রদায় যে আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই হলো সত্যবাদিতা। বিন ইয়ামীনের ব্যাপারে আমরা আপনাকে যে সংবাদ দিয়েছি তা অসত্য হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। আর আপনার সম্পর্কে আমরা এ ধারণা করিনা যে আপনি এ ব্যাপারে আমাদেরকে সন্দেহ করবেন।[২]

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী লিখেছেন, ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা বলেছে, হে আব্বাজান! যদি আমাদের কথা আপনি বিশ্বাস না করেন তবে মিশরে কোন বিশ্বস্ত লোক প্রেরণ করে আমাদের কথার সত্যতা যাচাই করে নিন, অথবা আমাদের কাফেলায় আরও যে সব লোক ছিল তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, তারা আমাদের কথার সত্যতা বর্ণনা করবে।

এখানে উল্লেখ্য, সে যুগে এ নিয়ম প্রচলিত ছিল যে অনেক লোক একত্রে ভ্রমণ

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৮, পৃঃ ১৯১
। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-১৩, পৃঃ ৩৮

করতো, একাকী ভ্রমণ করার কোন ব্যবস্থা ছিল না। একা ভ্রমণ করার অর্থ ছিল লুণ্ঠিত ও ধ্বংস হওয়া। এজন্যে তারা বলেছে, কাফেলায় আরো যারা সাথী হিসেবে ছিল তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন এবং আমাদের কথার সত্যতা যাচাই করুন।[১]

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর জীবিত থাকার কথা পিতা ইয়াকুব (আঃ)-কে জানাননি এমনকি, তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিন ইয়ামীনকেও নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন এবং পিতাকে তাঁর বিরহের কষ্ট সইতে বাধ্য করেছেন। অথচ তিনি জানতেন তাঁর বিরহের কারণে পিতার কি অবস্থা হয়েছে। এরপর বিন ইয়ামীনকে রেখে দেয়ার কারণে তাঁর কষ্ট চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। এ কাজটি দ্বারা নিষ্ঠুরতার বহিঃপ্রকাশ হয়েছে। তিনি এমন কাজ কেন করলেন?

জবাব

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) এর জবাবে লিখেছেন, হযরত ইউসুফ (আঃ) এ সম্পর্কে যা কিছু করেছেন, তা আল্লাহর হুকুমেই করেছেন। আল্লাহ পাক হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর পরীক্ষা করছিলেন একের পর এক, যেন তাঁর মর্তবা বুলন্দ করা হয় এবং তাঁর পূর্ব পুরুষদের কাতারে তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কেও বারে বারে অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। এমনকি তাঁর পুত্রকে জবেহ্ করার আদেশ দেয়া হয়। এর পূর্বে নবজাত শিশু এবং তাঁর মাকে এমন এক মরুভূমিতে রেখে দেয়া হয় যেখানে দানাপানি কিছুই ছিলনা-এ সবই ছিল তাঁর জন্যে পরীক্ষা স্বরূপ। এগুলো ছিল নবুওয়্যতের উচ্চ মর্যাদার বিভিন্ন স্তর। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এ সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর পরীক্ষা তত কঠিন ছিল না, শুধু তাঁর দু' পুত্রকে পিতার নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে পূর্বে স্বপ্নযোগে জানানো হয়েছিল যে এগারটি নক্ষত্র এবং চন্দ্র সূর্য তাঁকে সেজদা করছে। এ স্বপ্নের বাস্তবায়ন অবশ্যম্ভাবী ছিল। যা কিছু ঘটেছে, তা আল্লাহ পাকের মর্জিতে এ স্বপ্নের বাস্তবায়নের পূর্ব প্রস্তুতিই ছিল। অতএব, উত্থিত প্রশ্ন এ ক্ষেত্রে অবান্তর।

قَالَ

ইয়াকুব (আঃ) তাঁর পুত্রদের কথার জবাবে বললেনঃ কথা এমন নয়, যা তোমরা বর্ণনা করেছ।

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ اَمْرًاؕ

বরং তোমরা নিজেদের তরফ থেকে একটি কথা তৈরী করে নিয়েছ। যেহেতু হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর এ পুত্ররাই হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তাই তিনি তাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেননি। তত্ত্বজ্ঞানীগণ একথাও বলেছেন যে, হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর কথা

بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ اَنْفُسُكُمْ

"এটি হলো তোমাদের মনগড়া কথা"। একেবারে অসত্য নয়, কেননা বিন ইয়ামীনের এ ঘটনা তাঁর ছেলেদেরই পরিকল্পিত। সেই ছেলে ইউসুফ (আঃ) হোক, বা তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা।

আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁর পুত্রদেরকে বললেনঃ তোমরা বিন ইয়ামীনের হেফাজতের অঙ্গীকার করে তাকে আমার নিকট থেকে নিয়েছিলে, যখন রাজকীয় পান-পাত্র না পাওয়ার ঘটনা ঘটে তখন তোমরা একথা কেন বললে না যে, বিন ইয়ামীনের মালপত্রে রাজকীয় পান-পাত্র পাওয়া গেলেও এর দ্বারা একথা আদৌ প্রমাণিত হয়না যে, সে তা চুরি করেছে। সম্ভবতঃ অন্য কেউ তার মালপত্রে এ পান-পাত্রটি রেখে দিয়েছে। তোমরা এমন কথা বললে বিন ইয়ামীন বন্দী হতো না।

পক্ষান্তরে, তোমরা নিজেরাই ইব্রাহিমী শরীয়তের কথা বাদশাহকে জানিয়ে তাকে বন্দী করার ব্যবস্থা করেছ।[১]

শুধু তাই নয়; বরং তোমরা ইউসুফের নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বিন ইয়ামীনের অপরাধকে প্রমাণিত করার চেষ্টা করেছ। যদি তোমাদের মনে কোন প্রকার খুঁত বা কলংক না থাকত তবে কখনো তোমরা এমন অন্যায় কাজ করতেনা।

فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ ط

যাহোক, সবর অবলম্বন করাই এখন আমার জন্যে সর্বোত্তম পন্থা।

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّاْتِيَنِىْ بِهِمْ جَمِيْعًا ط

আল্লাহ পাকের দরবারে এ আশা করি যে হয়তো তিনি ইউসুফ, বিন ইয়ামীন আর তোমাদের যে ভাই মিশরে রয়েছে সকলকে একত্রে আমার নিকট এনে দেবেন।

اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ

নিশ্চয় তিনি মহাজ্ঞানী, তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই। তাঁর ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত হেকমতপূর্ণ। সমস্যা যত কঠিন এবং জটিলই হোক না কেন, আল্লাহ পাকের মহান দরবার থেকে নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। শোকে এবং দুঃখে রয়েছি, এর মধ্যেও হয়তো কোন কল্যাণ রয়েছে।

বিন ইয়ামীন বন্দী হওয়ার খবর যখন হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর নিকট আসে তখন তাঁর দুঃখ ও মনোবেদনা চরম পর্যায়ে পৌছে। তিনি মনে করলেন যে, এসব কিছুই

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৪, পৃঃ ৫৮

ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাইদের চক্রান্তের কারণেই হচ্ছে।

وَتَوَلّٰى عَنْهُمْ

"আর তিনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন"।

وَقَالَ يٰاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ

"এবং অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে বললেন, হায় ইউসুফ"!

এভাবে তিনি তাঁর মনের দুঃখ ও মনোবেদনার কথা প্রকাশ করলেন।

উম্মতের মোহাম্মদীয়ার বৈশিষ্ট্য

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, কোন বিপদাপদ দেখা দিলে "ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন" পাঠ করা উম্মতে মোহাম্মদীয়ারই বৈশিষ্ট্য। অন্য কোন উম্মতেকে এ দোয়া পাঠ করার শিক্ষা দেয়া হয়নি। হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর এ বিপদের সময়ও তিনি এ দোয়া পাঠ করেননি, তাঁর ভাষায় তিনি দুঃখ ও আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন।[১]

এখানে উল্লেখ্য, মানব প্রকৃতি সম্পর্কে যারা ওয়াকেফহাল তারা জানেন যে, কোন নতুন দুঃখ পুরনো দুঃখকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বিন ইয়ামীনকে হারানোর খবরে ব্যথিত হয়ে হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর মনে নতুন করে ইউসুফের (আঃ) বিচ্ছেদের কথা মনে পড়ে। এটিই স্বাভাবিক। এজন্যেই তিনি ঐ মুহূর্তে হায় ইউসুফ! বলে আক্ষেপ প্রকাশ করলেন। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, পিতা-পুত্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্নেহ, মায়ার যে সুদৃঢ় বন্ধন থাকে তা আম্বিয়ায়ে কেরামের ব্যাপারেও প্রযোজ্য। আর এটি নবুওয়্যতের শানের খেলাফ নয়।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রঃ) এ সম্পর্কে লিখেছেনঃ স্বভাবগত স্নেহ, মায়া, প্রীতি-ভালবাসা আল্লাহ পাকের মহব্বতের অন্তরায় নয়। তাই আল্লাহর মহব্বতের সঙ্গে এটি একত্রিত হতে পারে। যারা কামেল, তাদেরকে স্বভাবগত মহব্বত আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে গাফেল করেনা; বরং এতে আরো সাহায্যকারী হয়। যেমন হযরত ইয়াকুব (আঃ) বলেছিলেনঃ

اِنَّمَآ اَشْكُوْا بَثِّىْ وَحُزْنِىْٓ اِلَى اللّٰهِ

মূলতঃ আমি আমার দুঃখ-বেদনার কথা আল্লাহ পাকের মহান দরবারেই পেশ করি।[২]

وَابْيَضَّتْ عَيْنٰهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيْمٌ

ইউসুফের দুঃখে তার চোখ সাদা হয়ে গিয়েছিল, তবুও তিনি আত্মসংযমের পরিচয়

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ১৮৮
২। তফসীরে বয়ানুল কোরআন, পারা-১৩, পৃঃ ৪৯২
তফসীরে মাজেদী, খন্ড-১, পৃঃ ৫০৪

দিয়েছেন অর্থাৎ ইউসুফ (আঃ)-এর শোকে, বিচ্ছেদ-যাতনায় কাঁদতে কাঁদতে তাঁর নয়ন যুগল সাদা হয়ে যায়, তিনি অন্ধ হয়ে যান।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, তাঁর দর্শন শক্তি দুর্বল হয়ে গিয়েছিল, আলোচ্য আয়াতে كظيم শব্দটির ব্যাখ্যায় কাতাদা (রঃ) বলেছেন, তিনি তাঁর দুঃখের কথা মানুষকে বলতেন না, তবে পুত্রশোকে নিজেই মুহ্যমান থাকতেন, পুত্র বিচ্ছেদের আগুনে নিজেই জ্বলতে থাকতেন।

হাসান বসরী (রঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যেদিন ইউসুফ (আঃ)-কে তাঁর পিতার নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, সেদিন থেকে ঠিক আশি বছর পর পিতা-পুত্রের পুনঃমিলন হয়েছে। এ সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর নয়নের অশ্রু কোন দিন শুষ্ক হয়নি, অথচ সে সময়ে সারা পৃথিবীর মধ্যে আল্লাহ পাকের দরবারে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে প্রিয় বন্দা।

একটি প্রশ্ন

এখানে প্রশ্ন হতে পারে আধ্যাত্মিক জগতে হয় যাঁদের পদচারণা, যাঁরা আল্লাহ পাকের মা'রেফাত হাসিলের সাধনায় থাকেন রত, যাঁরা আল্লাহর রাহে নিজেকে বিলীন করে দেন, তাঁদের অন্তরের সম্পর্ক আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কিছুর সঙ্গে নেই। এক আল্লাহর মহব্বত ব্যতীত তাঁদের অন্তরে আর কোন সৃষ্টির মহব্বত স্থান পায়না। অথচ হযরত ইয়াকুব (আঃ) শুধু যে আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য ওলী ছিলেন তাই নয়; বরং তিনি ছিলেন আল্লাহর নবী। আল্লাহর নবী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পুত্র ইসুউফের (আঃ) মহব্বত তাঁর অন্তরে এত বেশী কেন হয়েছিল যাঁর বিচ্ছেদে তাঁর চোখের জ্যোতি পর্যন্ত বিদায় নেয়?

সমগ্র বিশ্ব-সৃষ্টিতেই আল্লাহ পাকের মহান কুদরত ও হেকমতের বহিঃপ্রকাশ হয়ে থাকে। সৃষ্টির প্রেম মূলতঃ স্রষ্টারই প্রেম, অতএব হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠে ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি যে গভীর প্রীতি-ভালবাসা এবং স্নেহ-মায়া ছিল, তার দ্বারা আল্লাহ পাকের প্রতি তাঁর প্রেম-ভালবাসারই বহিঃপ্রকাশ হয়েছে। যদি এ জবাব দেয়া হয় তবে বলা হবে, এতে ইউসুফের কি বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে কেননা, সমগ্র সৃষ্টি জগতই আল্লাহ পাকের মহান কুদরতের প্রকাশ-স্থল।

এতদ্ব্যতীত, এখানে একথাও প্রণিধানযোগ্য যে, যদি সৃষ্টি জগৎকে আল্লাহ পাকের কুদরতের প্রকাশ-স্থল মনে করে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্টির সঙ্গে মনের সম্পর্ক করা হয় তবে এর অনুমতি শুধু তাদেরকে দেয়া যেতে পারে যারা আল্লাহ-প্রেমের ব্যাপারে নবীন, অথচ হযরত ইয়াকুব (আঃ) ছিলেন কামেল, তিনি ছিলেন আল্লাহ পাকের প্রিয় এবং পছন্দনীয়, ইউসুফের সাথে তাঁর মনের এ গভীর সম্পর্ক কিভাবে সম্ভব হলো?

জবাব

যাঁরা আল্লাহর প্রেমে মুগ্ধ হন, যাঁরা আল্লাহর স্মরণে বিভোর থাকেন, যাঁরা আল্লাহর

প্রেমে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলীন করে দেন তাঁদের অন্তরে দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের কোন কিছুর প্রতি আকর্ষণ থাকেনা, তবে যে সব বিষয়ের সম্পর্ক আখেরাতের সঙ্গে, সেগুলোর অবস্থা স্বতন্ত্র। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দুনিয়া অভিশপ্ত এবং তাতে যা কিছু আছে সবই অভিশপ্ত, কিন্তু আল্লাহ পাকের স্মরণ আর যে সব বস্তু আল্লাহর স্মরণের উপকরণ হয় এবং আলেম ও তালেব এলম তারা (অভিশপ্ত নয়)। এই হাদীস হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত এবং এবনে মাজাহ শরীফে সংকলিত হয়েছে। আর এই হাদীস হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে যা তেবরাণী সংকলন করেছেন।

মূলতঃ আখেরাত আল্লাহ পাকের পছন্দনীয়। আর আখেরাতের সঙ্গে মনের সম্পর্কও আল্লাহর পছন্দনীয়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ

অর্থাৎ আমার খাছ বন্দাগণ যথা ইব্রাহীম (আঃ) ইসহাক (আঃ) এবং ইয়াকুব (আঃ)-এর কথা স্মরণ কর। তাঁরা আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্যের ব্যাপারে ছিলেন শক্তিশালী এবং আল্লাহ পাকের মা'রেফাত হাসিল করে হয়েছিলেন ধন্য।

إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ

"নিশ্চয় আমি তাদেরকে এক বিশেষ গুণের করেছিলাম আর তা ছিল আখেরাতের স্মরণ"।

হযরত মালেক এবনে দীনার (রঃ) একথার ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলোঃ আমি দুনিয়ার মহব্বত এবং দুনিয়ার স্মরণ তাদের থেকে বের করে দিয়েছি এবং আখেরাতের মহব্বত এবং স্মরণকে তাদের বৈশিষ্ট্য করেছি, তাদের কোন কাজ করা বা না করার একমাত্র লক্ষ্য হয় আখেরাতের সাফল্য। এ আয়াতে আখেরাতকে "দ্বার" আখ্যা দেয়ার কারণ হলো, এ দুনিয়া মানুষের আবাস-স্থল নয়, বরং প্রবাস-স্থল। আর মানুষের স্থায়ী আবাস-স্থল হলো আখেরাত। এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আখেরাত এবং আখেরাতের স্মরণই আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় এবং আখেরাতের জন্যে প্রচেষ্টা মাত্রই আল্লাহ পাকের দরবারে প্রশংসনীয়।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমাকে (স্বপ্নে) বলা হয়েছে একজন সর্দার একটি বাড়ী তৈরী করিয়েছেন। (বাড়ীর ভেতর) দস্তরখান বিছানো হয়েছে। (যারা আহার করবে) তাদেরকে আহবান করার জন্যে একজন আহবায়ক প্রেরণ করা হয়েছে, (আহবায়ক) লোকদেরকে খাবার গ্রহণের জন্যে আহবান জানায়। যারা দাওয়াত কবুল করে তারা ঘরে এসে খাবার গ্রহণ করে, আর সর্দার তার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। আর যে ঐ দাওয়াত গ্রহণ করেনি, সে ঘরেই প্রবেশ করেনি এবং

খাবারও গ্রহণ করেনি, সর্দার তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। অতএব, এক্ষেত্রে আল্লাহ্ পাক হলেন সর্দার, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হলেন আহ্বায়ক, দস্তরখান হলো জান্নাত। (দারমী) এটি হল মা'রেফাতের সুউচ্চ চূড়া। যেখানে শুধু কামেলগণই পৌছতে পারেন। যারা এ পথে প্রাথমিক স্তরে থাকেন বা মাধ্যমিক স্তরে থাকেন তারা এ উচ্চ মকামে পৌছতে পারেন না।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, যদি রাবেয়া বসরী মা'রেফাতের এ সুউচ্চ মর্যাদা অর্জন করতেন তবে একথা বলতেন না যে আমি জান্নাতকে জ্বালিয়ে দিতে চাই যেন লোকেরা জান্নাতের লোভে আল্লাহর এবাদত না করে। আর শুধু আল্লাহর জন্যেই তাঁর এবাদত করে। কেননা আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ اللّٰهِ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ لَاٰتٍ

"যে আল্লাহ্ পাকের মোলাকাতের আকাংক্ষা করে, আল্লাহ্ পাকের মোলাকাতের সময় আখেরাতে অবশ্যই আসবে"।

আর জান্নাত তাঁর মোলাকাতের স্থান। অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, জান্নাতের মাটি পবিত্র (খুশবুদার), তার পানি সুমিষ্ট আর সেখানে বড় বড় ময়দান রয়েছে (যাতে বৃক্ষরাজি রয়েছে) আর সে ময়দানের বৃক্ষরাজি হলো, "সোবহানাল্লাহ্ আল হামদুলিল্লাহ্ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার"। (তিরমিযী শরীফ)

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে যে এর প্রত্যেকটি শব্দের বদলে তোমাদের জন্যে জান্নাতে বৃক্ষ লাগানো হবে।[১]

প্রিয়নবী (দঃ)-এর সৌন্দর্য

হযরত মোজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ) লিখেছেন, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ পাক যে সৌন্দর্য দান করেছেন তার প্রকৃত রূপ দেখার ক্ষমতা মানব চক্ষুর নেই। যেমন যিনি তাঁকে এ সৌন্দর্য দান করেছেন তথা আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন, তাঁর দর্শন লাভের শক্তি পৃথিবীতে কারোই নেই। আখেরাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রকৃত সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ হবে, তখন তাঁর প্রকৃত রূপ দেখা যাবে।

একথা সত্য যে হযরত ইউসুফকে (আঃ) সারা পৃথিবীকে প্রদত্ত সৌন্দর্যের দু' তৃতীয়াংশই দেয়া হয়েছিল, তবে তা দুনিয়াতে। আখেরাতে হযরত মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সৌন্দর্যই দেখা যাবে (অন্য কোন নবীর এত সৌন্দর্য দেখা যাবেনা)। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ১৯১

আমার ভাই ইউসুফ (আঃ) অত্যন্ত ফর্সা বর্ণের ছিলেন। আর আমি অধিকতর লাবণ্যময়। তত্ত্বজ্ঞনীগণ ফর্সা ও লাবণ্যের যে পার্থক্য নির্ণয় করেন তা হলো চন্দ্র ও সূর্যের এবং রৌপ্য ও স্বর্ণের পার্থক্যের ন্যায়। ইউসুফ (আঃ)-এর সৌন্দর্যের উপর আকৃষ্ট ছিলেন হযরত ইয়াকুব (আঃ) সহ অন্যান্য মানুষ। পক্ষান্তরে, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বত রাখেন স্বয়ং হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর প্রতিপালক আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন। মাটি কিভাবে স্বয়ং বিশ্ব স্রষ্টার সমান হতে পারে?

এ আলোচনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাকের প্রেমে মুগ্ধ-মত্ত হওয়ার পর কোন সৃষ্টির প্রতি মনের আকর্ষণ থাকতে পারেনা। আল্লাহর প্রেমিকের মনে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর স্থান থাকেনা। কিন্তু এর দ্বারা একথা জরুরী হয়না যে আম্বিয়ায়ে কেরামের মহব্বত থেকেও প্রেমিকের অন্তর খালি হয়ে যাবে। কেননা আম্বিয়ায়ে কেরামের মহব্বত প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাকেরই মহব্বত।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের মধ্যে কেউ সে পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবেনা যে পর্যন্ত আমার সঙ্গে তার মহব্বত স্বীয় পিতা, সন্তান-সন্তুতি এক কথার সকলের চেয়ে অধিকতর না হবে। এই হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত আনাস (রাঃ)।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত আর একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যার মধ্যে তিনটি কথা পাওয়া যাবে সে ঈমানের স্বাদ পাবে। তন্মধ্যে একটি হলো যার অন্তরে আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে সব কিছু থেকে অধিকতর মহব্বত হবে, সে ঈমানের স্বাদ লাভ করবে।[১]

মাসায়েলুল কোরআন

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, বিপদের সময় ক্রন্দন করা এবং আক্ষেপ প্রকাশ করা জায়েয। তবে আক্ষেপ প্রকাশের মধ্যে সীমা লংঘনের অনুমতি নেই। যথা কপালে আঘাত করা, জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেলা। ইসলামী শরীয়ত এর অনুমতি দেয়না। ব্যথিত ও মর্মাহত হওয়া বা আক্ষেপ প্রকাশ করা মানুষের স্বভাবগত ব্যাপার এবং আয়ত্বের বাইরের বিষয়। আর যা মানুষের আয়ত্বে নেই তার ব্যাপারে শরীয়ত বিধি-নিষেধ আরোপ করেনা। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে। তিনি বর্ণনা করেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পুত্র হযরত ইব্রাহীম (রাঃ) মরণোন্মুখ অবস্থায় ছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন এ অবস্থা দেখলেন তখন তাঁর নয়ন যুগল থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো। এ দৃশ্য দেখে হযরত আবদুর রহমান এবনে আওফ (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আপনি ক্রন্দন করছেন? তখন তিনি এরশাদ করেলেন, হে এবনে আওফ!

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ১৯৫-৯৬

এ হলো মনের নম্রতা। এরপর অন্য অবস্থা হলো। তখন তিনি এরশাদ করলেন, নয়ন কাঁদে, মন ব্যথিত হয় তবে আমরা রসনা দ্বারা এমন কথা বলিনা যার কারণে আমাদের প্রতিপালক অসন্তুষ্ট হন। হে ইব্রাহীম! আমরা তোমার জন্যে চিন্তিত, ব্যথিত।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত উসামা এবনে জায়েদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহে ওয়াসাল্লামের এক পৌত্রের শেষ সময় ছিল, গড়-গড়ার শব্দ শুরু হয়ে গিয়েছিল। এ অবস্থায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন। ঐ দৃশ্য দেখে তাঁর নয়ন-যুগল থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে। হযরত সা'দ (রাঃ) ঐ দৃশ্য দেখে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! এটি কি? তিনি এরশাদ করলেন, এটি হলো মনের নম্রতা, স্নেহ মায়া আল্লাহ পাক তাঁর বন্দার অন্তরে রেখে দিয়েছেন, আল্লাহ পাক তাঁর দয়াদ্র বন্দাদের প্রতি দয়া করেন।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হাদীস সংকলিত হয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক চক্ষু দ্বারা ক্রন্দণ করলে এবং ব্যথিত ও মর্মাহত হলে শাস্তি দেননা তবে "এর" জন্যে শাস্তি দেন। "এর" জন্যে বলে তিনি রসনার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, আর মৃতকে আজাব দেয়া হয়। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) এ হাদীসের অনুবাদ এভাবে করেছেন, যদিও মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন তার ভাল কাজের উল্লেখ করে তার জন্যে কাঁদতে থাকে কিন্তু তবু তার প্রতি আজাব হয়।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি অসন্তুষ্ট সে ব্যক্তির প্রতি যে শোক প্রকাশার্থে মুখে আঘাত করে, পোশাক ছিড়ে ফেলে।[১]

যাহোক, হযরত ইয়াকুব (আঃ) ইউসুফ (আঃ)-এর জন্যে কাঁদতে কাঁদতে তাদের নিকট থেকে চলে যান। কেননা, ইউসুফের (আঃ) বিচ্ছেদের পর বিন ইয়ামীনের বিচ্ছেদ যেন মড়ার উপর খাড়ার ঘা হিসাবে এসেছে। তাই তিনি হায় ইউসুফ! বলে আক্ষেপ করলেন। মূলতঃ যে যত বড়, যার মর্তবা যত উচ, তার বিপদও তত বেশী। এজন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরাশাদ করেছেনঃ

نحن معاشر الانبياء اشد بلاءثم الا مثل فالامثل

আমরা পয়গম্বর সম্প্রদায়, আমাদের পরীক্ষা সর্বাপেক্ষা কঠিনতর, এরপর যে আমাদের যত অধিক পরিমাণে আমাদের ন্যায় হবে, সে অনুপাতেই হবে তার পরীক্ষা।

হযরত ইয়াকুব (আঃ) আল্লাহর নবী ছিলেন, তাই তাঁর পরীক্ষাও হবে কঠিন, এটাই

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ১৯৬-৯৭

স্বাভাবিক। এমনিভাবে, হযরত ইউসুফ (আঃ)-ও যে আল্লাহর নবী ছিলেন তাই তাঁরও পরীক্ষা হয়েছে অত্যন্ত কঠিন, আর এ পরীক্ষার মাধ্যমেই তাঁরা হয়েছেন আল্লাহর নৈকট্য-ধন্য।

قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ

ইউসুফ ভ্রাতারা বললোঃ যে পর্যন্ত আপনি নিশ্চিহ্ন না হবেন বা মৃত্যুমুখে পতিত না হবেন সে পর্যন্ত আপনি ইউসুফকে ভুলবেন না। ইউসুফের শোকে, তাঁর বিচ্ছেদ বেদনায় আপনি থাকবেন মুহ্যমান, এটিই আমাদের ধারণা।

حرضا শব্দটির অর্থ হলো রোগ বা বার্ধক্যের কারণে যে ব্যক্তি ধ্বংস-প্রায় হয়।

বিখ্যাত আরবী অভিধাণ গ্রন্থ "কামুসে" লিপিবদ্ধ আছে যে, এ শব্দটির অর্থ হলো দুশ্চিন্তা অথবা প্রেমে কিংবা বয়োবৃদ্ধ হওয়ার কারণে দেহ অথবা ধর্ম বা বিবেক-বুদ্ধি ধ্বংস হয়ে যাওয়া। যে ব্যক্তির দেহ অথবা ধর্ম বা বিবেক-বুদ্ধি ধ্বংস হয়ে গেছে অথবা অসুস্থ হওয়ার কারণে মরনোন্মুখ হয়ে পড়েছে তার সম্পর্কে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন হযরত ইয়াকুব (আঃ) ইউসুফ (আঃ)-এর বিচ্ছেদ যাতনার আগুনে পুড়তে থাকেন বছরের পর বছর। আঘাতের পর আঘাত এসেছে, তাঁর নয়ন যুগল থেকে অশ্রু ঝরছে, কিন্তু তিনি ধৈর্যহারা হননি, আল্লাহ পাকের রহমত থেকে কোন সময়ই নিরাশ হননি।

"হায় ইউসুফ!" এ কথাটি ব্যতীত কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ-অনুযোগ করেননি। তাঁর যা কিছু বলার, যা কিছু ফরিয়াদ করার তা সবই পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের দরবারেই পেশ করেছেন। তাই তাঁর পুত্রদের পূর্বোল্লোখিত মন্তব্যের জবাবে তিনি বলেছেন, পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

قَالَ اِنَّمَآ اَشْكُوا بَثِّىْ وَحُزْنِىْٓ اِلَى اللّٰهِ

ইয়াকুব বললেনঃ আমি আমার ব্যথা-বেদনার কথা এক আল্লাহ পাকের কাছেই পেশ করি, অর্থাৎ কোন মানুষের কাছে কোন দুঃখের কথা আমি বলিনা। আমার যাবতীয় ফরিয়াদ এক আল্লাহ পাকের কাছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) বর্ণনা করেছেনঃ একবার হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর এক প্রতিবেশী তাঁর নিকট আসলো, সে বললোঃ আমি লক্ষ্য করছি, আপনার স্বাস্থ্য বিনষ্ট হয়েছে, আপনি শেষ হয়ে যাচ্ছেন। একথাও বর্ণিত আছে যে, হযরত ইয়াকুব (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়, আপনার দৃষ্টি শক্তি কেন চলে গেছে এবং আপনার কোমর কেন ঝুঁকে গেছে? তিনি বললেনঃ ইউসুফের জন্যে কাঁদতে কাঁদতে আমার দৃষ্টি শক্তি চলে গেছে। আর ইউসুফের ভাইয়ের (বিন ইয়ামীন) দুশ্চিন্তায় আমার কোমর বাঁকা হয়েছে। একথার পর আল্লাহ পাক ইয়াকুব (আঃ)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করলেন। "তুমি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছ?" আমার ইজ্জতের শপথ! যতক্ষণ তুমি আমার নিকট দোয়া না করবে ততক্ষণ আমি তোমার দুঃখ দূরীভূত করবো না, তখন হযরত ইয়াকুব (আঃ) বললেনঃ

قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوْا بَثِّىْ وَحُزْنِىْ اِلَى اللّٰهِ

আমি শুধু আল্লাহ পাকের নিকটই আমার দুঃখ-বেদনার কথা বলি। আল্লাহ পাক তখন ওহী প্রেরণ করলেনঃ যদি তাদের মৃত্যুও হতো তবুও আমি তোমার জন্যে তাদেরকে জীবিত করে দিতাম। তোমার প্রতি আমার অসন্তুষ্টির কারণ হচ্ছে, একবার তোমরা বকরী জবেহ করেছিলে তখন তোমাদের দুয়ারে একজন মিসকিন এসে হাযির হয়েছিল। কিন্তু তোমরা সে বকরীর গোশ্‌ত থেকে তাকে খেতে দাওনি।

সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে আমার নিকট প্রিয় হলো নবীগণ, আর তাদের পরে মিসকিনগণ। অতএব, তুমি খাবার তৈরী করো এবং মিসকিনদেরকে দাওয়াত করো।

হযরত ইয়াকুব (আঃ) আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেক খাবার তৈরী করালেন এবং বললেন, যে রোজাদার সে আজ রাতে যেন ইয়াকুবের পরিবারের সঙ্গে খাবার গ্রহণ করে।

বর্ণিত আছে যে, এরপর হযরত ইয়াকুব (আঃ) যখনই দিনের খাবার গ্রহণ করতেন তখন ঘোষণা করতেনঃ যে দিনের খাবার গ্রহণ করতে চায় সে যেন ইয়াকুবের নিকট চলে আসে। আর যখন সন্ধ্যায় ইফতার করতেন (তথা রাতের খাবার গ্রহণ করতেন, তখনও একথা ঘোষণা করতেনঃ যে রাতের খাবার গ্রহণ করতে চায় সে যেন ইয়াকুবের নিকট চলে আসে। এভাবে হযরত ইয়াকুব (আঃ) সকাল-সন্ধ্যায় মিসকিনদের সঙ্গে খাবার গ্রহণ করতেন।

ওহাব এবনে মোনাব্বেহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ পাক হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর নিকট ওহী প্রেরণ করেন এবং এরশাদ করেন, তুমি কি জান আমি তোমাকে কেন শাস্তি দিয়েছি এবং ইউসুফকে তোমার নিকট থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছি?

হযরত ইয়াকুব (আঃ) বললেনঃ হে আমার আল্লাহ! আমি জানিনা, আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ একরার তুমি একটি বকরীর ভূনা বাচ্চা নিজেরা খেয়েছ, প্রতিবেশীর ব্যাপারে কৃপণতা করে তাকে দাওনি। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে. হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর বিপদগ্রস্ত হওয়ার কারণ হলো এই, তিনি একবার একটি বাছুরকে তার মায়ের সম্মুখে জবেহ করেছেন, আর মা তখন চিৎকার করছিল।

ওহাব এবং সুদ্দী (রঃ) বর্ণনা করেন, হযরত ইউসুফ (আঃ) যখন কারাগারে, তখন হযরত জীব্রাইল (আঃ) তাঁর সঙ্গে দেখা করেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, হে সত্যবাদী! আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন?

হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেনঃ আমি এক পবিত্র আকৃতি দেখছি এবং পবিত্র খুশবু উপলব্ধি করছি। হযরত জীব্রাইল (আঃ) বললেনঃ আমি রুহুল আমিন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের দূত।

হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেনঃ আপনি সর্বাধিক পবিত্র, আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য ফেরেশতাদের সর্দার এবং বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের বিশ্বস্ত। আর এ কারাগার হলো

পাপীষ্ঠদের প্রবেশ করার স্থান। এখানে আপনার আগমনের কারণ কি? তখন জীব্রাইল (আঃ) বললেনঃ আপনি কি অবগত নন যে, আল্লাহ্ পাক আম্বিয়ায়ে কেরামের পবিত্রতার কারণে (অপবিত্র) গৃহ সমূহকে পবিত্র করে দেন। আর যে এলাকায় আল্লাহর নবী প্রবেশ করেন সে এলাকাটি অধিকতর পবিত্র হয়ে যায়। হে পবিত্রদের মধ্যে অধিকতর পবিত্র! হে নির্বাচিত নেক বন্দাদের সন্তান! আপনার কারণে আল্লাহ্ পাক এ কারাগার ও তাঁর চারিপার্শ্বকে পবিত্র করে দিয়েছেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেনঃ আপনি আমাকে "সিদ্দীক" বলে কেন ডাকলেন? এবং নির্বাচিত পবিত্র লোকদের মধ্যে কেন অন্তর্ভুক্ত করলেন? আমাকে তো পাপীষ্ঠ লোকদের স্থানে প্রবেশ করানো হয়েছে, আমার নাম চরিত্রহীনদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

হযরত জীব্রাইল (আঃ) বললেনঃ আপনার নাম আল্লাহ্ পাক সিদ্দীকদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আল্লাহ্ পাক তাঁর নির্বাচিত বন্দাদের মাঝে আপনার নাম অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং আপনার নেককার পূর্ব পুরুষদের তালিকায় আপনাকে শামিল করেছেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাঁর দুশ্চিন্তা সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা আছে?

হযরত জীব্রাইল (আঃ) বললেনঃ সে ৭০ জন মহিলার দুশ্চিন্তার সমান, যাদের সন্তানের মৃত্যু হয়েছে। হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেনঃ তিনি এ দুশ্চিন্তার জন্যে কি পরিমাণ সওয়াব লাভ করবেন? হযরত জীব্রাইল (আঃ) বললেনঃ ১০০ শহীদের সমান। হযরত ইউসুফ (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেনঃ আপনি কি জানেন কখনও তাঁর সঙ্গে মোলাকাত হবে? হযরত জীব্রাইল (আঃ) জবাব দিলেন, জ্বী-হ্যাঁ। তখন হযরত ইউসুফ (আঃ) অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললেনঃ যা কিছু আমার সঙ্গে ঘটেছে তা আমি ভুলে যাব যদি একবার ইয়াকুবের দর্শন লাভ করতে পারি।

وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَالَا تَعْلَمُوْنَ ○

"আর আল্লাহ পাকের কথা আমি যা জানি তা তোমরা জান না"।

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের হেকমত ও রহমত সম্পর্কে তোমাদের চেয়ে আমি অনেক বেশী জানি, যারা তাঁকে ডাকে, তিনি তাদের বঞ্চিত করেন না, যে ব্যাকুল হয়ে তাঁর নিকট প্রত্যাবর্তন করে, তিনি তাঁকে ফেরত দেননা।

অথবা এর অর্থ হলো, এলহামের পন্থায় আমি জানি যে ইউসুফ জীবিত আছে কিন্তু তোমরা তা জাননা। অথবা এর অর্থ হলো আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম রহমত, দয়া মায়ার খবর আমি জানি, তোমরা তা জাননা আর এসব রহস্য-জ্ঞান আল্লাহ্ পাক আমাকে দান করেছেন। তোমরা তার কিছুই জাননা। আমার সকল আরাধনা শুধু আল্লাহ্ পাকের দরবারেই পেশ করি। আমার যা কিছু দুঃখ বেদনা রয়েছে তা আমি শুধু এক আল্লাহ্ পাকের নিকটই প্রকাশ করি আর কারো নিকট নয়।[১]

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-৬, পৃঃ ১৯৮-৯৯
তফসীরে মাজেদী, খন্ড-১ পৃঃ-৫০৪
তফসীরে বগনুল কোরআন, পৃঃ ৬৯৩

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রঃ) লিখেছেনঃ কোন সৃষ্টির নিকট নিজের দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করা উত্তম-সবর বিরোধী কাজ। কিন্তু স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাকের দরবারে ফরিয়াদ করা সবর-বিরোধী কাজ নয়।

يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ
اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٨٧﴾ فَلَمَّا
دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا
بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ
يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِيْنَ ﴿٨٨﴾ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَ
اَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ ﴿٨٩﴾ قَالُوْۤا ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ ؕ قَالَ اَنَا يُوْسُفُ
وَهٰذَاۤ اَخِيْ ؗ قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا ؕ اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ
لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٩٠﴾

তরজমা

(৮৭) হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার ভাইয়ের অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহ্ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা, কেননা কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত আল্লাহ্ রহমত থেকে কেউ নিরাশ হয়না।

(৮৮) আবার যখন তারা তাঁর নিকট উপস্থিত হয় তখন বলে, হে আজিজ! আমরা ও আমাদের পরিবারবর্গ অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়েছি এবং আমরা অতি সামান্য পুঁজি নিয়ে এসেছি, আপনি আমাদেরকে রসদ পূর্ণ মাত্রায় দিন এবং আমাদের প্রতি দান খয়রাত করুন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক দান খয়রাতকারীগণকে বদলা দিয়ে থাকেন।

(৮৯) ইউসুফ বললেন, তোমরা কি জান তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সঙ্গে কি ব্যবহার করছিলে? যখন তোমরা ছিলে অজ্ঞ।

(৯০) তারা বলল, তবে কি তুমিই ইউসুফ! তিনি বললেন, আমিই ইউসুফ এবং এই আমার ভাই, আল্লাহ্ পাক আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চয় যে তাকওয়া পরহেজগারী অবলম্বন করে এবং ধৈর্যশীল হয়, আল্লাহ্ পাক এমন নেককারদের সওয়াব বিনষ্ট করেন না।

তফসীরুল কোরআন

শানে নজুল

বর্ণিত আছে, হযরত আজরাঈল (আঃ) হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করেন। হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন এভাবে, হে পবিত্র সুগন্ধি এবং সুন্দর আকৃতি বিশিষ্ট ফেরেশতা! আপনি কি আমার সন্তানের (ইউসুফের) রুহ্ কবজ করেছেন? হযরত আজরাঈল (আঃ) জবাব দিলেন, না। একথা শ্রবণ করে হযরত ইয়াকুব (আঃ) শান্তি লাভ করলেন এবং তাঁর অন্তরে ইউসুফকে (আঃ) দেখার আকাংক্ষা সৃষ্টি হয়।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী পূর্ববর্তী আয়াত وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ এর এ অর্থ বর্ণনা করেছেনঃ আমি জানি যে ইউসুফের স্বপ্ন সত্য। আমি এবং তোমরা সকলে ভবিষ্যতে তাকে সম্মানসূচক সেজদা দেব। সুদ্দী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, যখন হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর পুত্ররা বাদশাহর উদারতা ও মহানুভবতা এবং তাঁর পরোপকারের প্রশংসা করে, তখন হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর অন্তরে এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে হযরত ইউসুফ (আঃ) জীবিত আছে এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতেরও আকাংক্ষা সৃষ্টি হয়।

এবনে আবি হাতেম নসর এবনে হারবীর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। নসর বলেছেন, আমি জানতে পেরেছি হযরত ইয়াকুব (আঃ) জীবন বা মৃত্যুর কোন খবর পাননি। অবশেষে একদিন মৃত্যুর ফেরেশতা মানব রূপ ধারণ করে হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর সম্মুখে দন্ডায়মান হলেন। হযরত ইয়াকুব (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কে? মালাকুল মাউত বললো, আমি মৃত্যুর ফেরেশতা। হযরত ইয়াকুব (আঃ) বললেন, আমি তোমাকে ইয়াকুবের মা'বুদের শপথ দিচ্ছি তুমি আমাকে বল তুমি কি ইউসুফের (আঃ) রুহ্ কবজ করেছো? তখন মালাকুল মাউত জবাব দিলেন, না। এ জবাব শ্রবণ করে হযরত ইয়াকুব (আঃ) যা বলেছেন তা আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ

আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা

হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও এবং ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সন্ধান কর, আর আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা। নিশ্চয় কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত কেউ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়না। আল্লাহ পাকের প্রতি সম্পূর্ণ ভরসা রেখে এবং আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আরাধনা পেশ করে প্রকাশ্য চেষ্টা-তদবিরের নির্দেশ দিয়েছেন হযরত ইয়াকুব (আঃ)। "হে আমার পুত্রগণ! তোমরা ইউসুফ এবং তার ভাইয়ের অনুসন্ধান কর, আর আল্লাহ পাকের রহমত থেকে কোন অবস্থাতেই নিরাশ হয়োনা"। অবস্থা যত কঠিন এবং ভয়াবহই হোক না কেন, পরিস্থিতি যতই নৈরাশ্যজনক হোক না কেন তোমরা সকল অবস্থায় আল্লাহ পাকের রহমতের আশা করবে, আল্লাহ পাকের রহমত থেকে কখনও

নিরাশ হয়োনা কেননা, শুধু কাফের সম্প্রদায়ই আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হয়। অতএব, তোমরা আল্লাহর রহমতের আশায় আশান্বিত হয়ে ইউসুফ (আঃ) এবং তার ভাই বিন ইয়ামীনের অনুসন্ধান কর, আল্লাহ পাকের মর্জি হলে তিনি পুনরায় আমাদেরকে একত্রিত করতে পারেন।[১]

হযরত আবদুল্লাহ এবন আব্বাস (রাঃ) تَحَسَّسُوْا। শব্দটির তরজমা করেছেন "তোমরা অনুসন্ধান কর", আর "রওহ" শব্দটির অর্থ হলো রহমত তথা বিপদ থেকে মুক্তি লাভ। আর যারা আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্তা এবং গুণাবলী সম্পর্কে জানেনা এবং মানেওনা, বরং অস্বীকার করে তাদেরকে আলোচ্য আয়াতে কাফের বলা হয়েছে। মূলতঃ যে আল্লাহর মা'রেফাত হাসিল করেছে সে কখনও আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়না।[২]

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা পুনরায় হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নিকট হাযির হলো। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يَاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا

"এরপর পুনরায় যখন তারা ইউসুফের নিকট যায় এবং বলে, হে আজিজ! আমরা এবং আমাদের পরিবারবর্গ অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত, দুর্ভিক্ষের কারণে আমরা অতিশয় অসহায় হয়ে পড়েছি, আমরা নিতান্ত নগণ্য বিনিময় মূল্য নিয়ে এসেছি, কিন্তু আপনি দয়া করে পূর্ণ পরিমাপে আমাদেরকে রসদ দান করুন এবং আমাদের প্রতি সদকাহ করুন, যারা দান সদকাহ করে আল্লাহ পাক নিশ্চয় তাদেরকে পুরস্কৃত করেন"।

আলোচ্য আয়াতে الضر। শব্দটির অর্থ হলো ক্ষুধার কষ্ট, আর مزجة শব্দটির ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো ত্রুটিপূর্ণ এবং অচল দেরহাম। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন আবু ওবায়েদ, এবনে আবি শায়বা, এবনে জরীর, এবনুল মুনজের, এবনে আবি হাতেম।

কিন্তু সাঈদ এবনে মনসুর, এবনুল মুনজের এবং আবুশ শেখ বলেছেনঃ একরামা (রঃ) শব্দটির তরজমা করেছেন সামান্য দেরহাম।

আবদুল্লাহ এবনে হারেস (রঃ) বলেছেন, এ শব্দটির অর্থ হলো মরুভূমিবাসীদের মালপত্র যথা ঘি-পনির।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর অর্থ হলো কাঁচা চামড়ার জুতো।

فَاَوْفِ لَنَا

অর্থাৎ ইতিপূর্বে যেভাবে আপনি আমাদেরকে খাদ্য-দ্রব্য পূর্ণ পরিমাপে দান করেছেন ঠিক সেভাবে এবারও আমাদেরকে পূর্ণ পরিমাণে খাদ্য-দ্রব্য দান করুন। যে মূল্য অবশিষ্ট

[১]। তফসীরে মাজেদী, খন্ড-১, পৃঃ ৫০৪
[২]। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ৫

থাকে তা খয়রাতি সাহায্য হিসেবে দান করুন।

অধিকাংশ তফসীরকারগণ تَصَدَّقْ عَلَيْنَا বাক্যটির এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

কিন্তু এবনে জোরায়েয এবং যাহ্যাক (রঃ) বলেছেনঃ এ বাক্যটির অর্থ হলো আপনি আপনার তরফ থেকে খয়রাত হিসেবে আমাদের ভাইকে ফেরত দিন, তাহলে আল্লাহ পাক আপনাকে দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানে উত্তম বিনিময় দান করবেন।[১]

এ পর্যায়ে ইমাম রাজী (রঃ) একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। ইয়াকুব (আঃ) তাঁর পুত্রদেরকে প্রেরণ করলেন ইউসুফ (আঃ) ও তাঁর ভাইয়ের অনুসন্ধানে। কিন্তু তারা এসে নিজেদের অভাব-অভিযোগের জন্যে মিশরের শাসনকর্তার নিকট কান্না-কাটি করে সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকে, এর কারণ কি?

ইমাম রাজী (রঃ) এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন এভাবেঃ হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা তাদের উদ্দেশ্য সফল করার পন্থা হিসেবে সর্ব প্রথম নিজেদের দুঃখ-বেদনা এবং অসহায়ত্বের কথা প্রকাশ করেছে, যাতে করে মিশরের শাসনকর্তার মন দয়াদ্র হয়। যদি তাঁর সহমর্মিতা এবং দয়া-মায়া পাওয়া যায় তবে তাদের ভাইকে ফেরত দেয়ার জন্যে আবেদন করবে। আর যদি দয়া মায়ার ভাব পরিলক্ষিত না হয় তবে তাদের ভাইয়ের ব্যাপারে নীরবতা পালন করবে। তাই তারা মিশরের শাসনকর্তার অনুগ্রহ লাভের উদ্দেশ্যে একথা বলেছে। সাধারণতঃ মানুষ যখন কোন লোককে বিপদগ্রস্ত অবস্থায় দেখে তখন তার প্রতি মনের গহনে দয়া মায়ার উদ্রেক হয়, আর যখন দয়া মায়ার ফল্গুধারা প্রবাহিত হয় তখন সব "চাওয়াই" পাওয়া যায়। মূলতঃ এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইদের মুখে স্বীয় পিতা ও পরিবারের অন্য সদস্যদের দূরবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। তাঁর নয়নযুগল থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল।[২]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর ও পরিবারের সদস্যদের অবর্ণনীয় অভাব-অনটনের কথা শ্রবণ করে এত ব্যাকুল এবং অস্থির হয়েছিলেন যে, তিনি মাথার মুকুট সরিয়ে দিয়েছিলেন। তখন তিনি আল্লাহ পাকের নির্দেশ-ক্রমে আত্মপ্রকাশ করলেন এবং তাদেরকে বললেন, তোমাদের কি মনে আছে যে, তোমরা একদিন ইউসুফ ও তাঁর ভ্রাতার সঙ্গে কি আচরণ করেছিলে?[৩]

পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَاَخِيْهِ

"তোমাদের কি মনে আছে যে, তোমরা ইউসুফ এবং তাঁর ভ্রাতার সঙ্গে কি কি করেছিলে"?

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ২০১
২। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৮, পৃঃ ২০১
৩। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু), পারা-১৩, পৃঃ ১১

إِذْ أَنتُمْ جَٰهِلُونَ

"যখন তোমরা অজ্ঞ ছিলে"?

অর্থাৎ যখন তোমাদের অন্যায় আচরণের শোচনীয় পরিণাম সম্পর্কে তোমরা অবগত ছিলেনা।

এর দ্বারা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর উদ্দেশ্য ছিল, তাদেরকে তওবার প্রতি অনুপ্রাণিত করা, নিজের ভ্রাতাদের প্রতি দয়া করা, কোন প্রকার হুমকি-ধমকি দেয়া বা তিরস্কার করা উদ্দেশ্য ছিল না। এজন্যে তফসীরকারগণ লিখেছেন যে, এ পর্যায়ে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ভাষায় তাদের প্রতি কোন প্রকার ভর্ৎসনা বা তিরস্কার নেই। ভদ্রতা, নম্রতা, উদারতা এবং মহানুভবতার এটি একটি বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত।

কালবী (রহঃ) বলেছেন, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর একথার কারণ হচ্ছে এই, তাঁর ভ্রাতাদের নিকট যখন মালেক এবনে ওরওয়ার একথা উদ্ধৃত করা হয় যে, "আমি অন্ধকার কূপে এমন একটি বালক পেয়েছি যাকে আমি এত দেরহাম দিয়ে ক্রয় করেছি", তখন তাঁর ভ্রাতারা হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে বললোঃ হে বাদশাহ! আমরাই সে বালকটিকে বিক্রয় করেছিলাম। হযরত ইউসুফ (আঃ) একথা শ্রবণ করেই রাগান্বিত হলেন এবং তাদের সকলকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। শাহী প্রহরীরা তাদেরকে হত্যা করার জন্যে নিয়ে চললো। এ সময় ইয়াহুদা পেছনের দিকে ফিরে বললো, আমাদের এক ভাইয়ের শোকে আমাদের পিতা এত চিন্তিত হয়েছেন এবং এত কেঁদেছেন যে তাঁর দৃষ্টি শক্তি চলে গেছে। যদি আমাদের সকলের মৃত্যু সংবাদ তিনি পান, তবে তাঁর কি অবস্থা হবে? তখন সকল ভাইয়েরা বললোঃ যদি আপনি আমাদেরকে মৃত্যুদন্ডই দেন তবে আমাদের পিতার নিকট আমাদের মালপত্রগুলো পৌঁছে দেবেন। তিনি অমুক স্থানে বাস করেন। একথা বলা মাত্র তাদের প্রতি তাঁর দয়া হয় এবং তিনি ক্রন্দন করতে লাগলেন। এরপর আলোচ্য আয়াতে যে কথাটি রয়েছে তা বললেন।

হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর চিঠি

আবদুল্লাহ এবনে এজিদ এবনে আবি ফরদার কথা বর্ণিত আছে, হযরত ইয়াকুব (আঃ) যখন একথা শ্রবণ করলেন যে বিন ইয়ামীনকে আটক করা হয়েছে তখন তিনি তাঁর পুত্রদের মাধ্যমে তদানীন্তন মিশরের শাসনকর্তার (হযরত ইউসুফ) নিকট পত্র প্রেরণ করলেন। তাঁর পুত্রদের এটি মিশরে তৃতীয় সফর। পত্রের ভাষাঃ

"ইয়াকুব ইসরাঈলুল্লাহ (আবদুল্লাহ) এবনে এসহাক এবনে ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ'র তরফ থেকে মিশরের বাদশাহর নামে, আল্লাহর হামদ ও প্রশংসার পর একথা জানানো যাচ্ছে যে, আমরা এমন পরিবারের লোক যারা সর্বদা বিপদগ্রস্ত। আমার দাদা ইব্রাহীম (আঃ)-কে হাত পা বেঁধে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছে। এরপর আল্লাহ পাক সে অগ্নিকে সুশীতল এবং নিরাপদ করে দিয়েছেন। আমার পিতার হাত পা বেঁধে গর্দানে ছুরি চালানো

হয়েছে যেন জবেহ করা হয়, এরপর আল্লাহ্ পাক তাঁর বদলে জান্নাত থেকে একটি দুম্বা প্রেরণ করেছেন এবং তাঁকে হেফাজত করেছেন। এখন রয়েছি আমি, আমার এক পুত্র ছিল যে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ছিল, তার ভাইয়েরা তাকে জঙ্গলে নিয়ে যায় এবং তার রক্তমাখা জামা এনে আমাকে ফেরত দিয়ে বলে বনের বাঘ তাকে খেয়ে ফেলেছে, আর এজন্যে কাঁদতে কাঁদতে আমার দৃষ্টি শক্তি শেষ হয়ে গেছে"।

"এরপর আমার আর এক পুত্র ছিল যে হারানো পুত্রের আপন ভাই ছিল, যাকে দেখে আমি কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করতাম। কিন্তু তাকে আপনি আটক করে রেখেছেন। আপনি এ ধারণা করেছেন যে সে চুরি করেছে অথচ আমরা এমন পরিবারের লোক যারা চুরি করেনা এবং আমাদের এখানে চোর পয়দাও হয় না"।

"যদি আপনি আমার পুত্রকে ফেরত দেন তবে তা উত্তম, নতুবা আমি এমন বদদোয়া করবো যে আপনার বংশধরদের মধ্যে সাত পুরুষ পর্যন্ত তার প্রতিক্রিয়া ভোগ করতে হবে"।

হযরত ইউসুফ (আঃ) পত্র পাঠ করলেন, তখন তাঁর নয়নযুগল থেকে অশ্রু ঝরতে লাগল। তিনি বলেছেন-

مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ

(যখন তোমরা জানতে না যে ইউসুফ কত উচ্চ মর্তবায় আসীন হবে, তখন তোমরা তাঁর সাথে এবং তাঁর ভাইয়ের সাথে কি ব্যবহার করেছিলে!)

اِذْ اَنْتُمْ جٰهِلُوْنَ

এ বাক্যটির অর্থ হলো যখন তোমরা ছিলে অজ্ঞ।

তবে কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেনঃ এর অর্থ হলো, "যখন তোমরা ছিলে পাপীষ্ঠ"।

হযরত হাসান (রঃ) এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো যখন তোমরা যুবক ছিলে এবং যৌবন কালের মূর্খতায় পতিত ছিলে তখন তোমরা কি করেছিলে![১]

আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) লিখেছেন, এর অর্থ হলো তোমাদের জাহেলিয়াতের যুগে যখন ভাল-মন্দের কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না তখন তোমরা কি করেছিলে তা কি স্মরণ আছে? এখনতো মনে হয় তোমরা জ্ঞান ফিরে পাচ্ছ। হযরত ইউসুফ (আঃ) এভাবে নিজেকে তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইদের সম্মুখে পেশ করেছেন। তিনি তাদেরকে কোন তিরস্কার করেননি, লজ্জা থেকে রক্ষা করার জন্যে তাদের পক্ষে একটি ওজরই পেশ করেছেন যে তোমরা তখন অজ্ঞ ছিলে। অজ্ঞতার কারণেই তোমরা এমন গর্হিত কাজ করেছ। আর তোমরা একথা জানতে না যে অবশেষে একদিন এভাবেই ইউসুফের (আঃ) স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।[২]

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ২০২-৩
২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৪, পৃঃ ৬১

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, জেহালত বা মূর্খতাই সকল পাপাচারের মূল কারণ, যে পাপী নিঃসন্দেহে সে মূর্খ।[১]

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা একথা শ্রবণ করে তৎক্ষণাৎ চিন্তা করতে লাগলো, যিনি এ কথা বলছেন তিনি ইউসুফ ননতো? যাঁকে আমরা অতি অল্প বয়সে ব্যবসায়ী কাফেলায় নিকট বিক্রয় করে দিয়েছিলাম। এরপর তারা তাঁর দিকে লক্ষ্য করে বললোঃ

قَالُوٓا ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ ؕ

"নিশ্চয় তুমিই ইউসুফ"।

এখানে উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে বিন ইয়ামীনের প্রতি আজিজের বিশেষ প্রীতি এবং অনুরক্তি লক্ষ্য করে তারা কৌতুহল বোধ করেছিল। এখন তারই মুখে ইউসুফের নাম শ্রবণ করে তারা আরো বেশী হতচকিত হয়। কোথায় মিশরের রাষ্ট্রপ্রধান! আর কোথায় কেনানের ইউসুফ, যে ইউসুফকে তারা ৪০ বছর পূর্বে মিশরের ব্যবসায়ী কাফেলার নিকট বিক্রয় করেছিল সে ইউসুফই কি আজ মিশরের রাষ্ট্রপ্রধান? যাহোক এসব দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পর তাদের মনের সকল সন্দেহ দূরীভূত হলো, তারা তাঁকে দেখতে পেলো স্বরূপে।

এবনে এসহাক (রঃ) লিখেছেন, ইতিপূর্বে হযরত ইউসুফ (আঃ) পর্দার আড়াল থেকে তাদের সঙ্গে কথা বলতেন, এখন তিনি পদার আড়াল সরিয়ে দিয়েছেন। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ভাইয়েরা তাঁকে দেখে চিনতে পারে।

যাহ্যাক (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) আলোচ্য আয়াতের কথাটি বলার সময় মুচকি হেসেছিলেন, তখন তাঁর দাঁতগুলো মুক্তার ন্যায় প্রকাশিত হয়েছিলো, ফলে তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা তাঁকে চিনতে পেরেছিল।

আতা (রহঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, ইউসুফ (আঃ)-কে তারা সে পর্যন্ত চিনতে পারেনি যতক্ষণ তিনি মাথার মুকুট না সরিয়েছেন। তাঁর মাথায় একটি বিশেষ আলামত ছিল, যা ওয়ারিশ সূত্রে তিনি পেয়েছিলেন। এ আলামত হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর মাথায়ও ছিল, হযরত ইসহাক (আঃ)-এর মাথায় ছিল এবং তাঁর মাতা হযরত সারারও ছিল। এ আলামত দেখেই তারা বলে উঠেছিল, নিঃসন্দেহে তুমিই ইউসফ। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা নিশ্চিত হয়ে কথাটি বলেনি; বরং নিতান্ত ধারণার ভিত্তিতেই কথাটি বলেছিল।

قَالَ اَنَا يُوْسُفُ وَهٰذَآ اَخِىْ ۫

হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেন, হ্যাঁ, আমিই সেই ইউসুফ, আর এ হলো আমার ভাই বিন ইয়ামীন। বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা শুধু হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর পরিচয়ই জানতে

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু), পারা-১৩, পৃঃ ১২

চেয়েছিল। কিন্তু তিনি ভাই বিন ইয়ামীনের উল্লেখও করেছেন তাঁর প্রতি গুরুত্বারোপ করার লক্ষ্যে।

قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا ط

নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আল্লাহ্ পাকের দয়া এবং মেহেরবানী লক্ষ্য কর! যাঁকে সামান্য কয়েকটি মুদ্রার বিনিময়ে গোলাম হিসেবে বিক্রয় করা হয়েছে আল্লাহ্ পাক তাঁকে মিশর সাম্রাজের শাসনকর্তা নির্বাচন করেছেন। দ্বিতীয়তঃ সুদীর্ঘ বিরহের পর আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে পুনরায় একত্রিত হবার তওফিক দান করেছেন।

اِنَّهٗ مَنْ يَّتَّقِ وَيَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ○

নিশ্চয় যারা তাকওয়া পরহেজগারী অবলম্বন করে, তথা আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করে এবং সবর অবলম্বন করে, আল্লাহ্ পাক নেককারদের সওয়াব বিনষ্ট করেন না। তথা যে বা যারা আল্লাহর নাফরমানী ও পাপাচার থেকে বিরত থাকে, বিপদাপদে সবর অবলম্বন করে এবং আল্লাহ্ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, আল্লাহ্ পাক তাদের উত্তম বিনিময় দান করে দুনিয়া আখরাত উভয় জাহানে সাফল্য দান করেন।

জীবন-সাধনার সাফল্য

পবিত্র কোরআন এক্ষেত্রে মানব জীবনের সাফল্যের জন্যে দু'টি গুণ অর্জনের তাগিদ করেছে।

(১) তাকওয়া পরহেজগারী অবলম্বন করা তথা আল্লাহর নাফরমানী থেকে বিরত থাকা, যাবতীয় পাপাচার থেকে আত্মরক্ষা করা।

(২) বিপদাপদে সবর অবলম্বন করা, যেমন হযরত ইউসুফ (আঃ) করেছিলেন। অতএব যে সবর অবলম্বন করে এবং মুত্তাকী পরহেজগার হয়, জীবন-সংগ্রামে সে সাফল্যমন্ডিত হয়।

قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَ
اِنْ كُنَّا لَخٰطِـِٕيْنَ ﴿٩١﴾ قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ط يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ
وَهُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿٩٢﴾ اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى
وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا ج وَاْتُوْنِيْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٩٣﴾ وَلَمَّا فَصَلَتِ
الْعِيْرُ قَالَ اَبُوْهُمْ اِنِّيْ لَاَجِدُ رِيْحَ يُوْسُفَ لَوْلَاۤ اَنْ تُفَنِّدُوْنِ ﴿٩٤﴾
قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِيْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ﴿٩٥﴾

তরজমা

(৯১) তারা বলে, আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। সত্যি বলতে কি, আমরাই ছিলাম অপরাধী।

(৯২) ইউসুফ বললেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ পাক তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তিনি দয়াবানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।

(৯৩) তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও, আমার পিতার মুখমন্ডলের উপর তা রেখে দিও, তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন। আর তোমাদের পরিবারের সকল সদস্যদেরকে নিয়ে আমার নিকট চলে আস।

(৯৪) আর যখন কাফেলা রওয়ানা হয়, তখন তাদের পিতা বলেন, যদি তোমরা আমার সম্পর্কে একথা না বল যে, বুদ্ধি-ভ্রম ঘটেছে তাহলে আমি বলি, আমি ইউসুফের সুগন্ধ পাচ্ছি।

(৯৫) লোকেরা বলে, আল্লাহর শপথ! আপনি তো আপনার পুরাতন ভুলেই পড়ে রয়েছেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, যে আল্লাহকে ভয় করে এবং সবর অবলম্বন করে আল্লাহ পাক এমন নেককারদের বিনিময় বিনষ্ট করেন না। এ কারণে আল্লাহ পাক হযরত ইউসুফ (আঃ) এবং তাঁর ভাইয়ের উপর বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন। এ কথার জবাবে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা যা বলেছে তা আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا

তারা বললোঃ নিশ্চয় আল্লাহ পাক আমাদের উপর তোমাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরত, হেকমত এবং অনন্ত অসীম নেয়ামত লক্ষ্য করে তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারলো এবং লজ্জাবনত চিত্তে এ সত্য উপলব্ধি করলো যে, ইউসুফ (আঃ) আল্লাহ পাকের মনোনীত, তাঁর একান্ত পছন্দনীয় ও নেয়ামত-প্রাপ্ত। তাই তারা অকপটে স্বীকার করতে বাধ্য হলো যে নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাকে অধিকতর পছন্দ করেছেন, আমাদের সকলের উপর তোমাকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং তোমাকে মনোনীত করেছেন, আমরা অন্যায় করেছি, নিঃসন্দেহে আমরা অপরাধী। তারা আল্লাহর নামের শপথ করে বলেছে যে, আকৃতিতে-প্রকৃতিতে, দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানের ফজিলত ও মাহাত্মে আল্লাহ পাক আমাদের চেয়ে অনেক উচ্চে তোমাকে স্থান দিয়েছেন, আমরা তোমার সাথে যা করেছি তা নিতান্ত অন্যায় করেছি। বৈমাত্রেয় ভাইদের কথায় ছিল তাদের কৃতকর্মের জন্যে আক্ষেপ এবং লজ্জাবোধ। তারা এভাবে নিজেদেরকে ধিক্কার দিচ্ছিল, তাদের লজ্জিত অবস্থা দেখে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর মনে তাদের জন্যে হয় দুঃখ। তাই তাদেরকে সান্ত্বনা দেয়ার উদ্দেশ্যে তিনি বললেনঃ

قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ

الرّٰحِمِيْنَ ○

ইউসুফ (আঃ) বলেন, অতীতে যা কিছু হয়েছে তার জন্যে তোমাদের বিরুদ্ধে আজ কোন অভিযোগ নেই, আমি সব কিছু ক্ষমা করে দিয়েছি আর আজকের পর এ সম্পর্কে আমার পক্ষ থেকে কোন কথা হবেনা, আমি তোমাদের জন্যে আল্লাহ পাকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আশা করি তিনি ক্ষমা করে দেবেন কেননা, সকল দয়াবানদের মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।

মক্কা বিজয়ের দিন যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সুদীর্ঘ আট বছর পর মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় দশ হাজার সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) নিয়ে ফিরে আসলেন এবং আল্লাহ পাক বিনা রক্তপাতে মক্কা বিজয় দান করলেন, মক্কাবাসী তখন তাঁর সম্মুখে উপস্থিত। যারা তেরটি বছর যাবত তাঁর প্রতি এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) প্রতি অকথ্য নির্যাতন করেছে, সেই অপরাধীরা আজ সকলেই সমবেত। ইচ্ছা করলে তিনি তাদের প্রত্যেককে শাস্তি দিতে পারেন। কিন্তু উদারতা এবং মহানুভবতার মূর্ত প্রতীক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেদিন একথাই বলেছেন যা হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাইদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেনঃ

لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ

"আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই"।

انتم اطلقاء

"আজ তোমরা মুক্ত"।

এভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেদিন উদারতা-মহানুভবতার এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন এবং পেশ করেছিলেন ক্ষমা ও ঔদার্যের এক অনুপম আদর্শ।

وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِئِيْنَ ○

"সত্য বলতে কি, আমরাই ভুল করেছিলাম"।

ইমাম রাজী (রহঃ) এ বাক্যটির যে অর্থ বর্ণনা করেছেন তা এই, خاطى বলা হয় সে ব্যক্তিকে যে ইচ্ছা করে কোন অপরাধ করে যেমন হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা তাই করেছিলো। আর المخطى বলা হয় সে ব্যক্তিকে যে শরীয়তের কোন বিধানের ব্যাপারে গবেষণার ক্ষেত্রে ভুল সিদ্ধান্ত করে। এক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। এজন্যেই হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছে। কেননা, তাদের মনে আছে তারা ইউসুফ (আঃ)-কে ধ্বংস করার নিমিত্তে তাঁকে অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করেছিল। দ্বিতীয়তঃ তাঁকে তাদের পলাতক গোলাম বলে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করেছিল। তৃতীয়তঃ তারা হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে বাড়ী থেকে এবং পিতা ইয়াকুব (আঃ) থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল এবং পিতার নিকট তারা মিথ্যা বলেছে যে, হযরত

ইউসুফ (আঃ)-কে বাঘে খেয়ে ফেলেছে, অথচ বাঘ খায়নি; বরং তারাই তাঁকে হত্যা করার অপচেষ্টা করেছে।[১]

এরপর হযরত ইউসুফ (আঃ) তাদের নিকট তাঁর পিতার অবস্থা জানতে চাইলেন। তারা বললো, তোমার বিচ্ছেদের কারণে কাঁদতে কাঁদতে তিনি দৃষ্টি-শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। তাদের মাধ্যমে পিতার এই দুরবস্থা এবং তাদের পারিবারিক দুঃখ-কষ্টের ব্যাপারে অবগত হয়ে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হলেন এবং তাদেরকে বললেন, বর্তমান অবস্থায় আমার পক্ষে সিরিয়া যাওয়া সম্ভব নয়, তোমরা আমার জামা নিয়ে যাও।

পিতার নয়ন যুগলে জামাটি রাখ

তোমরা আমার জামা নিয়ে পিতার নয়ন যুগলের উপর রাখ। এর কারণে তিনি দৃষ্টি-শক্তি ফিরে পাবেন এবং চোখে দেখে তিনি এখানে আসতে পারবেন। অতএব, তোমরা তাঁকে এবং পরিবারের সমস্ত লোককে আমার কাছে নিয়ে আস। তফসীরকারগণ লিখেছেন, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর জামা নিয়ে তাঁর চক্ষুদ্বয়ের উপর রাখার যে ব্যবস্থা হলো তা আল্লাহ পাকের হুকুমেই হয়েছে। আর এটি ছিল হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর মোজেযা। যেমন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দস্তে মোবারকে, তাঁর জবান মোবারক থেকে একটু থুথু যখন একজন সাহাবীর চোখে লাগানো হয়েছিল তখন তাঁর রুগ্ন চক্ষু সুস্থ হয়েছিল। এমনিভাবে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অনেক রোগীর দেহে হাত বুলিয়ে দিলে তাঁরা সুস্থ হয়েছিলেন। হাদীস শরীফে এর বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। যাহোক, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা তাঁর জামা নিয়ে কেনান রওয়ানা হলো।[২]

প্রেরিত জামাটির বৈশিষ্ট্য

হযরত ইউসুফ (আঃ) যে জামাটি স্বীয় পিতার হারানো দৃষ্টি-শক্তি ফিরে পাওয়ার জন্যে প্রেরণ করলেন, তা সম্পর্কে আল্লাহ পাক হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, এ জামাটি ইয়াকুব (আঃ)-এর নয়ন যুগলের উপর রাখা হলে তিনি দৃষ্টি-শক্তি ফিরে পাবেন।

যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, এটি ছিল জান্নাতে তৈরী জামা, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে যখন জালেম নমরুদ অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করে, আল্লাহ পাক তখন এ জান্নাতি জামাটি জিব্রাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে প্রেরণ করেন।

এমনিভাবে, যখন হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা তাঁকে অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করেছিল, তখনও তাঁর জামাটি খুলে রেখেছিল। তখন জিব্রাঈল (আঃ) ঐ জান্নাতি জামাটি এনে হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে পরিধান করিয়েছিলেন। আর যখন হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভ্রাতাদের নিকট থেকে তাঁর পিতার অবস্থা সম্পর্কে অবগত হলেন, তখন

---

১. তফসীরে কবীর, খন্ড-১৮, পৃঃ ২০৫
২. তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৪, পৃঃ ৬২

জিব্রাঈল (আঃ) এসে বললেন, এ জামাটি প্রেরণ করুন। তাতে এক প্রকার সুগন্ধ আছে। যদি কোন অসুস্থ বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি ঐ সুগন্ধ পায় তবে সে সুস্থ হয়।[১]

তত্ত্বজ্ঞানীগণ লিখেছেন, হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা ঈর্ষান্বিত হয়ে শত্রুতাবশতঃ অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করে, পরে ব্যবসায়ী কাফেলার নিকট অতি তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে, তারাও তাঁকে মিশরের বাজারে বিক্রয় করে। প্রায় এক যুগ তিনি মিশরের আজিজের বাড়ীতে রইলেন, এরপর অনেক দিন কারাগারে অতিবাহিত করলেন। এরপর আল্লাহর রহমতে মিশর সাম্রাজ্যের কর্ণধার হলেন। বর্ষ-পরিক্রমায় এসব ঘটনায় চল্লিশটি বছর অতিবাহিত হয়। তাঁর শোকে, বিচ্ছেদ-বেদনায় কাঁদতে কাঁদতে পিতা হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁর দৃষ্টি-শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেললেন। এরই মধ্যে হযরত ইউসুফ (আঃ) ইচ্ছা করলে তাঁর জীবিত থাকার খবর দিয়ে পিতাকে সান্ত্বনা দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। প্রশ্ন হলো কেন করেননি? তত্ত্বজ্ঞানীগণ এর জবাবে বলেছেন, হয়তো আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ওহীর মাধ্যমে তাঁকে এ সম্পর্কে নিষেধ করা হয়েছে, যাতে করে অধিক পরিমাণে ক্রন্দণের কারণে তাঁর মর্তবা উচ্চ থেকে উচ্চতর হয় অথবা এর মধ্যে আল্লাহ পাকের কোন হেকমত ছিল।[২]

وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ

বিস্ময়কর ঘটনা

যখন ইউসুফ-ভ্রাতাদের কাফেলা মিশর থেকে রওয়ানা হয়, তখন আর একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। একদিকে মিশর থেকে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর জামা প্রেরিত হলো অন্যদিকে হযরত ইয়াকুব (আঃ) সিরিয়াতে বসেই ঐ জামার সুগন্ধ পেয়ে গেলেন। বস্তুতঃ আল্লাহ পাকের কুদরতের খেলা কে বুঝবে? আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সব কিছুরই সময় রয়েছে, যখন সে সময় আসে তখনই সে কাজ হয়। এ কথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় আলোচ্য ঘটনায়।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর পিতা হযরত ইয়াকুব (আঃ) পুত্রের বিরহে ক্রন্দন করলেন বছরের পর বছর। পুত্র মিশরের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত, সর্বোচ্চ মর্যাদায় সম্মানিত। তাঁর যে পুত্ররা একদিন ঈর্ষান্বিত হয়ে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি অকথ্য নির্যাতন করেছিল, সে জালেম বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা মজলুম ভ্রাতার সম্মুখে দান-খয়রাতের জন্যে ভিখারী অবস্থায় দন্ডায়মান। এ দৃশ্য একদিন ছিল কল্পনাতীত, আজ তাই বাস্তব। এসবই আল্লাহ পাকের কুদরতের খেলা। তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই এবং তাঁর পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। একদিকে হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর পরীক্ষার সময় শেষ হয়ে এসেছে, অন্য দিকে পিতা-পুত্রের মিলনের সময় ঘনিয়ে এসেছে। একদিকে মিশর থেকে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর প্রেরিত জামা নিয়ে তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা রওয়ানা হয়েছে, অন্যদিকে হযরত ইয়াকুব (আঃ) বলছেনঃ

১। খোলাসাতুত তাফাসীর, খন্ড-২,পৃঃ ৪৫৫
২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৪, পৃঃ ৬২

إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ

নিশ্চয় আমি ইউসুফের সুগন্ধ পাচ্ছি। তোমরা হয়তো মনে করবে এটি বৃদ্ধ লোকের বুদ্ধির ভ্রম। যদি তোমরা একথা না বল তবে আমি বলছি অদূর ভবিষ্যতে ইউসুফের মোলাকাত হবে। আমি ইউসুফের সুগন্ধ পাচ্ছি।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ সুগন্ধ ছিল প্রকৃতপক্ষে জান্নাতের। কেননা জান্নাত থেকে প্রেরিত ঐ জামাটির মধ্যেই ছিল সুগন্ধ।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, ভোরের হিমেল হাওয়া বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেছে যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) প্রেরিত জামা বহনকারী কাফেলা পৌঁছার পূর্বেই যেন হযরত ইয়াকুব (আঃ)-কে তাঁর পুত্র ইউসুফ (আঃ)-এর সুগন্ধ পৌঁছে দেয়। আল্লাহ পাক অনুমতি দান করেছেন। তাই মিশর থেকে সুদূর কেনানে এ সুগন্ধ পৌঁছে।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, তিন দিনের দূরত্ব থেকে হযরত ইয়াকুব (আঃ) ইউসুফ (আঃ)-এর সুগন্ধ পান। আর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর একটি বর্ণনায় রয়েছে, আট রাতের দূরত্ব থেকে হযরত ইয়াকুব (আঃ) এ সুগন্ধ লাভ করেন।[১]

হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর মোজেযা

মূলতঃ এটি ছিল হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর মোজেযা। আর মোজেযা যদিও নবীর মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এবং নবীর কথার সত্যতা প্রমাণিত করার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয় কিন্তু কাজটি নবীর নয়; বরং আল্লাহ পাকের। এজন্যে যখন আল্লাহ পাকের মর্জি হয় তখন এমন বিস্ময়কর কাজ হয়। যদি এমন ঘটনা নবীর মাধ্যমে ঘটে তবে তাকে মোজেযা বলা হয়। আর যদি তা কোন আল্লাহর ওলীর মাধ্যমে হয় তবে তাকে কারামত বলা হয়।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর কারামত

খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ) মদীনায়ে তৈয়্যেবায় মসজিদে নববীতে খোৎবা-রত ছিলেন, ঐ মুহূর্তে মুজাহেদীনে ইসলাম নাহরাওয়ান্দ নামক স্থানে দুশমনের সঙ্গে জেহাদে রত ছিলেন। ঘটনাক্রমে দুশমন দু'দিক থেকে মুসলিম বাহিনীকে ঘেরাও করতে চেষ্টা করছিল, ঠিক ঐ মুহূর্তে হযরত ওমর (রাঃ) মসজিদে নববীর মিম্বর থেকে উচ্চস্বরে বললেনঃ

يا ساريه الجبل

(হে সারিয়া! পাহাড়কে পেছনে রেখে যুদ্ধ কর।)

অর্থাৎ যদি পাহাড় পেছনে থাকে তবে দুশমন তোমাদেরকে ঘেরাও করতে পারবে না। ইসলামী বাহিনী হযরত ওমর (রাঃ)-এর এ নির্দেশ শ্রবণ করেছে, প্রকাশ্যে কোন উপকরণ

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ২০৬
খোলাসাতুত তাফাসীর, খন্ড-২,পৃঃ ৪৫৫

ব্যতীতই আল্লাহ পাকের কুদরতে এতদূর থেকে হযরত ওমর (রাঃ)-এর আওয়াজ মুজাহেদীনদের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করেছে। এটি ছিল হযরত ওমর (রাঃ)-এর কারামত, আর এখানে রয়েছে দু'টি কারামত-

(১) মদীনা মোনাওয়ারায় অবস্থানরত খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমরের (রাঃ) রণাঙ্গনের দৃশ্য দেখা।

(২) তাদেরকে মদীনা শরীফ থেকে নির্দেশনা প্রদান করা এবং তাঁর কণ্ঠস্বর তাঁদের শ্রবণ করা। এসবই আল্লাহ পাকের কুদরতে, হযরত ওমর (রাঃ)-এর কারামত। আর কারামত কোন মানুষের ইচ্ছায় হয়না; বরং আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ও মর্জিতে হয়। আল্লাহ পাক যেভাবে তাঁর এক প্রিয় বন্দা হযরত ওমর (রাঃ)-এর আওয়াজকে এতদূরে পৌঁছে দিয়েছেন, ঠিক এমনিভাবে আল্লাহ পাক হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর প্রেরিত জামার সুগন্ধ মিশর থেকে কেনানে পৌঁছে দিয়েছেন। এমনিভাবে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর জন্যে আল্লাহ পাক বাতাসকে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছিলেন।[১]

قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِىْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ ○

যাদেরকে তিনি হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সুগন্ধ পাওয়ার কথা বলেছিলেন তারা বললোঃ আমরা দেখছি আপনি এখনও পুরনো ভুল-ভ্রান্তিতেই আছেন, এখনও ইউসুফের (আঃ) কথা আপনি ভুলতে পারেননি। ইউসুফকে (আঃ) পাওয়ার স্বপ্ন এখনও আপনি দেখছেন। কোথায় ইউসুফ (আঃ)? কবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কোথায় তাঁর সুগন্ধ, এসব নিতান্ত বুদ্ধি-বিভ্রাট ব্যতীত আর কিছুই নয়।

আলোচ্য আয়াতে ضلال শব্দটির অর্থ হলো ইউসুফের (আঃ) প্রতি আপনার অতি মহব্বত এবং তাঁকে পাওয়ার পরম আশা-আকাংক্ষা, এ কারণে আপনার বুদ্ধি-বিভ্রাট ঘটেছে এবং আপনি ইউসুফের (আঃ) সুগন্ধ পাচ্ছেন বলে মনে করছেন আর ইউসুফের (আঃ) সঙ্গে অদূর ভবিষ্যতে মোলাকাত হবে বলে আশা করছেন।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৪, পৃঃ ৬২

فَلَمَّآ اَنْ جَآءَ الْبَشِيْرُ
اَلْقٰىهُ عَلٰى وَجْهِهٖ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا ۚ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ ۚ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ
مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٩٦﴾ قَالُوْا يٰٓاَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَآ اِنَّا كُنَّا
خٰطِئِيْنَ ﴿٩٧﴾ قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْ ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿٩٨﴾
فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلٰى يُوْسُفَ اٰوٰٓى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ
شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ﴿٩٩﴾ وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا ۚ وَ
قَالَ يٰٓاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ ۡ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا ۭ
وَقَدْ اَحْسَنَ بِيْٓ اِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَجَآءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ
مِنْۢ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطٰنُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اِخْوَتِيْ ۭ اِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ
لِّمَا يَشَآءُ ۭ اِنَّهٗ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿١٠٠﴾

তরজমা

(৯৬) এরপর যখন সুখবর বাহক উপস্থিত হলো এবং তার মুখমন্ডলের উপর জামাটি রাখলো, ফলে তিনি তাঁর দৃষ্টি-শক্তি ফিরে পেলেন। তিনি বললেনঃ আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আল্লাহর নিকট থেকে (এমন কিছু) জানি যা তোমরা জান না।

(৯৭) তারা বললোঃ হে আমাদের পিতা! আমাদের পাপাচারের জন্যে (আল্লাহ্ পাকের নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা করুন, নিশ্চয় আমরা ছিলাম অপরাধী।

(৯৮) ইয়াকুব বললেনঃ আমি অচিরেই আমার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবো। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

(৯৯) এরপর যখন তারা ইউসুফের নিকট উপস্থিত হয় তখন তিনি স্বীয় পিতা মাতাকে আলিঙ্গন করলেন এবং বললেনঃ আপনারা আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছায় নিরাপদে মিশরে প্রবেশ করুন।

(১০০) ইউসুফ তার পিতা-মাতাকে উচ্চাসনে বসান এবং তারা সকলে তার সম্মানে সেজদায় রত হয়। ইউসুফ বলেনঃ হে আমার পিতা! এটিই আমার পূর্ব স্বপ্নের তা'বীর। আমার প্রতিপালক তাকে সত্যে পরিণত করেছেন। তিনি আমাকে দয়া করে কারাগার

থেকে বের করে আনেন এবং শয়তান আমার ও আমার ভাইদের সম্পর্ক বিনষ্ট করার পরও আপনাদেরকে মরু অঞ্চল থেকে এখানে এনে দিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা বিবেচনা সহকারে তা করে থাকেন। নিশ্চয় তিনি মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

তফসীরুল কোরআন

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেক সুসংবাদ বাহক হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর নিকট হাযির হয়। সে এ সুসংবাদ দেয় যে, ইউসুফ (আঃ) জীবিত আছেন। তিনি আপনার জন্যে এ জামাটি প্রেরণ করেছেন। একথা বলে জামাটি তাঁর চোখে রাখলেন। ফলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি পুনরায় চক্ষুষ্মান হলেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, কাফেলা পৌঁছার পূর্বেই সুসংবাদ বাহক পৌঁছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ সুসংবাদ বাহক ছিল ইয়াহুদা।

সুদ্দী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, যেহেতু আমি (ইয়াহুদা) ইউসুফের রক্ত মাখা জামা নিয়ে পিতার নিকট গিয়েছিলাম আর পিতাকে এ সংবাদ দিয়েছিলাম যে, ইউসুফকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে, তাই আজ এ জামাটি নিয়ে আমিই যাব এবং পিতাকে এ খবর জানাবো যে ইউসুফ (আঃ) আজও জীবিত এবং নিরাপদ আছেন, যেভাবে আমার দ্বারা পিতা ইতিপূর্বে ব্যথিত, মর্মাহত হয়েছিলেন সেভাবে আজ আমি তাঁকে সন্তুষ্ট করবো।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, এই জামাটি নিয়ে ইয়াহুদা নগ্ন পদে দ্রুত বেগে বের হয়ে পড়েছিল। সে সঙ্গে মাত্র সাতটি রুটি নিয়েছিল তা-ও সম্পূর্ণ খেতে পারেনি। ৮০ ফার্লং এর দূরত্ব অতিক্রম করে সে পিতার নিকট পৌঁছে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেনঃ এ সুসংবাদ বাহক ছিল মালেক এবনে ওয়ার। যাহোক জামাটি হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর নয়ন যুগলে রাখার পর তিনি দৃষ্টি ফিরে পেলেন, দুর্বলতার বদলে শক্তি এবং বৃদ্ধকালের পর যৌবন লাভ করলেন।

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّىْٓ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○

তখন হযরত ইয়াকুব (আঃ) বললেনঃ আমি কি বলিনি তোমাদেরকে যে, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আমি এমন কিছু জানি যা তোমরা জান না। শুরু থেকেই আমার এ বিশ্বাস ছিল যে ইউসুফ (আঃ) জীবিত আছে এবং একদিন অবশ্যই তার সঙ্গে দেখা হবে। আমি তোমাদেরকে একথাও বলেছিলাম যে, আল্লাহ পাকের রহমত থেকে কখনও নিরাশ হয়োনা। আল্লাহর রহমত থেকে শুধু কাফেররাই নিরাশ হয়ে থাকে। আমি কিছু দিন পূর্বেও বলেছিলাম যে, আমি ইউসুফের (আঃ) সুগন্ধ পাচ্ছি।

আল্লামা বগভী (রঃ) বর্ণনা করেছেনঃ হযরত ইয়াকুব (আঃ) সুসংবাদ বাহককে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি ইউসুফকে (আঃ) কি অবস্থায় দেখে এসেছ? সে জবাব দেয়, তিনি বর্তমানে মিশরের বাদশাহ।

হযরত ইয়াকুব (আঃ) বললেনঃ বাদশাহ্ হলে আমি কি করবো। কিন্তু আমি জানতে চাই তার দ্বীনি অবস্থা কি? তাকে কোন্ ধর্মের উপর তুমি দেখে এসেছে?

সুসংবাদ বাহক বললোঃ তিনি ইসলামের উপর কায়েম রয়েছেন, তখন হযরত ইয়াকুব (আঃ) বললেনঃ তাহলে আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত পরিপূর্ণ হয়েছে।[১]

قَالُوْا يٰٓاَبَانَا اسْتَغْفِرْلَنَا ذُنُوْبَنَآ اِنَّا كُنَّا خٰطِئِيْنَ ○

ঐ সময় হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা এ সত্য উপলব্ধি করলো যে, তারা সত্যিই অপরাধ করেছে। তারা আল্লাহ্ পাকের দরবারে অপরাধী এবং হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর নিকটও অপরাধী। তাই তারা তাঁকে বললোঃ হে আমাদের পিতা! আমাদের ক্ষমা লাভের জন্যে দয়া করে আপনি আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করুন। আমরা স্বীকার করছি যে, আমরা অপরাধী, আমাদের দ্বারা অন্যায় হয়ে গেছে। এজন্যে আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। আপনি দয়া করে আমাদের ক্ষমা প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়ে দিন। তারা এভাবে কৃত অন্যায় থেকে ক্ষমা লাভের জন্যে আল্লাহ্ পাকের দরবারে করুণ আবেদন পেশ করে। তারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে যে, তারা সত্যই অত্যন্ত বড় অপরাধ করেছে। আর এজন্যেই আল্লাহ্ পাকের দরবারে তারা বিনীত ভাবে ক্ষমাপ্রার্থী হয়।

অচিরেই আমি ক্ষমা প্রার্থনা করবো

قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّىْ ط

হযরত ইয়াকুব (আঃ) বললেনঃ আমি অচিরেই তোমাদের জন্যে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হবো। বর্ণিত আছে যে হযরত ইয়াকুব (আঃ) রাতের শেষ প্রহরে দোয়া করার জন্যে ঐ সময় দোয়া মুলতবী রাখেন। কেননা রাতের তৃতীয়াংশে আমাদের পরওয়ারদেগার বিশেষভাবে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে তাজাল্লী নাজিল করেন এবং আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়, কে আছে যে আমাকে ডাকে? আমি তার দোয়া কবুল করবো। যে আমার কাছে চায় আমি তাকে দান করি। আর কে আছে যে আমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হয়? আমি তাকে ক্ষমা করি। (বোখারী, মুসলিম)

যাহোক, যখন নির্দিষ্ট সময় আসে তথা রাতের শেষ প্রহরে হযরত ইয়াকুব (আঃ) নামাজ সুসম্পন্ন করে দু'হাত তুলে আল্লাহ্ পাকের দরবারে মুনাজাত করেনঃ হে আল্লাহ্! ইউসুফের ব্যাপারে আমি যে অধৈর্য হয়েছিলাম এজন্যে আমাকে মাফ করুন এবং আমার সন্তানেরা আমার সাথে এবং ইউসুফের সাথে যে মন্দ আচরণ করেছে তা-ও মাফ করুন।

আল্লাহ্ পাক ওহী প্রেরণ করেন যে, তোমার এবং তোমার পুত্রদের দোষ মাফ

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৮, পৃঃ ২০৫
তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-১৩, পৃঃ ৫৫
তফসীরে কুরতবী, খন্ড-৯, পৃঃ ২৬১
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ২০৬
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৪, পৃঃ ৬৪

করেছি। একরামা (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, অচিরেই তোমাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবো একথার তাৎপর্য হলো হযরত ইয়াকুব (আঃ) জুমআর রাতে দোয়া করতে চেয়েছিলেন অর্থাৎ ঐ রাত দোয়া কবুল হওয়ার উপযুক্ত সময়।

ওহাব এবনে মোনাব্বেহ (রঃ) বলেছেনঃ হযরত ইয়াকুব (আঃ) বিশ বছরেরও বেশী সময় প্রত্যেক জুমআর রাতে তাঁর পুত্রদের জন্যে দোয়া করতেন। তাউস (রঃ) বলেছেন, হযরত ইয়াকুব (আঃ) জুমআর রাতের শেষ প্রহরের জন্যে দোয়া মুলতবী রেখেছিলেন। ঘটনাক্রমে তা ছিল ১০ই মহররম তথা আশুরার রাত।

ইমাম শা'বী (রঃ) বলেছেন, "অচিরেই আমি তোমাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবো" হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর এ কথার অর্থ হলো আমি ইউসুফকে বলবো যেন তোমাদেরকে মাফ করে দেয়। সে মাফ করে দেবে। এরপর আমি আল্লাহ পাকের দরবারে তোমাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবো, আল্লাহ পাক তখনই ক্ষমা করেন যখন মজলুম বন্দা জালেমকে মাফ করে দেয়। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, "অচিরেই আমি ক্ষমা প্রার্থনা করবো", হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর এ বাক্যটির তাৎপর্য হলো, হযরত ইয়াকুব (আঃ) এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন যে, তাঁর সন্তানেরা খাঁটি অন্তর নিয়ে তওবা করেছে কি-না। একথা জানা পর্যন্ত তিনি দোয়া মুলতবী রাখেন।

আল্লামা নববী লিখেছেন, কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, হযরত ইউসুফ (আঃ) সুসংবাদ বাহকের নিকট ২০০ উট এবং-বিপুল পরিমাণ অন্যান্য দ্রব্য প্রেরণ করেছিলেন যাতে করে হযরত ইয়াকুব (আঃ) তাঁর পরিবারবর্গসহ মিশর গমন করেন। তাই হযরত ইয়াকুব (আঃ) মিশর সফরের জন্যে তৈরী হন। ৭২ জন লোক তাঁর কাফেলায় শরীক হয়। আর মসরুক (রঃ) বলেছেনঃ তাঁর সঙ্গে ৩৯০ জন লোক রওয়ানা হয়। যখন এ কাফেলা মিশরের নিকট পৌঁছে তখন হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁদের সম্বর্ধনার আয়োজন করেন। মিশরের রাজাকে (অবসরপ্রাপ্ত) সম্বর্ধনায় অংশ গ্রহণ করতে বলেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) ৪,০০০ সৈন্য নিয়ে হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর সম্বর্ধনায় রওয়ানা হন। মিশরের আরো অনেক লোক তাঁদের এ সম্বর্ধনায় শরীক হয়। হযরত ইয়াকুব (আঃ) ইয়াহুদার কাঁধে ভর করে পদব্রজে আসছিলেন, সম্বর্ধনা প্রদানকারীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে তিনি বলেছিলেনঃ হে ইয়াহুদা! একি মিশরের ফেরাউন?' ইয়াহুদা জবাব দিল না। ইনিতো আপনার পুত্র।

হযরত ইয়াকুব (আঃ) মিশরে

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ

"যখন তারা ইউসুফের নিকট প্রবেশ করেন তখন তিনি পিতা-মাতাকে নিজের কাছে স্থান দেন"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, হযরত ইয়াকুব (আঃ) সপরিবারে যখন

মিশরের নিকটবর্তী স্থানে পৌছেন তখন হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁদেরকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে শহরের বাইরে চলে যান এবং সাদর সম্ভাষনে তাঁদেরকে শহরে নিয়ে আসেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত ইউসুফ (আঃ) এবং হযরত ইয়াকুব (আঃ) একে অন্যের কাছে পৌছে যান। হযরভ ইউসুফ (আঃ) পিতাকে সালাম করতে ইচ্ছা করেন। তখন জিব্রাইল (আঃ) তাঁকে বিরত রাখেন এবং বলেন, পূর্বে তিনি সালাম করবেন, এরপর আপনি সালাম করবেন। অবশেষে হযরত ইয়াকুব (আঃ) ইউসুফ (আঃ)-কে সালাম দিয়ে বললেনঃ হে দুশ্চিন্তা দূরীভূতকারী! তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। এখানে পিতা-মাতা বলতে হযরত ইয়াকুব (আঃ) এবং তাঁর স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যিনি হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর খালা ছিলেন। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর মাতার ইন্তেকালের পর তাঁর খালা লাইয়াকে তিনি বিবাহ করেন। অথবা এর কারণ এই যে, হযরত ইয়াকুব (আঃ) যখন লাইয়াকে বিবাহ করেন সে লাইয়াই হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর লালন-পালন করেন, এজন্যে তাঁকে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর মাতা বলা হয়েছে।

হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, মা জীবিত ছিলেন এবং আলোচ্য আয়াতে তাঁর পিতা-মাতার কথাই বলা হয়েছে এবং হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর সঙ্গে তিনি মিশরে এসেছিলেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ বর্ণিত আছে যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) এবং হযরত ইয়াকুব (আঃ) একে অন্যকে আলিঙ্গন করেছেন।

সুফীয়ান সওরী (রঃ) বলেছেন, পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করে উভয়ে কাঁদতে লাগলেন। হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেনঃ আব্বাজান! আমার কারণে আপনি এত ক্রন্দন করেছেন যে, আপনার দৃষ্টি-শক্তি চলে গেছে। আপনার কি এই একীন ছিল না যে, আমরা অবশ্যই কেয়ামতের দিন একত্রিত হবো।

হযরত ইয়াকুব (আঃ) বললেনঃ বৎস, অবশ্যই একীন ছিল। তবে আমার আশংকা ছিল যে, তোমার ধর্ম পরিবর্তন না হয়ে যায়, আর এ কারণে তোমার এবং আমার মধ্যে কেয়ামতের দিন আড়াল না হয়ে যায়।

وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ۝

ইউসুফ (আঃ) বললেনঃ দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। নিশ্চিন্ত মনে মিশরে প্রবেশ করুন।

অর্থাৎ শহরে প্রবেশ করার জন্যে কোন অনুমতি-পত্রের প্রয়োজন নেই। হয়তো সে যুগে অনুমতি-পত্র ব্যতীত কেউ শহরে প্রবেশ করতে পারতো না। অথবা এর অর্থ হলো বর্তমানে দুর্ভিক্ষ বা অন্য কোন প্রকার বিপদের কোন আশংকা আর আপনাদের নেই।[১]

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ২০৯

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ۚ

হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর পিতা-মাতাকে সসম্মানে সিংহাসনে আরোহন করান। সে যুগের প্রথা মোতাবেক হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা তাঁর পিতা-মাতাসহ হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর সম্মুখে সেজদারত হন। আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, তখনকার শরীয়তে বড়দেরকে সম্মান সূচক সেজদা দেয়ার প্রথা বৈধ ছিল। হযরত আদম (আঃ) থেকে নিয়ে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সম্মান সূচক সেজদা দেয়া জায়েয ছিল। কিন্তু মিল্লাতে মোহাম্মদীয়ায় এটি হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ পাক ব্যতীত কারো জন্যে সেজদা করা জায়েয নয়, সেজদা শুধু এবং শুধু আল্লাহ পাকের জন্যে।

হযরত কাতাদা (রঃ) এ কথাই বলেছেন। আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন এ মর্মে যে, হযরত মাআজ (রাঃ) একবার সিরিয়া গমন করেন। তিনি সেখানে সিরিয়াবাসীদের বড়দেরকে সেজদা করতে দেখেন। তাই সিরিয়া থেকে ফিরে এসে তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সেজদা করেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করেনঃ মাআজ কি ব্যাপার? মাআজ বললেন, সিরিয়াতে আমি দেখে এসেছি বড়দেরকে সম্মানসূচক সেজদা দেয়া হয়। আর আপনি সেজদা পাওয়ার সবচেয়ে বেশী অধিকারী। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন এরশাদ করেনঃ যদি আমি কোন লোককে কারো জন্যে সেজদা করার আদেশ দিতাম তবে আমি স্ত্রীলোকদের আদেশ দিতাম যেন তারা তাদের স্বামীদেরকে সেজদা করে। কেননা স্বামীদের অত্যন্ত বেশী হক রয়েছে স্ত্রীদের উপর।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, হযরত সালমান ফার্সী (রাঃ) তাঁর ইসলাম গ্রহণের প্রাথমিক যুগে এক দিন পথে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত পেয়ে তাঁকে সেজদা করেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ "সালমান! আমাকে সেজদা করোনা"। সেজদা শুধু আল্লাহকে করবে, যিনি চিরঞ্জীব, যাঁর কখনও মৃত্যু নেই।

যাহোক, যেহেতু সে যুগে সেজদা করা জায়েয ছিল, সেজন্যে হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে তাঁর পিতা-মাতা সহ বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা সম্মানসূচক সেজদা দেন।[১]

وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ

আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর পিতা-মাতাকে সিংহাসনে বসান।

কোন কোন তফসীরকার এ পর্যায়ে বলেছেন যে, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর মাতা পূর্বেই ইন্তেকাল করেছিলেন। এরপর তাঁর খালার সঙ্গে হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর বিবাহ

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু), পারা-১৩, পৃঃ ১৫

হয় এবং তিনিই মিশর সফর করেন (ইতিপূর্বে আমরা এ বিষয়ের উল্লেখ করেছি), কিন্তু আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) ইমাম এবনে জরীর (রঃ) এবং মোহাম্মদ এবনে এসহাক (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, তাঁর মাতা তখনও জীবিত ছিলেন। তাঁর মাতার মৃত্যুর কোন সঠিক দলিল নেই। আর পবিত্র কোরআনের ভাষাও একথারই প্রমাণ বহন করে। আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) বলেছেন, একথাই সঠিক যে হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর পিতা-মাতাকে রাজকীয় সিংহাসনে সসম্মানে বসিয়ে দেন এবং তখন পিতা-মাতা ও ভ্রাতারা সকলে একই সঙ্গে সেজদায় পতিত হন।

স্বপ্ন হলো সত্য

وَقَالَ يَٰٓأَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُءْيَٰىَ مِن قَبْلُ

"আর তখন ইউসুফ (আঃ) বলেছিলেনঃ আব্বাজান, এটিই হলো আমার স্বপ্নের তা'বীর যা ইতিপূর্বে আমি দেখেছিলাম। আমার প্রতিপালক আল্লাহ্ পাক এই স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিয়েছেন"।

হযরত ইউসুফ (আঃ) স্বপ্নে দেখেছিলেন চন্দ্র সূর্য এবং ১১টি তারকা তাঁকে সেজদা করছে। আজ সে স্বপ্নই সত্য প্রমাণিত হলো এবং স্বপ্নের সঠিক বাস্তবায়ন হলো আল্লাহ পাকের দয়া এবং মেহেরবানীতে।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) সেজদা করা সম্পর্কে লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে সেজদা করার অর্থ জমিনে মাথা রাখা নয়; বরং বিনয়ের সঙ্গে মাথা নত করা।

কোন কোন তফসীরকার যদিও লিখেছেন, এর দ্বারা জমিনে মাথা রাখাই উদ্দেশ্য করা হয়েছে তবে তাঁরা বলেছেন, এ সেজদা এবাদতের সেজদা ছিলনা, বরং এটি ছিল সম্মানসূচক সেজদা।

وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটির অর্থ সেজদা করা তথা জমিনে মাথা রাখা। কিন্তু এ সেজদা এবাদতের সেজদা নয়; বরং সম্মানসূচক সেজদা, সে যুগে সম্মান প্রদর্শনের জন্যে এ প্রথা প্রচলিত ছিল। আর বিগত উম্মতের জন্যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুকে সম্মানসূচক সেজদা দেয়ার অনুমতি ছিল, যা আমাদের শরীয়তে বাতিল ঘোষিত হয়েছে। এখন আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কিছুর সম্মুখে কোন প্রকার সেজদাই দেয়া যায়না। এ আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন, এর অর্থ হলো তাঁরা আল্লাহ পাকের দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে ইউসুফ (আঃ)-এর সম্মুখেই সেজদায় পতিত হলো।

لَهُ শব্দটির সর্বনাম দ্বারা আল্লাহ পাকের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, (ইউসুফের দিকে নয়)।

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু), পারা-১৩, পৃঃ ১৫

হযরত আবদুল্লাহ এবন আব্বাস (রাঃ)-এর তফসীরে একথা প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা ইউসুফ (আঃ)-এর উদ্দেশ্যে সেজদা করেননি, সেজদা করেছেন আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্যে। ইউসুফ ছিলেন কেবলা অর্থাৎ ইউসুফের দিকে তাঁরা সেজদা করেছেন, আর ইউসুফকে সেজদার জন্যে কেবলা বানানো, আল্লাহ পাকের নির্দেশ-ক্রমেই হয়েছে। যেমন আমাদের জন্যে কা'বা শরীফকে কেবলা বানানো হয়েছে, ঠিক এমনিভাবে ফেরেশতাদের সেজদার জন্যে আদম (আঃ)-কে কেবলা বানানো হয়েছে।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আয়াতের অর্থ হলো সুদীর্ঘ সময় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করার পর হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে পেয়ে তাঁরা আল্লাহ পাকের দরবারে সেজদায়ে শোকরানা আদায় করেছেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ ব্যাখ্যাই সঠিক। এরপর হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর পিতা-মাতাকে সিংহাসনে বসিয়ে দেন।[১]

এখানে উল্লেখ্য, কারো প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, আর এবাদত করা সম্পূর্ণ দু'টি আলাদা বিষয়। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা অবৈধ নয় তবে হ্যাঁ, যেভাবে আল্লাহ পাকের প্রতি তা'যীম বা সম্মান প্রদর্শন করতে হয় সেভাবে অন্য কারো প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অনুমতি নেই এবং আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কোন কিছুর এবাদত করা শেরক তথা সম্পূর্ণ হারাম। যেহেতু সেজদার মাধ্যমে চরম বিনয় প্রকাশ পায়, সেহেতু এ পন্থা শুধু এক আল্লাহ পাকের জন্যেই সুনির্দিষ্ট, অন্যকে এভাবে সেজদা করার অনুমতি ইসলাম দেয়না। ইসলাম শেরকের মূলোৎপাটন করে, এমনকি যে সব কাজে শেরকের সম্ভাবনা থাকে সেগুলোও নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।[২]

এ পর্যায়ে ইমাম রাজী (রঃ)-এর বক্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, আলোচ্য বাক্যের অর্থ হলো হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে পাওয়ার কারণে আল্লাহ পাকের দরবারে শোকর আদায়ের উদ্দেশ্যে তাঁরা সেজদা করেছেন। এ সেজদা ছিল শোকরগুজারীর উদ্দেশ্যে। আর সেজদা করা হয়েছে আল্লাহ পাককে। হারানো ইউসুফকে ফিরে পাওয়া এর কারণ। আর এ বক্তব্যের প্রমাণ হলো, সর্ব প্রথম এরশাদ হয়েছেঃ

وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ

(আর ইউসুফ তাঁর পিতা-মাতাকে সিংহাসনে আরোহন করিয়েছেন।)

এর পরপর এরশাদ হয়েছেঃ

وَخَرُّوْا لَهٗ سُجَّدًا

(তারা তাঁর উদ্দেশ্যে সেজদায় পতিত হয়েছে)

যদি ইউসুফ (আঃ)-এর উদ্দেশ্যে সেজদা হতো তবে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার সঙ্গে

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ২১০-১১
২। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃঃ ৩১৯

সঙ্গে তথা সিংহাসনে আরোহণের পূর্বেই সেজদা করা হতো। সিংহাসনে আরোহনের পরে সেজদা করা একথারই প্রমাণ বহন করে যে, তাঁরা আল্লাহ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থেই সেজদা করেছেন।

وَقَالَ يَٰٓأَبَتِ هَٰذَا تَأْوِيلُ رُءْيَٰىَ مِن قَبْلُ

(সে সময়) ইউসুফ (আঃ) বললেনঃ আব্বাজান ইতিপূর্বে (বাল্যকালে) আমি যে স্বপ্ন দেখেছিলাম এটি তারই বাস্তব রূপ। স্বপ্নটি ছিল এরূপ-

إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِى سَٰجِدِينَ

(নিশ্চয় আমি দেখেছি ১১টি তারকা এবং সূর্য ও চন্দ্র আমার জন্যে সেজদা করছে) অর্থাৎ আমার কারণে সেজদা করছে। সেজদা ছিল এক আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্যেই। আর এর কারণ ছিলাম আমি অর্থাৎ আমাকে পাওয়ার কারণে আল্লাহ পাকের দরবারে শোকর আদায় করার উদ্দেশ্যে তাঁরা সেজদা করেছেন।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ আয়াতের এ ব্যাখ্যা করা হলে এ পর্যায়ে আর কোন প্রশ্ন উত্থিত হয়না।[১]

আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম করুণা

وَقَدْ أَحْسَنَ بِىٓ إِذْ أَخْرَجَنِى مِنَ السِّجْنِ

আল্লাহ পাক আমার প্রতি বিশেষ নেয়ামত দান করেছেন। যখন তিনি আমাকে কারাগার থেকে বের করে এনেছেন, আমার এবং ভাইদের মধ্যে শয়তানের বিরোধ সৃষ্টির পরও তিনি আপনাদেরকে গ্রাম থেকে এনে দিয়েছেন। এসবই আল্লাহ পাকের দান, তাঁর অনুগ্রহ। তিনিই আমার শৈশব কালের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দান করেছেন, শুধু তাই নয়; বরং আমি ছিলাম কারাগারে বন্দী অথচ তিনি আমাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করেছেন। এমনিভাবে শয়তানী চক্রান্তের কারণে সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত ভাইদের থেকে যে বিচ্ছেদ ঘটেছিল তা-ও আল্লাহর রহমতে দূরীভূত হয়েছে। এসব করুণাময় আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম করুণা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর উদারতা

এখানে যে বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় তা হলো, হযরত ইউসুফ (আঃ) এক্ষেত্রেও ভাইদের প্রতি কোন প্রকার দোষারোপ করেননি। এমনকি, তারা লজ্জিত হতে পারে এমন একটি বাক্যও উচ্চারণ করেননি।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, হযরত ইউসুফ (আঃ) কারাগার থেকে

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৮, পৃঃ ২১২

মুক্তি লাভের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অন্ধকার কূপে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কথা উল্লেখ করেননি, যেন তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা লজ্জা না পায়। এটি ছিল তাঁর উদারতা এবং মহানুভবতা।

إِنَّ رَبِّىْ لَطِيفٌ لِّمَا يَشَآءُ

"নিশ্চয় আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা করেন অত্যন্ত বিবেচনা সহকারে তাই করেন"।

তিনি মহাজ্ঞানী, তিনি সব কিছু জানেন। সৃষ্টির নিগুঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত। অর্থাৎ তাঁর তদবির কঠিনতর সমস্যাকে সহজ করে দেয় এবং তাঁর ইচ্ছা সর্বত্র কার্যকর হয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে لطيف শব্দটির অর্থ দয়াবান। মেহেরবান। এ শব্দটি সেই উপকারী সত্তা সম্পর্কে ব্যবহৃত হয় যিনি অন্যের উপকার করেন উত্তমভাবে। আর তিনি মহাজ্ঞানী, সমগ্র সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবগত। কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই। আর তাঁর প্রতিটি কাজ হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ। যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন সে বিষয়ের উপকরণগুলোকে সহজ করে দেন এবং এমন অবস্থায় অনেক কঠিনতম কাজও সহজ হয়ে যায়। কেননা তিনি সব কিছুর তাৎপর্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। তাঁর জ্ঞান অনন্ত অসীম, আর তাঁর তদবির অত্যন্ত সুদৃঢ়।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে যখন তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করেছিল তখন থেকে এ পর্যন্ত ৪০ বছর অতিবাহিত হয়েছে। এর মধ্যে বহু পরীক্ষা এসেছে, বহু কঠিন সমস্যা দেখা দিয়েছে। শুধু আল্লাহ পাকই এসব কিছুর হেকমত সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।

ইমাম কুরতবী (রঃ) লিখেছেন, ইতিহাসবেত্তাগণের বর্ণনা হলো, হযরত ইয়াকুব (আঃ) মিশরে পুত্র ইউসুফ (আঃ)-এর নিকট ২৪ বছর কাল অত্যন্ত আরাম এবং স্বাচ্ছন্দে অতিবাহিত করেছেন। যখন তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে তখন তিনি হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে অসিয়ত করেন যে তাঁকে যেন সিরিয়ায় তাঁর পিতা ইসহাক (আঃ)-এর কবরের কাছে দাফন করা হয়। অবশেষে হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর এন্তেকাল হয় মিশরে। অসিয়ত মোতাবেক হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর শবদেহ সিরিয়া নিয়ে যান। ঘটনাক্রমে ঐদিনই হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর ভাই আয়েস এন্তেকাল করেন। তাঁদের উভয়কে একই স্থানে দাফন করা হয়। তাঁদের জন্মও হয়েছিল একই সঙ্গে আর তাঁদের উভয়ের বয়স হয়েছিল ১৪৭ বছর। হযরত ইউসুফ (আঃ) পিতা এবং পিতৃব্য উভয়ের দাফন কার্য শেষ করে মিশর প্রত্যাবর্তন করেন।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) ইমাম বয়জাভী (রঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর পিতা-মাতাকে রাজকীয় সম্পদ দেখিয়েছেন। এক একটি

১। তফসীরে কুরতবী, খন্ড-৯, পৃঃ ২৬১
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৪, পৃঃ ৬৬

করে প্রত্যেকটি জিনিস তাঁরা দেখেছেন। অনেক স্তূপীকৃত কাগজও তাঁদেরকে দেখিয়েছেন। তখন হযরত ইয়াকুব (আঃ) বললেনঃ তোমার নিকট এত কাগজ থাকা সত্ত্বেও তুমি একটি চিঠি লিখে নিজের অবস্থান সম্পর্কে কেন আমাকে জানালেনা?

হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেনঃ হযরত জীব্রাঈল (আঃ) আমাকে এ নির্দেশই দিয়েছিলেন। তখন হযরত ইয়াকুব (আঃ) বললেনঃ জীব্রাঈলকে এর কারণ কেন জিজ্ঞাসা করলে না? হযরত ইউসুফ (আঃ) বললেনঃ জীব্রাঈল (আঃ)-এর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক অধিকতর সহজ। আপনিই তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন।

হযরত জীব্রাইল (আঃ)-কে হযরত ইয়াকুব (আঃ) এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেনঃ আমাকে আল্লাহ পাক এ আদেশই দিয়েছিলেন। কেননা আপনি ইউসুফ (আঃ)-কে বিদায় দেয়ার আগে বলেছিলেনঃ

أَخَافُ أَنْ يَّأْكُلَهُ الذِّئْبُ

"আমার ভয় যে, বাঘ তাকে খেয়ে ফেলবে"।

তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, "বাঘের আশংকা হলো, আমার ভয় হলো না"?[১]

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِيْ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِيْ مِنْ تَاْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيّٖ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠١﴾
ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوْۤا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُوْنَ ﴿١٠٢﴾

তরজমা

(১০১) হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দান করেছ এবং স্বপ্নের তা'বীর শিক্ষা দিয়েছ। হে দ্যুলোক ভূলোকের স্রষ্টা! তুমি দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে মুসলমান অবস্থায় মৃত্যু বরণের তওফিক দিও এবং আমাকে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত করো।

(১০২) এসব গায়বী খবর (হে রসূল!) আমি ওহীর মাধ্যমে আপনার নিকট প্রেরণ করছি। (হে রসূল!) যখন তারা ষড়যন্ত্র করছিল এবং এ সম্পর্কে মতৈক্যে পৌছেছিল তখন

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-১৩, পৃঃ ৬০
তফসীরে কবীর, খন্ড-১৮, পৃঃ ২১৬

তখন আপনি তাদের সঙ্গে ছিলেন না।

তফসীরুল কোরআন

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর পিতা হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর মৃত্যুর পর তিনি ২৩ বছর জীবিত ছিলেন। যেহেতু জাগতিক সমস্ত বিষয় আল্লাহ পাকের রহমতে পরিপূর্ণ হয়েছিল। তিনি উপলব্ধি করলেন দুনিয়ার এ জীবন যতই আনন্দদায়ক, স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হোক না কেন, দুনিয়ার কোন নেয়ামতই চিরস্থায়ী নয়, অবশেষে একদিন প্রত্যেককেই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। এজন্যে হযরত ইউসুফ (আঃ) দোয়া করলেন যেন সুন্দরভাবে জীবনের অবসান ঘটে।

আলোচ্য আয়াত সমূহে এই দোয়ার উল্লেখ রয়েছে। ইমাম রাজী (রঃ) এ পর্যায়ে লিখেছেন, যেহেতু পিতা এবং পিতৃব্যের এন্তেকাল হয়েছে, তাই হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর অন্তরেও আখেরাতের প্রতি আকষর্ণ সৃষ্টি হয়, তাই তিনি এভাবে দোয়া করলেন-

رَبِّ قَدْ اٰتَيْتَنِىْ

"হে পরওয়ারদেগার! তুমি আমাকে দান করেছ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, আমাকে শিক্ষা দিয়েছে স্বপ্নের তা'বীর, দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে তুমিই আমার অভিভাবক, তুমিই আমার একমাত্র ভরসা। হে আসমান জমিনের স্রষ্টা! আমাকে মুসলমান হিসাবে মৃত্যু বরণের তওফিক দিও। আর নেককার লোকেদের অন্তর্ভুক্ত করো"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ "সালেহীন" বলতে এখানে আম্বিয়ায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা পরিপূর্ণ নেকী শুধু তখনই অর্জিত হয় যখন মানুষ যাবতীয় গুনাহ, সকল পাপাচার এবং ভুল-ক্রুটি থেকে সংরক্ষিত থাকে, নিঃস্পাপ, নিঃস্কলংক হয়। আর এ অবস্থা নবীগণ ব্যতীত আর কারোই হয়না। অতএব, আলোচ্য আয়াতে "সালেহীন" অর্থ আম্বিয়ায়ে কেরাম। তফসীরকারগণ বলেছেনঃ

وَاَلْحِقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ۝

"আর আমাকে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত করুন"। এই দোয়া করেছেন হযরত ইউসুফ (আঃ) যেমন হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর এন্তেকালের পূর্বক্ষণে দোয়া করেছিলেন-

اللهم الرفيق الاعلى

অর্থাৎ হে আল্লাহ! শ্রেষ্ঠতম সাথী কামনা করি।

তফসীরকারগণ একথাও লিখেছেন যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর পিতা এবং পিতামহ ইয়াকুব (আঃ), ইসহাক (আঃ) এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মর্যাদা লাভের জন্যেই এ দোয়া করেছিলেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি শ্রবণ করেছি সে পর্যন্ত কোন নবীর এন্তেকাল হয় না, যে পর্যন্ত দুনিয়া আখেরাত উভয়ের মধ্যে কোনটি বাছাই করে নেয়ার অধিকার তাঁকে না দেয়া হয় এবং তিনি আখেরাতকে পছন্দ না করেন। তাই হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অন্তিম কালে যখন তাঁর রোগ বৃদ্ধি পায় তখন তাঁকে বলতে শুনেছিঃ

مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ الاية

(তাঁদের সাথে, যাঁদেরকে আল্লাহ পাক নেয়ামত দান করেছেন)

একথা শ্রবণ করে আমি বিশ্বাস করেছি যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের মধ্যে যে কোন একটিকে পছন্দ করার অধিকার দেয়া হয়েছে। (বোখারী ও মুসলিম)

হযরত ইউসুফ (আঃ) সম্পর্কে আরো কিছু কথা

তফসীরকারগণ লিখেছেন, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর দুনিয়ার জিন্দেগীর যাবতীয় বিষয় যখন সুসম্পন্ন হয় এবং পিতা-মাতা আত্মীয়-স্বজনও যখন একত্রিত হন, সকল কষ্ট দূরীভূত হয়, শান্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্য অর্জিত হয়, তখন আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হওয়ার আকাংক্ষা জাগ্রত হয় আর এজন্যে তিনি দোয়া করেন।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, এরপর তিনি কয়েক বছর জীবিত ছিলেন। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর ধারণায় এ দোয়ার পর তিনি মাত্র এক সপ্তাহ জীবিত ছিলেন। তবে আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত ইয়াকুব (আঃ) থেকে ইউসুফ (আঃ) কত বছর দূরে ছিলেন, এ সম্পর্কে তত্ত্বজ্ঞানীগণ একাধিক মত পোষণ করেছে।

কালবী (রঃ) বলেছেন, ২২ বছর যাবত তাদের মোলাকাত হয়নি। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, ৪০ বছর পর পিতা-পুত্রের সাক্ষাত হয়েছে।

হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, ১৭ বছর বয়সের সময় তাঁকে অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করা হয়। হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে তাঁর পিতা থেকে ৮০ বছর যাবত দূরে থাকতে হয়। হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর মোলাকাতের পর তিনি ২৩ বছর জীবিত ছিলেন এবং ১২০ বছর বয়সে তাঁর এন্তেকাল হয়। তৌরাতে রয়েছে তাঁর বয়স হয়েছিল ১১০ বছর। জুলায়খার ঘরে তাঁর তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। দু' পুত্র আফরাইম এবং মাইশা আর তৃতীয় হলো কন্যা রহমত। পুত্র আফরাইমের বংশধর ছিলেন ইউশা এবনে নুন। আর হযরত আইয়ুব (আঃ)-এর স্ত্রী হয়েছিলেন রহমত। আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর পর হযরত ইউসুফ (আঃ) ৬০ বছর জীবিত ছিলেন। যাহোক তফসীরকারগণ এ ব্যাপারে একমত যে, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর এন্তেকাল হয় ১২০ বছর বয়সে।[১]

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ২১৩

হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর দাফন

বর্ণিত আছে, মিশরবাসী মর্মর পাথরের একটি তাবুতের মধ্যে তাঁর শবদেহকে বন্ধ করে নীল নদে দাফন করে। এর কারণ এই যে, তাঁর এন্তেকালের পর প্রত্যেক মহল্লাবাসী তাঁকে তার এলাকায় দাফন করার দাবী জানায়, যেন তাদের এলাকায় বরকত হয়। এতে পরস্পরের মধ্যে লড়াই হওয়ার আশংকা দেখা যায়। অবশেষে সকলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে নীল নদে দাফন করা হোক। নীল নদের পানি সর্বত্র প্রবাহিত হয়, এ অবস্থায় তাঁর বরকত সকলেই লাভ করবে।

একরামা (রঃ) বলেছেন, প্রথমে তাঁকে নীল নদের দক্ষিন দিকে দাফন করা হয় যার কারণে নীল নদের ঐ দিকটি শস্য-শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। কিন্তু অপরদিক শুস্ক হয়ে যায়। তখন তাঁকে বাম দিকে নেয়া হয়। ফলে সেদিকে শস্য-শ্যামলিমায় ভরপুর হয় কিন্তু দক্ষিণ দিক শুস্ক হয়ে যায়। অবশেষে নীল নদের মধ্যখানে তাঁকে দাফন করা হয়। এতে নীল নদের উভয় দিকই ফলে-ফুলে পল্লবিত হয়।

হযরত মুসা (আঃ)-এর যুগে তাঁর কবর নীল নদেই ছিল। এরপর হরত মুসা (আঃ) তাঁর তাবুতকে নীল নদ থেকে বের করে সিরিয়া পৌঁছে দেন, পিতা-পিতামহের কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

এবনে এসহাক এবং এবনে আবি হাতেম ওরওয়া এবনে জোবায়েরের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ পাক যখন হযরত মুসা (আঃ)-কে হুকুম দিয়েছেন যে, মিশর থেকে বণী ইসরাঈলকে বের করে সিরিয়া নিয়ে যাও এবং নীল নদ থেকে ইউসুফের হাড়গুলো নিয়ে যাও এবং বয়তুল মোকাদ্দাসের পবিত্র ভূমিতে দাফন কর। হযরত মুসা (আঃ) তখন অনুসন্ধান করলেন এমন কোন ব্যক্তির যে ইউসুফ (আঃ)-এর কবরের কোন সন্ধান দিতে পারে। তখন এক ইসরাঈলী বৃদ্ধা পাওয়া গেল। সে বললোঃ আমি হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কবরে সন্ধান দিতে পারি তবে শর্ত হলো আমাকেও আপনার সঙ্গে এখান থেকে নিয়ে যাবেন। হযরত মুসা (আঃ) বললেন, তোমার আকাংক্ষা পূর্ণ করা হবে।

হযরত মুসা (আঃ) বণী ইসরাঈলের সঙ্গে ওয়াদা করেছিলেন যে, যখন চন্দ্র উদিত হবে তখন এখান থেকে বের হবো। যখন চাঁদ ওঠার সময় ঘনিয়ে এল তখন পর্যন্ত ইউসুফ (আঃ)–এর তাবুত বের করা সম্ভব হয়নি। এজন্যে তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করলেন যে, চন্দ্র উদিত হওয়ার ব্যাপার কিছু বিলম্ব যেন হয় (যেন তাঁর ওয়াদা বরখেলাফ না হয়) আল্লাহ পাকের দরবারে তাঁর দোয়া কবুল হয় এবং চাঁদ উঠতে বিলম্ব হয়। তখন তিনি ঐ ইসরাঈলী বৃদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে যান, সে নীল দরিয়ার পানির মধ্যে তাঁর সমাধির স্থান চিহ্নিত করে। হযরত মুসা (আঃ) তাবুতটি নীল নদ থেকে বের করলেন এবং সিরিয়া নিয়ে গেলেন। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর পর আমালেকা বংশে একের পর এক মিশরের রাষ্ট্র প্রধান হতে থাকে। বণী ইসরাঈল তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। তবে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ধর্মের তারা অনুসারী ছিল। এর বহুদিন পর হযরত মুসা (আঃ) নবী ও রসূল

হিসাবে প্রেরিত হন, যাঁর হাতে আল্লাহ পাক ফেরাউনকে ধ্বংস করেছেন।[১]

تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا বাক্য দ্বারা মৃত্যুর আকাংক্ষার প্রমাণ পাওয়া যায় না; বরং ঈমানের সাথে মৃত্যু বরণের আকাংক্ষার প্রমাণ পাওয়া যায়। মৃত্যুর আকাংক্ষা করা শরীয়ত সম্মত নয় তাই তফসীরকারগণ বলেছেন, বাক্যটির অর্থ হলো যখনই মৃত্যু আসে যেন মুসলমান অবস্থায় আসে।

ইমাম রাজী (রঃ) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যা করেছেন। হযরত থানবী (রঃ) লিখেছেন, এ বাক্যটি দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম নিঃষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা অন্তিম কালের অবস্থাকে ভয় করতেন। এজন্যে প্রত্যেকেরই কর্তব্য হলো সেদিনের জন্যে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকা। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির হওয়ার আকাংক্ষা রাখা।[২]

ইমাম রাজী (রঃ) এ পর্যায়ে ক্ষণস্থায়ী জগতের এবং ক্ষণভঙ্গুর জীবনের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করে লিখেছেন, এ আয়াতের কারণে আমার মনের এ অবস্থা হয়েছে, আমিও অধিক সময় হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর এ দোয়াটি পাঠ করতে থাকি।[৩]

وَمَآ اَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ
حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝١٠٣ وَمَا تَسْـَٔلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۭ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ
لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝١٠٤ وَكَاَيِّنْ مِّنْ اٰيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَمُرُّوْنَ
عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ۝١٠٥ وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا
وَهُمْ مُّشْرِكُوْنَ ۝١٠٦ اَفَاَمِنُوْٓا اَنْ تَاْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّٰهِ
اَوْ تَاْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝١٠٧ قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ
اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۣ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ۭ وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ وَ
مَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝١٠٨

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ২১৩
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৪, পৃঃ ৬৬
খোলাসাতুত তাফাসীর, খন্ড-২,পৃঃ ৪৫৮-৫৯
২। তফসীরে বয়ানুল কোরআন, পৃঃ ৪৯৫
৩। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৮, পৃঃ ২৩৪

তরজমা

(১০৩) (হে রসূল!) আপনি যতই আগ্রহী হন না কেন অধিকাংশ লোকই ঈমান আনবে না।

(১০৪) (হে রসূল!) আর আপনিতো এর জন্যে তাদের নিকট থেকে কোন বিনিময় কামনা করছেন না, এ-তো সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে উপদেশ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

(১০৫) আর আসমান ও জমিনে এমন অনেক নিদর্শন রয়েছে যা তারা প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু তারা এ নিদর্শন সমূহ সম্পর্কে থাকে উদাসীন।

(১০৬) আর তাদের অধিকাংশ লোক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনার পাশাপাশি তাঁর সাথে শেরকও করে।

(১০৭) তবে কি তারা আল্লাহ পাকের সর্বগ্রাসী শাস্তি থেকে অথবা তাদের অজ্ঞাতসারে আকস্মিকভাবে কেয়ামতের উপস্থিতি সম্পর্কে নিঃশংক হয়ে গেছে?

(১০৮) (হে রসূল!) আপনি বলুন, এটিই আমার পথ। আমি এবং আমার অনুসারীগণও মানুষকে আল্লাহ পাকের দিকে স্বজ্ঞানে আহবান করি। আল্লাহ পাক মহিমান্বিত, যারা আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করে আমি তাদের দলভুক্ত নই।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

মক্কার কাফের এবং ইহুদীদের তরফ থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তারই জবাবে আল্লাহ পাক সূরা ইউসুফ নাজিল করেন। এ সূরায় বিস্তারিতভাবে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এ সূরার শেষ পর্যায়ে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ

"এসব হলো গায়বী খবর যা আমি আপনার নিকট ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করেছি," কেননা আপনি আমার সত্য রসূল।

এখানে উল্লেখ্য, কাফের-মুশরেক এবং ইহুদীরা যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনা জানতে চেয়েছিল তখন তারা এ কথাও বলেছিল, যদি এ ঘটনা আপনি সঠিকভাবে আমাদেরকে জানিয়ে দেন তবে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনবো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের ঈমান আনয়নের ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনার পরও তারা ঈমান আনলো না। তাই ঐ সময় আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়। আল্লাহ পাক এরশাদ

করেছেনঃ

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ○

(হে রসূল!) আপনি তাদের ঈমানের ব্যাপারে যতই আগ্রহী হোন না কেন এবং যত চেষ্টাই করুন না কেন, আর তাদের সম্মুখে যত জ্বলন্ত, অকাট্য, সুস্পষ্ট এবং প্রকৃষ্ট প্রমাণই উপস্থাপন করুন না কেন, তাদের অধিকাংশ লোকই ঈমান আনবে না, তারা সত্যকে গ্রহণ করবে না। তারা কল্যাণের পথ পরিহার করে চলবে। নিজেদের পায়ে নিজেরাই কুঠারাঘাত করবে। অতএব, আপনি তাদের জন্যে দুঃখিত হবেন না। এটি ছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে সান্ত্বনা।

এ পর্যায়ে আরো এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ

আর তারা যদি ঈমান না আনে তবে তাতে আপনার কোন ক্ষতিও নেই, কেননা আপনি যে তাদেরকে সত্যের দাওয়াত দিচ্ছেন এবং তারা যে প্রশ্ন করেছিল তার জবাবও আপনি দিয়েছেন। যে গায়বী খবর আপনি তাদেরকে জানিয়েছেন তা আল্লাহ্ পাকের নবী ব্যতীত আর কারো পক্ষেই দেয়া সম্ভব নয়, আপনি আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে যা জানতে পেরেছেন তা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। আর এজন্যে তাদের নিকট থেকে আপনি কোন প্রকার বিনিময় বা কোন অর্থ-সম্পদও কামনা করেন না যে, তারা যদি ঈমান না আনে তবে সে বিনিময়ের পথ বন্ধ হয়ে যাবে, এমন কোন আশংকাও নেই। অতএব তাদের ঈমান না আনায় আপনার কিছুই যায় আসে না।

বস্তুতঃ পবিত্র কোরআন তো সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে অপূর্ব নসিহত, জীবন্ত উপদেশ। যে এই উপদেশ গ্রহণ করবে তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে। পক্ষান্তরে, যে এ উপদেশ বর্জন করবে সে ভাগ্যাহত হবে। অতএব, আপনার কাজ হলো এই উপদেশ পৌঁছে দেয়া। এ কাজ আপনি অব্যাহত রাখুন।

পবিত্র কোরআন আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের অকাট্য দলিল এবং আপনার নবুওয়্যতের জ্বলন্ত প্রমাণ দ্বারা পরিপূর্ণ। যদি কেউ সত্য-সন্ধানী হয় এবং কোরআনে করীমকে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে দেখে তবে তার নিকট অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যত দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট এবং প্রতিভাত হয়। আসমান-জমিনে আল্লাহ্ পাকের বিস্ময়কর কুদরত হেকমতের এবং তাঁর একত্ববাদের অসংখ্য নিদর্শন সমূহ রয়েছে। মানুষ সে সব জীবন্ত নিদর্শন সমূহ দেখে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও এ সম্পর্কে থাকে উদাসীন। যদি তারা এসব জীবন্ত নিদর্শনের প্রতি মনোনিবেশ করতো, তবে তারা আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের উপর বিশ্বাস করতো। কিন্তু তারা তা করেনা। অধিকাংশ লোকই পথভ্রষ্ট। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَكَأَيِّنْ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّوْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ
عَنْهَا مُعْرِضُوْنَ ○

আর আসমান জমিনে এমন বহু নিদর্শন রয়েছে তারা যা অতিক্রম করে যায়, তবুও তারা সে সম্পর্কে উদাসীন থাকে। বস্তুতঃ সৃষ্টি মাত্রই স্রষ্টার প্রমাণ। বিশ্ব-সৃষ্টিই বিশ্ব স্রষ্টার একত্ববাদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু তারা এ প্রমাণ সমূহের দিকে মনোনিবেশ করেনা; বরং এসব বিষয়ে বিমুখ থাকে। পৃথিবীর বহু জাতি আল্লাহ পাকের নাফরমানীর কারণে কোপগ্রস্ত হয়ে ধ্বংস হয়েছে এবং পরবর্তী কালের জন্যে শিক্ষণীয় বিষয় হয়ে রয়েছে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই এসব বিষয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেনা। যদি আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসও করে কিন্তু তাঁর বন্দেগীতে অন্যকে শরীক করে। যখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আসমান জমিন কে সৃষ্টি করেছে? তারা জবাব দেয় আল্লাহ পাক। যদি প্রশ্ন করা হতো আসমান থেকে কে পানি বর্ষন করে? তারা উত্তর দিত আল্লাহ পাক। এতদসত্ত্বেও তারা পাথরের পূজা করতো। আর কোন কোন লোক বৃষ্টিপাতের ব্যাপারে তারকারাজির তৎপরতার প্রতিক্রিয়ায় বিশ্বাস করতো। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে আরবের পৌত্তলিকদের "লাব্বায়েক" বলার ব্যাপারে। তারা এহরাম বাধার বা তওয়াফ করার সময় "লাব্বায়েক" বলতো অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমরা হাযির। আমরা হাযির। তোমার কোন শরীক নেই, তবে সে শরীক, যাকে তুমি শরীক করেছ, আর তুমিই তার মালিক, সে মালিক নয়। আতা (রঃ) বলেছেন, মুশরেকদের এ দোয়া আরাম-আয়েশের সময় হতো এবং তারা তাদের প্রতিপালককে ভুলে যেত। কিন্তু যখন তারা বিপদাপদে পতিত হতো তখন শুধু আল্লাহ পাককেই ডাকতো যেমন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَإِذَا رَكِبُوا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ....

"তারা যখন জাহাজে আরোহন করে তখন অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে আল্লাহকে ডাকে। যখন আল্লাহ পাক তাদেরকে সমুদ্রের ভয়াবহ স্রোত থেকে রক্ষা করেন তথা শুস্ক জমিনে পৌঁছে দেন তখন তারা শেরক করতে শুরু করে"।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর অর্থ হলো তারা আল্লাহ পাকের হুকুমের খেলাফ তাদের ধর্মযাজকদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং আল্লাহ পাকের নাফরমানীর পথ অবলম্বন করে। যদি তারা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ বিধান সমূহের প্রতি আন্তরিকতার সঙ্গে লক্ষ্য করতো, আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত হেকমতের বিষয় চিন্তা করতো তবে অবশ্যই তারা সঠিক পথের সন্ধান লাভ করতো। কিন্তু সেদিকে তাদের মন নেই। তাই তাদের অধিকাংশ লোকই মুশরেক।

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, বিশ্ব-জগতে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের অগণিত জীবন্ত নিদর্শন সমূহ রয়েছে। যারা বিশ্ব-সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করে তারা সর্বত্র এক মহাশক্তির অদৃশ্য ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করে এবং আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করে, তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে। আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা, বৃক্ষ-তরুলতা, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ এক কথায় সমগ্র সৃষ্টি জগতের

মধ্যে আল্লাহ পাকের অগণিত নিদর্শন সমূহ দেখে মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বলে ওঠেঃ হে পরওয়ারদেগার! তুমি এসব কিছু নিরর্থক সৃষ্টি করোনি, কিন্তু নির্বোধ লোকেরা এসব কিছু দেখেও দেখেনা। এজন্যে তারা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করেনা এবং শেরক থেকে বিরত হয়না। তাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও রয়েছে যারা আল্লাহ পাককে স্রষ্টা ও পালনকর্তা মানে কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন সৃষ্টিকেও শরীক মনে করে। এ পৌত্তলিকরা অন্যকেও আল্লাহর সাথে শরীক করে। পৌত্তলিকরা হজ্জের মওসুমে মক্কা শরীফ আসে লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক ---------------(হে আল্লাহ! আমরা হাযির, তোমার কোন শরীক নেই) বলে। কিন্তু এরপর তারা বলে আর যা কিছু শরীক রয়েছে তা-ও তোমার মালিকানাধীন।

সবচেয়ে বড় গুনাহ

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছেনঃ সবচেয় বড় গুনাহ কি? তিনি জবাব দিলেনঃ আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করা, অথচ তিনি একাই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

এ আয়াতের মর্মে মুনাফেকরাও অন্তর্ভুক্ত। কেননা তারা যা কিছু করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে করে আর এটি হলো গোপন শেরক।

কোরআনে করীমে আল্লাহ পাকে এরশাদ করেছেনঃ

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ وَمَا يَخْدَعُوْنَ اِلَّآ اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ ○

"তারা আল্লাহ পাক এবং মোমেনদেরকে ধোঁকা দেয়, অথচ তারা নিজেরা নিজেদেরকে ধোঁকা দেয়"।

তাই রিয়াকারী আল্লাহ পাকের দরবারে অত্যন্ত অপছন্দনীয়। কেননা এটিও শেরক।

মসনদে আহমদে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি তোমাদের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী ভয় করি ছোট শেরকের। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, ছোট শেরক কি? তিনি এরশাদ করলেন, রিয়াকারী। কেয়ামতের দিন মানুষকে তাদের আমলের বদলা দেয়া হবে। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ হে রিয়াকাররা! যাদেরকে দেখাবার জন্যে তোমরা কাজ করেছ তাদের থেকেই তোমাদের আমলের বদলা নিয়ে নাও।[১]

এ আয়াত সম্পর্কে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, এ আয়াত নাজিল হয়েছে মুশরেকদের তলবিয়া সম্পর্কে যা

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু), পারা-১৩, পৃঃ ১৯-২০

তারা হজ্জের সময় পাঠ করতো।

বর্ণিত আছে, এ আয়াত নাজিল হয়েছে মক্কাবাসী সম্পর্কে, তারা বলে আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক। আর ফেরেশতারা হলেন তাঁর কন্যা (নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক)। এভাবে তারা শেরক করতো। আর একথাও বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত নাজিল হয়েছে মূর্তিপূজকদের সম্পর্কে। মূর্তিপূজকরা বলে এক আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক, আর মূর্তিগুলো হলো তাঁর নিকট আমাদের সুপারিশকারী। আর ইহুদীরা বলে এক আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক, ওজায়ের (আঃ) হলেন আল্লাহর পুত্র (নাউজুবিল্লাহ মিন জালেক)। নাসারারা বলে, এক আল্লাহ আমাদের প্রতিপালক, আর ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র (নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক)। পক্ষান্তরে, মোহাজের ও আনসারগণ তথা মোমেনগণ বলেন এক আল্লাহ পাকই আমাদের প্রতিপালক এবং তাঁর কোন শরীক নই।[১]

এজন্যেই মোমেন ব্যতীত আর সকল ফেরকার জন্যে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করেছেন যে, অধিকাংশ লোকই আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে না। তারা মুশরেক, আল্লাহ পাকের সঙ্গে তারা শেরক করার ধৃষ্ঠতা দেখায়। পরবর্তী আয়াতে তাদের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয়েছে বিশেষ সতর্কবাণী, এরশাদ হয়েছেঃ

أَفَأَمِنُوٓا۟ أَن تَأْتِيَهُمْ غَٰشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ

তবে কি তারা নিজেদের আত্মরক্ষা করার জন্যে তথা নিরাপত্তার লক্ষ্যে কোন ব্যবস্থা করে নিয়েছে? আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অতর্কিতভাবে যদি কোন বিপদাপদ এসে পড়ে অথবা যদি হঠাৎ কেয়ামতই ঘটে যায় তবে কি এ সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ নিঃশংক হয়ে গেছে? অথবা কেয়ামত এমন অবস্থায় আসতে পারে যে, তারা তার কিছুই বুঝতে পারবেনা।

ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে غَاشِيَةٌ শব্দের অর্থ হলো হঠাৎ আপতিত বিপদ।

আর যাহ্যাক (রঃ) বলেন, আসমান থেকে যে বজ্রপাত হয় এ শব্দটি দ্বারা তাই উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, লোকেরা বাজারে কেনা-বেচায় ব্যস্ত থাকবে হঠাৎ একটি বিকট শব্দ তাদেরকে বিপদগ্রস্ত করে তুলবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দু' ব্যক্তি (বিক্রেতা ও ক্রেতা) সম্মুখে কাপড় ছড়িয়ে দেবে এবং তারা বেচা-কেনার কাজে মশগুল থাকবে, এমন সময় হঠাৎ কেয়ামত চলে আসবে। ক্রয়-বিক্রয় করা সম্ভব হবে না, এমনকি ছড়ানো কাপড়টি গুটিয়ে নেয়াও সম্ভব হবে না।

قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ

(হে রসূল!) আপনি সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করুন, তওহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদ এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর প্রস্তুতির দাওয়াত, এটিই আমার পথ, আমি মানুষকে আল্লাহ পাকের দিকে আহবান জানাই। আমার আহবান সকল শেরক-কুফর দূরীভূত করার, যাবতীয় কুসংস্কার পরিহার করার এবং তওহীদের পথ গ্রহণ করার। আমি এবং আমার অনুসারীগণ সত্য ও ন্যায় উপলব্ধি করেই সকলকে তওহীদের পথ অবলম্বনের আহবান জানাই। আল্লাহ পাক পবিত্র, সকল ত্রুটি থেকে মুক্ত, আর আমি মুশরেকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আল্লাহ পাক স্বীয় রসূলকে আদেশ দিয়েছেনঃ মানুষকে একথা জানিয়ে দিন যে, আমার কাজ হলো মানুষকে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের দিকে আহবান করা। পূর্ণ বিশ্বাস, ভক্তি-অনুরক্তি নিয়ে আল্লাহ পাকের প্রতি আহবান করা। যারা আমার অনুসারী, তারাও মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, আমরা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনাকারী। কোন কিছুকে তাঁর শরীক করা থেকে এবং যাবতীয় দুর্বলতা থেকে তাঁকে আমরা পবিত্র জানি। তাঁর কোন সন্তান-সন্ততী নেই, কোন স্ত্রী নেই, কোন সাথী নেই। তিনি এসব বিষয় থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র, সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ কিন্তু মানুষ এ সত্য উপলব্ধি করেনা।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে বলেছেন, আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ নির্দেশ দিয়েছেনঃ "(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, আর আমি তওহীদের দিকেই আহবান করি, যারা আমার অনুসারী তারাও আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকে"।

কালবী (রঃ) এবং এবনে জায়েদ (রঃ) বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসারীদের কর্তব্য হলো মানুষকে সে পথের দিকে আহবান করা যে পথের দিকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আহবান করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসারী বলে সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তাঁরা ছিলেন এলম এবং ঈমানের কেন্দ্র এবং তাঁরা ছিলেন আল্লাহ পাকের সেনাবাহিনী।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেনঃ যে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সুন্দরতর আদর্শের অনুসরণ করতে চায়, তার কর্তব্য হলো সাহাবায়ে কেরামের পদাংক অনুসরণ করা, কেননা আল্লাহ পাক তাঁদেরকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভের জন্যে পছন্দ করেছেন এবং তাঁরা সরল-সঠিক পথে চলেছেন, অতএব তোমরা তাঁদের অনুসরণ কর।[২]

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু), পারা-১৩, পৃঃ ১১৯
২। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ২১৭-১৮

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا
نُّوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرٰى ؕ اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ
اتَّقَوْا ؕ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۰۹﴾ حَتّٰٓى اِذَا اسْتَيْـَٔسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوْٓا
اَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا ۙ فَنُجِّيَ مَنْ نَّشَآءُ ؕ وَلَا
يُرَدُّ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿۱۱۰﴾ لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ
عِبْرَةٌ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ؕ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ
تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى
وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۱۱۱﴾

তরজমা

(১০৯) আর (হে রসূল!) আপনার পূর্বে আমি যতজনকেই রসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি তাঁরা সকলেই ছিলেন পুরুষ, আমি তাঁদের নিকট ওহী প্রেরণ করতাম, তাঁরা সকলেই জনপদে বাস করতো। তবে কি তারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি? এবং তাদের পূর্ববর্তী লোকদের কি পরিণতি হয়েছিল তারা কি তা দেখেনি? যারা মোত্তাকী, পরহেজগার তাদের জন্যে আখেরাতের ঘরই উত্তম। তবু কি তারা বুঝতে পারেনা?

(১১০) অবশেষে যখন রসূলগণ পর্যন্ত নিরাশ হয়ে যান এবং তাঁরা মনে করেন যে, রসূলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে তখনই আমার সাহায্য এসে পড়ে। মূলতঃ আমি যাকে ইচ্ছা তাকে রক্ষা করি, পাপীষ্ঠ সম্প্রদায় থেকে আমার শাস্তি রদ করা যায় না।

(১১১) নিশ্চয় তাদের ঘটনাবলীতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে রয়েছে শিক্ষা। এটি কোন মিথ্যা রচনা নয়; বরং এটি হলো তার পূর্ববর্তী কথারই অনুকূল, প্রত্যেকটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ এবং ঈমানদারদের জন্যে হেদায়েত এবং রহমত।

তফসীরুল কোরআন

মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মানুষকে তাঁর

নবুওয়্যতের কথা বললেন এবং আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানালেন, তখন যারা তাঁর নবুওয়্যতকে অস্বীকার করলো তারা বললো, আল্লাহ্ পাক যদি কোন নবী পাঠানোর ইচ্ছা করতেন তবে একজন ফেরেশতা প্রেরণ করতেন। পৌত্তলিকদের একথার জবাবেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ মানুষের হেদায়েতের জন্যে রসূল প্রেরণ আমার শাশ্বত নিয়ম, যুগে যুগে বিভিন্ন দেশ ও পরিবেশে রসূল প্রেরিত হয়েছে, তাঁরা সকলেই মানুষ ছিলেন, ফেরেশতা নয়, পুরুষ ছিলেন নারী নয়, জনপদের অধিবাসী ছিলেন, মরুবাসী নয়।[১]

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا

"তবে কি তারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনা? যে, তাদের পূর্ববর্তী লোকদের ভয়াবহ পরিণাম দেখতে পায়"।

অর্থাৎ যারা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করে তাদের কর্তব্য হলো পৃথিবীতে ভ্রমণ করে পূর্বকালের নাফরমানদের শোচনীয় পরিণতি দেখা এবং শিক্ষা গ্রহণ করা।

আর যারা পরহেজগার, তাদের জন্যে আখেরাতের ঘরই উত্তম, তবু কি তোমরা এ সত্য উপলব্ধি করবেনা? অর্থাৎ ইতিপূর্বে যারা আল্লাহর নবীগণকে অস্বীকার করেছে, তাঁদের মোজেযা সমূহকে মিথ্যা জ্ঞান করেছে, তাদের যে শাস্তি হয়েছে, তা দেখে এ পৌত্তলিকরা কেন শিক্ষা গ্রহণ করেনা? মূলতঃ অতীতকালের অবাধ্য-অকৃতজ্ঞদের কি শাস্তি হয়েছে, আর যারা পরহেজগার তাদের কি পুরস্কার দেয়া হয়েছে আর কিভাবে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করেছেন তা সর্বকালের মানুষের জন্যে এক শিক্ষণীয় বিষয়। এরশাদ হয়েছেঃ

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○

"তোমরা কি অনুধাবন কর না"?

وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ

আর আখেরাতই উত্তম তাদের জন্যে যারা পরহেজগারী অবলম্বন করে। কেননা, আখেরাতের নেয়ামত অনন্ত অসীম, দুনিয়াতে আখেরাতের নেয়ামতের কথা কল্পনাও করা যায় না, আর আখেরাতের নেয়ামতের হক্বদার একমাত্র মোমেনগণই।

অতএব, এ সত্য উপলব্ধি করা বুদ্ধিমান মাত্রেরই কর্তব্য।

حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ

"অবশেষে যখন পয়গম্বরগণ পর্যন্ত নিরাশ হয়ে যান এবং লোকে মনে করে যে, রসূলগণকে মিথ্যা আশ্বাস দেয়া হয়েছে, তখন তাদের নিকট আমার সাহায্য আসে।

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৮, পৃঃ ২২৫
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ২১৮

এভাবে আমি যাকে ইচ্ছা নাজাত দান করি, আর পাপীষ্ঠ সম্প্রদায় থেকে আমার শাস্তি রদ করা যায় না"।

কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, কাফেরদের দৌরাত্ম এবং ধৃষ্টতা চরম পর্যায়ে পৌছে। অথচ আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাদের উদ্দেশ্যে ইতিপূর্বে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে এবং নাফরমানদের জন্যে যে শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে তা আসতে বিলম্ব হয়। এমন অবস্থায় আল্লাহ পাকের সাহায্য সম্পর্কে নিরাশ হওয়া অনুচিত। কারণ, ইতিপূর্বেও অবাধ্য কাফেরদের দৌরাত্মের ব্যাপারে দীর্ঘ অবকাশ দেয়া হয়েছে। দূরাত্মা কাফেরদের প্রতি আযাব আসতে এত বিলম্ব হযেছে যে, জালেমরা নিঃশংক-নিশ্চিন্ত মনে তাদের অন্যায়-অনাচার অব্যাহত রেখেছে। এমনকি, এমন চরম অবস্থাও হয়েছে যে, রসূলগণ তাদের সম্প্রদায়ের ঈমান আনয়নের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যান এবং এ ধারণা করেন যে, যে অঙ্গীকার করেছিল তা তারা রক্ষা করবেনা তথা ঈমান আনবে না। তাদের মনের এ অবস্থায় আল্লাহ পাকের সাহায্য এসে পড়ে। অথচ অবস্থা এই ছিল যে, কাফেররা মনে করে আমাদের প্রতি যে আজাব প্রেরণের কথা ঘোষণা করা হয়েছে এবং নবীগণকে সাহায্য করার যে কথা বলা হয়েছে সবই ভিত্তিহীন, শুধু আমাদের ভয় প্রদর্শনের জন্যেই তা বলা হয়েছে এমন অবস্থায় আল্লাহ পাকের সাহায্য এসে পড়ে।

আলোচ্য আয়াতের আর একটি অর্থ হলো, পয়গম্বরগণ এ ধারণা করেছেন, আমরা বুঝতে ভুল করেছি যে, আমাদের সাহায্য অতি সত্তর আসবে। কিন্তু আমাদের এ ধারণা ভুল ছিল। অথবা ظنوا শব্দের সর্বনামটি দ্বারা কাফেরদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে অর্থাৎ অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছে গেছে যে, কাফেররা ধারণা করতে থাকে যে, পরগম্বরগণ আমাদেরকে তওহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানিয়েছেন, অন্যথায় আজাবের যে হুমকি দিয়েছিলেন তা সঠিক নয়।[১]

অথবা এর অর্থ হলো পয়গম্বরগণের প্রতি যারা ঈমান এনেছে তারাই ধারণা করতে লাগলো, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সাহায্য লাভের যে আশ্বাস এবং বিজয়ের যে সুসংবাদ আমাদেরকে দেয়া হয়েছে, কাফেরদের ধ্বংসের যে কথা বলা হয়েছে, তা সঠিক নয় বলে প্রমাণিত হয়েছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ পয়গম্বরগণও মানুষ, আর মানুষ হিসেবেই ধারণা করেন যে, বিজয় এবং সাহায্যের যে ওয়াদা আমাদের সঙ্গে করা হয়েছে তা পুরো হয়নি। এ আয়াতের অর্থ তাই যা অন্য আয়াতেও রয়েছে। যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

حَتّٰى يَقُوْلَ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ

"কাফেরদের দৌরাত্ম এভাবে বৃদ্ধি পায় এবং তাদেরকে এমন অবকাশ দেয়া হয় যে,

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ২২০

স্বয়ং রসূল এবং তাঁর সঙ্গী মোমেনগণ পর্যন্ত বলতে থাকে কখন আসবে আল্লাহ পাকের সাহায্য"?

অর্থাৎ কাফেরদের জুলুম-অত্যাচারের কারণে অবস্থা এমন ভয়াবহ হয়ে দাঁড়ায় যে, পয়গম্বরগণকেও এমন মন্তব্য করতে হয়। আলোচ্য আয়াতের মর্মকথাও তাই।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এটি হলো আয়াতের রূপক অর্থ। কাফেরদেরকে সুদীর্ঘ অবকাশ দেয়া এবং তাদের শাস্তি বিধানে বিলম্ব করার দৃষ্টান্ত স্বরূপ একথা বলা হয়েছে।

কুফাবাসী আরবী ভাষাবিদগণ كذبوا শব্দটিকে "জাল" অক্ষরের উপর তশদীদ না দিয়ে পাঠ করেন, আর অন্যরা তার উপর তশদীদ দিয়ে পাঠ করেন। এর মর্ম হলো, যেভাবে কাফেররা আল্লাহর নবীকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে তাতে তাদের ঈমান আনয়নের কোন আশা রয়নি।

ইমাম কাতাদা (রঃ) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন। কোন কোন ব্যাখ্যাকার আয়াতের এ অর্থও বর্ণনা করেছেন যে, যেহেতু আল্লাহর নবী কাফেরদের ঈমান আনয়নের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছেন এবং তারা ধারণা করেছেন যে, যারা ঈমান এনেছে তাদেরকেও মিথ্যুক সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং তারা কঠিন সংকটের সম্মুখীন হয়েছে। এমন অবস্থায় কাফেরদের শাস্তিতে বিলম্ব হওয়ার কারণে তাদের মনেও অশান্তি সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয় এবং আশংকা আছে যে, তারাও ঈমান থেকে সরে যাবে। এমন চরম মুহূর্তেই আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সাহায্য আসে।

فَنُجِّىَ مَنْ نَّشَآءُ

(আমি যাকে ইচ্ছা তাকে রক্ষা করি।)

যেহেতু নবীগণ এবং তাঁদের সাথী ঈমানদারগণ নাজাতের যোগ্য বলে বিবেচিত হন তাই ঘোষণা করা হয়েছেঃ আমি যাকে ইচ্ছা তাকে রক্ষা করি।

وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا

অর্থাৎ–আল্লাহ পাকের তরফ থেকে কাফেরদের জন্যে যে আজাব আপতিত হয় তা ফেরত যায় না। আজাব আসতে হয়তো বিলম্ব হয় কিন্তু একবার আজাবের সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে তা ফিরিয়ে নেয়া হয়না; বরং অবশ্যই তা পাপীষ্ঠদের উপর আপতিত হয়। আর এ সম্পর্কে যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে তা এই, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যখন আজাব আসে তখন তা সামগ্রিকভাবে আসে। আর সতর্কবাণী হলো এই, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لَّا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً

"তোমরা ভয় কর সে আজাবকে যা শুধু তোমাদের মধ্যে যারা জালেম তাদের উপরই বিশেষভাবে আসবে না; বরং অন্যদের উপরও আসতে পারে"।[১]

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ২২০

মোট কথা, আল্লাহ পাকের বিধান হলো আল্লাহর নবীগণ এবং তাঁর প্রিয় বন্দাগণকে আল্লাহ পাক পরীক্ষা করেন। যখন তাদের অবস্থা চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায় তখন তারা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সাহায্য লাভ করেন। সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, মিথ্যা বিদায় নেয়। আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় বন্দাদেরকে সম্মানিত করেন, আর তাঁর দুশমনদের অবমাননা বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করে। আর যে আজাব কাফেরদের প্রতি আপতিত হয় তা থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে আল্লাহ পাকে রক্ষা করেন তথা ঈমানদারদেরকে আল্লাহ পাক তাঁর আজাব থেকে রক্ষা করেন।

দ্বিতীয়তঃ পাপীষ্ঠদের জন্যে যে আজাব আপতিত হয় তা কখনও ফেরত যায়না অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাঁর দুশমনদের প্রতি আজাব অবতরণের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করেন না; বরং তাদেরকে অবকাশ দিতে থাকেন। এদিকে পয়গম্বরগণকে এবং তাঁদের অনুসারীগণকে বিভিন্ন প্রকার বালা-মসিবতে পরীক্ষা করতে থাকেন। এমনকি, যখন তাঁদের দুঃখ-কষ্ট চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায় এবং প্রকাশ্য উপকরণ থেকে নিরাশও হয়ে যান তখন আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এভাবে আরজী পেশ করেন যে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে সাহায্য কর, কখন আসবে তোমার সাহায্য? আর কখন দুশমনদের উপর আমরা বিজয় লাভ করবো? তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সুসংবাদ আসে–

أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ ○

"মনে রেখো, আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটবর্তী"।

একথার তাৎপর্য হলো, কঠিন পরীক্ষা এবং মহা বিপদের পরই আসে আল্লাহ পাকের সাহায্য। আর অবশেষে আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় বন্দাদেরকে রক্ষা করে থাকেন।

আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, কাফেরদেরকে অবকাশ দেয়া হয় এবং তাদের শাস্তি বিধানে এত বিলম্ব হয় যে, আল্লাহর পেয়ারা বন্দাগণ আল্লাহ পাকের সাহায্য প্রাপ্তির ব্যাপারে নিরাশ হতে শুরু করেন। তাঁরা এ ধারণা করেন যে, আমাদের কোন ভুল-ভ্রান্তির কারণেই আল্লাহ পাক সাহায্যের যে ওয়াদা করেছেন তা পুরো করেননি। কেননা সাহায্যের জন্যে যা পূর্ব শর্ত ছিল তা আমরা আদায় করতে ব্যর্থ হয়েছি। বস্তুতঃ ওয়াদা পূর্ণ করার জন্যে তাঁর তরফ থেকে আরোপিত শর্ত আমরা পুরো করতে পারিনি। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ○

(নিশ্চয় আল্লাহ পাক ওয়াদা ভঙ্গ করেন না।)

অতএব, আমাদের কোন ভুল-ভ্রান্তির কারণে যদি আল্লাহ পাক ওয়াদা পূর্ণ না করেন এবং তাঁর সাহায্য প্রেরণ না করেন তবে তা তাঁর মর্জির ব্যাপার।

لَقَدْ كَانَ فِىْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِى الْأَلْبَابِ

"নিশ্চয় তাদের ঘটনাবলীতে রয়েছে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে অনেক শিক্ষণীয়

বিষয়"।

অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আঃ) এবং তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের এ ঘটনায় অথবা পূর্বে বর্ণিত আম্বিয়ায়ে কেরামের এবং তাঁদের উম্মতদের ঘটনাবলীতে রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্যে অনেক শিক্ষা।

হযরত ইউসুফ (আঃ)-কে তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইয়েরা অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করেছিল। এরপর তাঁকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করেছিল। ব্যবসায়ীরা তাঁকে মিশরের বাজারে গোলাম হিসাবে বিক্রয় করেছিল, অথচ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন তাঁকে মিশরের রাজত্ব দান করেছিলেন। শুধু তাই নয়, বরং তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইদেরকে তাঁর সম্মুখে সাহায্য-প্রার্থী হিসেবে হাযির করিয়েছিলেন। তাঁর বিচ্ছেদ-বেদনায় ক্রন্দণ-রত অবস্থায় তাঁর পিতা দৃষ্টি-শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁকে এবং তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র ইউসুফকে (আঃ) আল্লাহ্ পাক অবশেষে একত্রিত করেছিলেন। এসবই আল্লাহ্ পাকের কুদরত, রহমত এবং অনুগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই নয়। অতএব, মক্কার পৌত্তলিকরা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যত বিরোধিতাই করুক না কেন, অবশেষে আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বিজয় দান করবেন।

দ্বিতীয়তঃ হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর যে ঘটনা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে পবিত্র কোরআনের ভাষায় বর্ণিত হলো তা নিঃসন্দেহে তাঁর মোজেযা যা তাঁর নবুওয়্যতের সত্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

তৃতীয়তঃ এ সূরার শুরুতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ

(হে রসূল!) আমি আপনার নিকট সুন্দরতম কাহিনী বর্ণনা করবো, আর সূরার শেষ পর্যায়ে এসে এরশাদ হয়েছেঃ

لَقَدْ كَانَ فِىْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ

(নিশ্চয় তাদের ঘটনায় রয়েছে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে অনেক উপদেশ।)

এ ঘটনার সৌন্দর্য এবং বৈশিষ্ট্য এই যে, এর দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করা যায়। আর যে ঘটনাবলীর উল্লেখ রয়েছে তন্মধ্যে একটি হলো হযরত ইউসুফ (আঃ) ও তাঁর বৈমাত্রেয় ভাইদের ঘটনা। তবে এ ঘটনা থেকে শিক্ষা তারাই গ্রহণ করতে পারে, যারা বুদ্ধিমান। জীবনকে সঠিক ভাবে গড়ে তোলার, পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর প্রস্তুতি গ্রহণের যথেষ্ট শিক্ষা এবং আদর্শ রয়েছে এ ঘটনায়।[১]

مَاكَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৮, পৃঃ ২২৭-২৮

وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُونَ ○

তবে মনে রাখতে হবে, পবিত্র কোরআন কারো কল্পনার ফসল নয়; এটি কোন মানুষের কথা নয়; বরং বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পবিত্র কালাম, যা তিনি মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে নাজিল করেছেন। ইতিপূর্বে যে আসমানী কিতাব সমূহ অবতীর্ণ হয়েছে, মহা গ্রন্থ পবিত্র কোরআন সে গ্রন্থ সমূহের সত্যায়নকারী। এতে রয়েছে প্রত্যেকটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ। এ মহান গ্রন্থ মোমেনদের জন্যে বিশেষভাবে পরিপূর্ণ হেদায়েত এবং রহমত। যেহেতু মোমেনগণই এ মহান গ্রন্থ দ্বারা উপকৃত হয় এজন্যে বিশেষভাবে মোমেনদের জন্যে এই কিতাব হেদায়েত ও রহমত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। যদিও সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে এতে রয়েছে হেদায়েত, সমগ্র মানব জাতির জন্যেই এ মহান গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে। এতে রয়েছে মানব জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান, যে বা যারা আল্লাহ পাকের কালাম পবিত্র কোরআনের হেদায়েত গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাবে তারা স্বাভাবিক কারণেই আল্লাহ পাকের রহমত থেকে বঞ্চিত হবে।

শেখ আবু মনসুর মাতুরদী (রঃ) বলেছেন, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর এ ঘটনায় রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে সান্ত্বনা এবং সবর অবলম্বনের প্রতি আহবান। কেননা ইউসুফ (আঃ)-এর ভ্রাতারা একই ধর্মে বিশ্বাসী ছিল। আর একই পিতার পুত্র ছিল। এতদসত্ত্বেও তারা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি অকথ্য নির্যাতন করেছে। হযরত ইউসুফ (আঃ) সবর অবলম্বন করেছেন এবং অবশেষে তাদেরকে ক্ষমাও করেছেন। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলআইহে ওয়াসাল্লামের সম্প্রদায়ও তাঁকে চরম কষ্ট দিয়েছে। তারা ছিল কাফের এবং মূর্খ। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকেও মাফ করে দিয়েছেন। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি ঘোষণা করেছেনঃ তোমরা মুক্ত, তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই।[১]

وَلٰكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ

ইমাম রাজী (রঃ) এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর যে ঘটনা আলোচ্য সূরায় বর্ণিত হয়েছে তা তওরাত এবং অন্যান্য আসমানী গ্রন্থে বর্ণিত বিবরণের অনুরূপ। আর এটি কোন মানুষের কল্পনার ফসল নয়, বরং আল্লাহ পাক যে সত্য ঘটনা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জানিয়েছেন তাই তিনি বর্ণনা করেছেন।

وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ

"এতে রয়েছে সব কিছুর বিস্তারিত বিবরণ"।

অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আঃ) ও তাঁর ভ্রাতাদের ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এতে স্থান পেয়েছে। অথবা এর অর্থ হলো পবিত্র কোরআনে রয়েছে মানব জীবনের যাবতীয় সমস্যার

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ২২১-২২

নিখুঁত ও সন্তোষজনক সমাধান। হালাল-হারামের বিস্তারিত বিবরণ এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ পাক কোরআনে করীম সম্পর্কে এরশাদ করেছেনঃ

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ (সূরা নহলঃ ৮৯)

"আর (হে রসূল!) আমি আপনার প্রতি এমন কিতাব নাজিল করেছি, যাতে রয়েছে সুস্পষ্ট বর্ণনা"।

অর্থাৎ মানব জীবনের জন্যে যা কিছু প্রয়োজনীয় তার সব কিছুই স্থান পেয়েছে পবিত্র কোরআনে।

وَهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, দুনিয়াতে হেদায়েত লাভ করতে হলে পবিত্র কোরআনই মাধ্যম। আর আখেরাতে রহমত লাভের মাধ্যমও হলো পবিত্র কোরআন। অবশ্য তা শুধু সে সব লোকদের জন্যে যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান লাভের সৌভাগ্য অর্জন করে এবং ঈমানের দাবী মোতাবেক পরহেজগারী অবলম্বন করতে থাকে।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াত সমূহের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ আম্বিয়ায়ে কেরামের ঘটনাবলী, মুসলমানদের নাজাত এবং কাফেরদের ধ্বংসের বিবরণ সমূহে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে রয়েছে বিশেষ উপদেশ ও নসিহত। আর পবিত্র কোরআনে কোন কল্প-কাহিনীর স্থান নেই; বরং ইতিপূর্বে অবতীর্ণ আসমানী কিতাব সমূহের সত্যতার সুস্পষ্ট দলিল হলো এ মহান গ্রন্থ। এতে হালাল-হারামের বিবরণ রয়েছে বিস্তারিতভাবে। মোমেনদের জন্যে এ গ্রন্থ হেদায়েত এবং রহমত। এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের কল্যাণ লাভের এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সাফল্যের চাবিকাঠি হলো পবিত্র কোরআন।

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ২০শে রবিউস সানী মোতাবেক ২৯শে অক্টোবর, ১৯৯১, রোজ মঙ্গলবার, রাত ১০-০০টায় তফসীরে নূরুল কোরআনের তফসীর সমাপ্ত হলো। হে আল্লাহ! কবুল কর। এ মহান গ্রন্থকে সম্পূর্ণ করার তওফিক দান কর। আমীন।

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু), পারা-১৩, পৃঃ ২৪

بسم الله الرحمن الرحيم

সূরা রা'দ

سُوْرَةُ الرَّعْدِ مَدَنِيَّةٌ وَّهِيَ ثَلٰثٌ وَّاَرْبَعُوْنَ اٰيَةً وَّسِتُّ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الٓمّٓرٰ قف تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ؕ وَالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ وَ
لٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝١ اَللّٰهُ الَّذِيْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ
عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ؕ كُلٌّ
يَّجْرِيْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ
تُوْقِنُوْنَ ۝٢ وَهُوَ الَّذِيْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْهٰرًا ؕ
وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ ؕ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝٣

পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ্ পাকের নামে

তরজমা

(১) আলীফ-লাম-মীম-রা-। এগুলো কিতাবেরই আয়াত। (হে রসূল!) যা আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে আপনার প্রতি নাজিল হয়েছে তা ধ্রুব সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোকই তাতে ঈমান আনেনা।

(২) আল্লাহ্ পাকই উর্দ্ধদেশে স্তম্ভ বিহীন উঁচু আসমান তৈরী করেছেন যা তোমরা দেখছো। এরপর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হলেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণাধীন করলেন এবং প্রত্যেকেই নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী চলে থাকে। তিনিই সকল বিষয়ের ব্যবস্থা করে থাকেন এবং বিস্তারিতভাবে তাঁর নিদর্শন সমূহ বর্ণনা করেন, যাতে করে তোমরা

তোমাদের প্রতিপালকের সঙ্গে মোলাকাত সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করতে পার।

(৩) আর তিনিই পৃথিবীকে বিস্তীর্ণ করেছেন। তার মধ্যে পাহাড় ও নদী সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়, তিনি দিনকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেছেন। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে।

সূরায়ে রা'দ প্রসঙ্গে

এ সূরা মদীনা শরীফে অবতীর্ণ।

এতে ৬ রুকু এবং ৪৩ আয়াত, ৮৫৫ বাক্য এবং ৩,৫০৬ অক্ষর রয়েছে। রয়েছে।

এ সূরা সম্পর্কে তফসীরকারদের একাধিক মত রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে, এ সূরা মক্কায় নাজিল হয়েছে। সাঈদ এবনে জোবায়ের (রঃ), হাসান বসরী (রঃ), আতা (রঃ) এবং জাবের এবনে জায়েদ (রঃ) এ মতই পোষণ করেছেন।

অন্য একটি মত হলো, দু' আয়াত ব্যতীত আর সবই মদীনায়ে তৈয়্যেবায় নাজিল হয়েছে, শুধু দু' আয়াতই মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় নাজিল হয়েছে। আয়াত দু'খানি এই-

وَلَوْ أَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ الاية

وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا الاية

বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং কাতাদা (রঃ) এ মত পোষণ করতেন।

এবনে আবি শায়বা থেকে জাবের এবনে জায়েদের কথা বর্ণিত আছে যে, মৃত ব্যক্তির নিকট তাঁরা সূরায়ে রা'দ পাঠ করতেন। কেননা এর বরকতে মৃত ব্যক্তির রূহ কবজ করা সহজ হয়।[১]

এ সূরায় দ্বীন ইসলামের মৌলিক আকীদা সমূহের বিবরণ রয়েছে। অর্থাৎ তওহীদ, রেসালত, ওহী, কর্মফল এবং হক্ব ও বাতিলের তাৎপর্য এবং পার্থক্য সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা স্থান পেয়েছে। তাই সূরার শুরু থেকেই হক্বের বিবরণ রয়েছে এবং এতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, পবিত্র কোরআন যে মহান আল্লাহ পাকের কালাম একথা ধ্রুব সত্য। হক্ব বা সত্যের বৈশিষ্ট্য হলো তা বিজয়ী এবং স্থায়ী হয়। আর যা বাতিল তা বিদায় নিতে বাধ্য হয়। পবিত্র কোরআনের সত্যতা এ কথারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

বিগত সূরার শুরুতে কোরআনে হাকীমের সত্যতার বিবরণ ছিল এবং সূরার শেষেও এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। ঠিক এভাবে এ সূরাও পবিত্র কোরআনের

১। তফসীরে ফতহুল কাদীর, খন্ড-৩, পৃঃ ৬৩

সত্যতার বিবরণ দিয়ে শুরু করা হয়েছে। এরপর বিস্তারিতভাবে আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের দলিল-প্রমাণ এবং তাঁর বিস্ময়কর কুদরত-হেকমতের আলোচনা রয়েছে। এরপর আখেরাতের কথার উল্লেখ রয়েছে। যারা নবুওয়্যতকে অস্বীকার করে তাদের সন্দেহের জবাব দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদ, পবিত্র কোরআনের সত্যতার বিবরণ, প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যত ও রেসালাতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ এবং আখেরাতের সত্যতার কথা সুস্পষ্টভাবে এ সূরায় আলোচিত হয়েছে।

পূর্ববর্তী সূরার শেষে পবিত্র কোরআনের বৈশিষ্ট্য এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ

مَاكَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ
وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَىْءٍ وَّهُدًى وَّرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ○

(এটি কারো বানানো কথা নয়, বরং এ হলো তার পূর্ববর্তী কথারই অনুকূল, প্রত্যেকটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ এবং হেদায়েত ও রহমত।)

ঠিক এমনিভাবে এ সূরাও পবিত্র কোরআনের সত্যতার বিবরণ দিয়ে শুরু করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

الٓمّٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ؕ وَالَّذِىْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ

অর্থাৎ এগুলো কিতাবেরই আয়াত সমূহ। (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে আপনার প্রতি যা কিছু নাজিল হয়েছে তা ধ্রুব সত্য, সন্দেহাতীত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও অধিকাংশ লোক তা বিশ্বাস করেনা, তাঁর প্রতি ঈমান আনেনা। এমন উজ্জল নিদর্শন সমূহকে তারা অস্বীকার করে।

তফসীরুল কোরআন

الٓمّٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ ؕ

আলীম লাম মিম-রা। এগুলো হরফে মোকাত্তাআত (এ সম্পর্কে তফসীরে নূরুল কোরআনের প্রথম খন্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলোঃ

انا الله اعلم

(আমি আল্লাহ, সর্বাধিক জ্ঞানী।)

আর আতা (রহঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো-

انا الله ملك الرحمن

অর্থাৎ আমি আল্লাহ, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, দয়াবান। এ সূরার আয়াত সমূহ

অথবা সমগ্র পবিত্র কোরআন (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে আপনার প্রতি নাজিল হয়েছে। তা নিঃসন্দেহে ধ্রুব সত্য।

অতএব, মানুষের কর্তব্য হলো এ মহান গ্রন্থের উপর বিশ্বাস করা। কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় হলো, অধিকাংশ লোক এ মহান গ্রন্থের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেনা। যে এ সুস্পষ্ট গ্রন্থকে তথা এ ধ্রুব সত্যকে অমান্য করে সে পথভ্রষ্ট হয়। এটি তার পথভ্রষ্টতারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

তাদের সন্দেহ হলো এ বিষয়ে যে, তাদেরই ন্যায় একজন মানুষের প্রতি কিভাবে তারা আনুগত্য প্রকাশ করবে! আল্লাহ পাক এর জবাবে এরশাদ করেছেনঃ তোমরা লক্ষ্য কর আসমান-জমিনের প্রতি, তথা আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর সৃষ্টির প্রতি, তাঁর কুদরত ও হেকমতের প্রতি, আসমানকে আল্লাহ পাক কোন খুঁটি ব্যতীত বুলন্দ করে রেখেছেন।

এভাবে আল্লাহ পাকের এ ক্ষমতাও রয়েছে যে, তিনি একজন মানুষকে জমিনের পর্যায়ে রেখে অন্য আরেকজনকে এলম এবং হেকমতের আসমানের পর্যায়ে তুলে নিতে পারেন।[১]

اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ

আল্লাহ পাকের একত্ববাদের দলিল

তিনিই আল্লাহ পাক, যিনি খুঁটিবিহীন উঁচু আসমান তৈরী করেছেন যা তোমরা প্রত্যক্ষ করছো। এরপর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন।

পূববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, আর তা হক্ব এবং ধ্রুব সত্য কিন্তু এতদসত্ত্বেও কাফেররা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনা। আর আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের দলিল-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরত-হেকমতের বিবরণ দেয়া হয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে আখেরাতের জীবন যে একান্ত সত্য এবং অবশ্যম্ভাবী একথাও ঘোষণা করা হয়েছে। যেহেতু অধিকাংশ লোক আল্লাহ পাকের একত্ববাদকে অস্বীকার করে, তাই আসমান সৃষ্টির অবস্থা, চন্দ্র-সূর্যের পরিভ্রমণ এবং জমিনের অবস্থা যা সর্বদা পরিলক্ষিত হয় এসব উল্লেখ করা হয়েছে। মূলতঃ জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত এক কথায় সমগ্র সৃষ্টি জগৎই তার স্রষ্টা ও পালনকর্তার অস্তিত্বের ও একত্ববাদের জীবন্ত নিদর্শন ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا

তিনিই সেই আল্লাহ, যিনি খুঁটি বিহীন উঁচু আসমান তৈরী করেছেন। লক্ষ্যনীয় বিষয়

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৪, পৃঃ ৫৫

এই যে, আসমানের ছাদ কোন খুঁটি বা স্তম্ভ ব্যতীতই আকাশে স্থায়ীভাবে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। এটি কি বিস্ময়কর বিষয় নয়? এটি কি আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত ও হেকমতের জীবন্ত নিদর্শন নয়? আল্লাহ পাক যুগ যুগ ধরে আসমানকে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন, এতটুকু নড়াচড়া নেই। ঝুলে পড়ার আশংকাও নেই, কি বিস্ময়কর এ দৃশ্য! আল্লাহ পাকের কুদরত এবং বিস্ময়কর ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ হয়েছে স্তম্ভ বিহীন আসমানকে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখার মাধ্যমে, এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, কোন অদৃশ্য শক্তি আসমানকে এভাবে কোন প্রকার খুঁটি ব্যতীত রেখে দিয়েছেন, আর সে শক্তিই হলেন স্বয়ং বিশ্ব স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন, যিনি তাঁর বিশেষ কুদরতে আসমান সমূহকে উর্দ্ধদেশে কোন খুঁটি ব্যতীত স্থাপন করে রেখেছেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, যেহেতু অধিকাংশ লোকই এসব সত্যের উপর চিন্তা ও গবেষণা করে না, তাই তারা কোরআনের সত্যতা সম্পর্কে অবগত হয় না এবং আল্লাহ পাকের একত্ববাদেও বিশ্বাস করেনা।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেনঃ এ আয়াত নাজিল হয়েছে মক্কার মুশরেকদের সম্পর্কে। তারা বলেছিল মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজে কোরআন বানিয়ে নিয়েছেন, তারই প্রতিবাদে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে পবিত্র কোরআনের সত্যতা ঘোষণা করেছেন এবং আল্লাহ পাকের তওহীদ বা একত্ববাদের দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ

"এরপর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হন"।*

এর প্রকৃত রূপ এবং অবস্থা কি, তা আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কেউ জানেনা তবে আসমান সমূহকে সুউচ্চ স্থানে বুলন্দ করার চেয়েও উচ্চতর হলো আল্লাহ পাকের মহান আরশে অধিষ্ঠিত হওয়া। এর মধ্যে পার্থক্য বুঝাবার জন্যেই ثم ব্যবহার করা হয়েছে। কেননা মহান আরশ হলো আল্লাহ পাকের নূরের তাজাল্লীর কেন্দ্র। সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্যে বিধি-নিষেধ মহান আরশ থেকেই জারী হয় এবং পৃথিবীর যাবতীয় ব্যবস্থাপনা সেখান থেকেই হয়। আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের আকীদা হলো আল্লাহ পাক মহান আরশের উপর তাঁর শান মোতাবেক অধিষ্ঠিত হন। একথার উপর আমার ঈমান আনি এবং তাঁর পবিত্রতার উপর বিশ্বাস করি। আমরা একথার প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করি যে, তিনি স্থান-কাল-দিক থেকে পবিত্র। এসবই তাঁর সৃষ্টি।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেনঃ আরশের উপর অধিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ হলো জমিন থেকে নিয়ে আরশ পর্যন্ত সবই আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন, কর্তৃত্বাধীন। সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির উপর তাঁর কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত।

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

* আরশ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, তফসীরে নূরুল কোরআন, খন্ড-৩, পৃঃ ৩০-৩১

তিনি সূর্য এবং চন্দ্রকে অনুগত করেছেন তথা তাদেরকে কাজে লাগিয়েছেন। উভয়ই আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন, কর্তৃত্বাধীন: উভয়েই বন্দাদের প্রয়োজনের আয়োজনে ব্যবহৃত হচ্ছে। আলো-আধারের আগমন ও নির্গমন, ফল-ফুল সবই চন্দ্র- সূর্যের তাপের ফলশ্রুতি স্বরূপ মানুষের জন্যে তৈরী হয়। একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদের পরিভ্রমণ চলতে থাকবে। এ নিদিষ্ট কাল নির্ধারণ করে দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন। অর্থাৎ যতদিন আল্লাহ পাক পৃথিবীকে এ অবস্থায় রাখা পছন্দ করবেন ততদিন চন্দ্র-সূর্য তাদের নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিভ্রমণ করতে থাকবে।

আর একথাই এরশাদ হয়েছে পরবর্তী বাক্যেঃ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ط

(প্রত্যেকেই নির্ধারিত সময় মোতাবেক চলতে থাকবে।)

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ

অর্থাৎ যার অস্তিত্ব আছে তাকে বিলীন করা তথা জীবিতকে মৃত্যু দেয়া এবং সমগ্র সৃষ্টি জগতের ব্যবস্থাপনা সবই তাঁর কাজ।

يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ

অর্থাৎ তিনি আয়াত সমূহকে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেন অথবা এর অর্থ হলো একের পর এক বর্ণনা করেন।

لَعَلَّكُمْ بِلِقَاۤءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ۝

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের এসব কুদরত হেকমত দেখে হয়তো তোমরা চিন্তা করবে এবং আল্লাহ পাকের সর্বময় ক্ষমতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের প্রতিপালকের দরবারে তোমাদেরকে অবশেষে একদিন যে হাযির হতে হবে আর জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের হিসাব দিতে হবে, একথার উপরও বিশ্বাস করবে। আল্লাহ পাক যে সব বস্তু সৃষ্টি করেছেন তার ব্যবস্থাও তিনি করেন এবং সে বস্তুগুলোর অস্তিত্ব বিলীন করে নতুন করে সৃষ্টি করতে পারেন, আর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের জন্যে পুরস্কৃতও করতে পারেন, শাস্তিও দিতে পারেন।

যে কথাটি এখানে প্রণিধানযোগ্য তা হলো, সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক এসব বিরাট সৃষ্টির স্রষ্টা। আসমান-জমিন, আরশ-কুরসী, চন্দ্র-সূর্য, নক্ষত্রপুঞ্জ এক কথার সব কিছুই তিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনিই নিখিল বিশ্বের অদ্বিতীয় একচ্ছত্র অধিকর্তা, তিনিই সমগ্র বিশ্ব-সৃষ্টির একমাত্র ব্যবস্থাপক। যারা তাঁর অনুগত, কৃতজ্ঞ, ফরমাবরদার তাদেরকে তিনি পুরস্কৃত করবেন। পক্ষন্তরে, যারা তাঁর অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, পাপীষ্ঠ তাদের শাস্তি অবধারিত। একদিন এমন সময় আসবে যেদিন নেককারদেরকে তাদের কর্মের শুভ-পরিণতি প্রদান করা হবে, আর অবাধ্য অকৃতজ্ঞ পাপীষ্ঠদেরকে অবশ্যই তাদের কৃতকর্মের শোচনীয় পরিণাম ভোগ করতে হবে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

لَعَلَّكُمْ بِلِقَاۤءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُوْنَ ۝

"হয়তো তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাক্ষাত লাভে বিশ্বাস স্থাপন করবে"।

অতএব, মহান স্রষ্টা আল্লাহ পাকের আদালতে উপস্থিতি অনিবার্য, আর সে কঠিন দিনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা কল্যাণকামী মানুষ মাত্রেরই বৈশিষ্ট্য।

وَهُوَ الَّذِىْ مَدَّالْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ وَاَنْهٰرًا ط

পূর্ববর্তী আয়াতে উর্দ্ধাকাশের কথা বলা হয়েছে, আর এ আয়াতে বিশাল-বিস্তৃত জমীনের কথা বলা হয়েছে যে তোমরা পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্য কর কিভাবে আল্লাহ পাক বিশাল-বিস্তৃত পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; জমিনকে কিভাবে বিছিয়ে দিয়েছেন এবং তার উপর পাহাড়-পর্বতের ভার চাপিয়ে দিয়েছেন যেন সে নড়াচড়া করতে না পারে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ

"এবং আল্লাহ পাক জমিনের উপর পাহাড়কে স্থাপন করেছেন ফলে জমিন স্থবির হয়ে গেছে"।

তিরমিজী শরীফে একখানি হাদীস সংকলিত হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

لما خلق الله الارض جعلت يمتد فخلق الله الجبال وقال بها عليها فعجبت الملائكة وقالت يارب هل من خلقك شىء اشد من الجبال قال نعم الحديد -الحديث

"আল্লাহ পাক যখন জমীন সৃষ্টি করলেন, তা নড়াচড়া করতে লাগল, তখন তিনি পাহাড় সৃষ্টি করে তার উপর চেপে বসে যাওয়ার আদেশ দিলেন। ফলে জমীন স্থবির হয়ে গেল। এ অবস্থা দেখে ফেরেশতাগণ আশ্চর্যন্বিত হয়ে আরজ করলো, হে পরওয়ারদেগার! তোমার সৃষ্টিতে পাহাড়ের চেয়েও শক্ত এবং মজবুত কোন কিছু আছে কি? আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ হ্যাঁ, আছে তা হলো লৌহ (কেননা লৌহের দ্বারা পাহাড় কেটে ফেলা যায়)। ফেরেশতাগণ আরজ করলো, হে পরওয়ারদেগার! তোমার সৃষ্টিতে লৌহের চেয়ে শক্তিশালী কোন কিছু আছে? আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ হ্যাঁ, আছে তা হলো অগ্নি। এরপর ফেরেশতাগণ জিজ্ঞাসা করলো, হে পরওয়ারদেগার! তোমার সৃষ্টিতে অগ্নির চেয়েও শক্তিশালী কিছু আছে? আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ হ্যাঁ, আছে তা হলো পানি। এর পর ফেরেশতাগণ জিজ্ঞাসা করলো, হে পরওয়ারদেগার! তোমার সৃষ্টিতে পানির চেয়েও শক্তিশালী কিছু আছে? তিনি এরশাদ করলেন, হ্যা আছে তা হলো বাতাস। এরপর ফেরেশতাগণ পুনরায় আরজ করলো, হে পরওয়ারদেগার! তোমার সৃষ্টিতে বাতাসের চেয়েও শক্তিশালী কিছু আছে? আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, আছে আর তা হলোঃ

رجل من بنى ادم

একজন মানুষ (যে আল্লাহ পাকের এত নৈকট্য-ধন্য হয় এবং আল্লাহর প্রেমে এত মুগ্ধ থাকে)। যে আল্লাহর রাহে ডান হাতে দান করে কিন্তু তার বাম হাত জানেনা কি দান করা হয়েছে"।

আলোচ্য বাক্যটি সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম জমীনের উপর আবু কোবায়েস নামক পাহাড়টি প্রতিষ্ঠিত করেন।

وَأَنْهَرًا

অর্থাৎ আল্লাহ পাক জমীনে পাহাড়ের পাশাপাশি নদ-নদী এবং সাগরও তৈরী করেন।

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ جَعَلَ فِيْهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ

আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের অনন্ত অসীম কুদরত হেকমতের মধ্যে যেমন বিশাল-বিস্তৃত জমীন রয়েছে, তেমনি রয়েছে পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী-সমুদ্র, এভাবে আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদের রিয্ক হিসাবে রকমারী ফল-ফলারী সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। কোনটি লাল বর্ণের, কোনটি হলুদ, কোনটি মিষ্ট, কোনটি টক, কোনটি শুস্ক আর কোনটি ভেজা প্রভৃতি। এমনিভাবে পানির মধ্যে কোনটি নোনা, পান করার অযোগ্য, আবার কোনটি সুস্বাদু। আধুনিক গবেষণায় দেখা যায় কোনটি নর এবং কোনটি নারী।

يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ ط

আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম ক্ষমতার আর একটি নিদর্শন হলো, তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করে দেন অর্থাৎ দিনের আলো রাতের অন্ধকারে আচ্ছাদিত হয়ে যায়। কোন সময় দিন হয় কোন সময় রাত হয়। এসব কিছুই সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের নিয়ন্ত্রণাধীন। এত পরিবর্তনের মধ্যে কোন কিছুই স্ব-ইচ্ছায় হয়না; বরং সর্বত্রই আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হয় কার্যকর।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক জমীনকে পানির উপর বিছিয়ে দিয়েছেন। আধুনিক কালে বৈজ্ঞানিক উপায়ে জমীনের অভ্যন্তর থেকে পানি উত্তোলন করার যে ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা হয়েছে তা একথারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَيٍّ ط

অর্থাৎ আমি পানি থেকে সব কিছুকে জীবন দিয়েছি।[১]

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৪, পৃঃ ৮২
জাদুল মাসীর, খন্ড-৪, পৃঃ ৩০২

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ○

নিশ্চয় সব কিছুর মধ্যে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের এবং তাঁর কুদরত-হেকমতের বহু নিদর্শন রয়েছে। সৃষ্টি মাত্রই একথার দাবীদার যে তার একজন স্রষ্টা আছেন, যিনি সব কিছুর ব্যবস্থা করেন। বিভিন্ন প্রকারের ফল-ফুল যার বর্ণ, স্বাদ ও আকার বিভিন্ন, এমনিভাবে রাত ও দিনের ধারাবাহিকভাবে আসা এবং যাওয়া-এসবই আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরতের জীবন্ত নিদর্শন। যারা চিন্তা করে তারা এ সত্য উপলব্ধি করে এবং এর পাশাপাশি এ সত্যও উপলব্ধি করে যে এ সমস্ত কিছু যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই মানুষের এবাদতের একমাত্র যোগ্য, আর কেউ নয়। যারা মানুষের কোন উপকার করতে পারেনা এবং কোন অপকারও করতে পারেনা তাদের উপাসনা করা কেবল নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছু নয়।[১]

আল্লাম এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যারা আল্লাহ পাকের এ বিস্ময়কর কুদরত-হেকমত দেখে এবং চিন্তা করে তারা হেদায়েত লাভ করতে পারে। তারা এ সত্য উপলব্ধি করতে পারে যে, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ পাকই। তিনিই বিশ্ব সৃষ্টির একচ্ছত্র অধিকর্তা, স্রষ্টা ও পালনকর্তা, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ বা উপাস্য নেই।[২]

وَفِى ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَٰوِرَٰتٌ
وَجَنَّٰتٌ مِّنْ أَعْنَٰبٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ
بِمَآءٍ وَٰحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِى ٱلْأُكُلِ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ
لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝٤ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَءِذَا كُنَّا تُرَٰبًا
أَءِنَّا لَفِى خَلْقٍ جَدِيدٍ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِرَبِّهِمْ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ ٱلْأَغْلَٰلُ
فِىٓ أَعْنَاقِهِمْ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ۝٥

তরজমা

(৪) আর পৃথিবীতে রয়েছে পাশাপাশি ভিন্ন প্রকারের ভূমি খন্ড, আরও আছে আঙ্গুরের বাগান, শস্যক্ষেত্র এবং খেজুর বৃক্ষ পরস্পর শেকড় যুক্ত অথবা বিযুক্ত ভাবে অবস্থিত,

১। তফসীরে তবরী, খন্ড-১৩, পৃঃ ৬৪
২। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু), পারা-১৩, পৃঃ ২৭

একই পানিতে সিঞ্চিত কিন্তু ফল হিসাবে আমি তাদের কোনটাকে কোনাটর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে থাকি। যারা চিন্তা-ভাবনা করে তথা যারা বুদ্ধিমান তাদের জন্যে এসব বস্তুর মধ্যে রয়েছে বহু নিদর্শন।

(৫) (হে রসূল!) যদি আপনি বিস্মিত হন তবে বিস্ময়ের বিষয় হলো তাদের কথা, (যারা বলে) আমরা যখন মাটিতে পরিণত হব তখনও কি পুনরায় আমরা নতুন জীবন লাভ করবো, তারাই সে সব লোক যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছে, তাদের গলায় থাকবে শেকল এবং তারাই দোজখবাসী, সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

তফসীরুল কোরআন

আল্লাহ পাকের একত্ববাদের অসংখ্য দলিল-প্রমাণ বিশাল-বিস্তৃত জমিনেও বিদ্যমান। পৃথিবীতে পাশাপাশি ভিন্ন ভিন্ন রকমের ভূমি খন্ড রয়েছে। কোথাও অটল অবিচল পাহাড়-পর্বত দন্ডায়মান, কোথাও সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ, কোথাও নদ-নদী প্রবাহিত। কোথাও নোনা পানি, আর কোথাও সুস্বাদু। একই জমি একই পানি অথচ এর দ্বারা যে ফল উৎপন্ন হয় তার বৈচিত্র্য বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। একটির সাথে আরেকটির পার্থক্য শুধু আকৃতি বা আকারেই নয়, বরং স্বাদে-গন্ধে-বর্ণে। কোথাও আঙ্গুরের বাগান, কোথাও খেজুর বৃক্ষ, কোথাও একই মূল থেকে অনেক শাখা-প্রশাখা বের হয়ে এসেছে। কোনটির ফল মিষ্ট আর কোনটি টক।

বর্ণে এবং স্বাদে-গন্ধে আল্লাহ পাক একটির উপর আরেকটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এসবের মধ্যে একথারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, এসব কিছু এক, অদ্বিতীয়, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, সর্ব শক্তিমান, মহান আল্লাহ পাকেরই বিস্ময়কর কুদরত হেকমতের এবং সৃষ্টি-নৈপূণ্যের জীবন্ত নিদর্শন। অতএব, তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা এবং শুধু তাঁরই বন্দেগী করা কল্যাণকামী মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ فِى ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ○

"নিশ্চয় এসব কিছুর মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের বহু দলিল-প্রমাণ রয়েছে"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিখ্যাত তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এর দৃষ্টান্ত হলো মানব জাতি, একই আদি পিতা আদম থেকে সমস্ত মানুষ সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু তন্মধ্যে কেউ ভাল, কেউ মন্দ। মানুষের মধ্যে দৈহিক, মানসিক, নৈতিক, চারিত্রিক, বাহ্যিক ও আন্তরিক যে পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে তা আপনা-আপনি হয়নি; বরং এ সমস্ত কিছুই আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ইচ্ছা ও মর্জির বহিঃপ্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

হাসান বসরী (রঃ) এর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন মানুষের অন্তরের সঙ্গে। জমিনের সামান্য

ধাতু বর্তমান ছিল, আল্লাহ পাক তাঁর কুদরতী হস্তে তাকে সম্প্রসারিত করেছেন এবং তাকে বিস্তৃত করেছেন এবং ভিন্ন ভিন্ন খন্ডে বিভক্ত করেছেন। এরপর আসমান থেকে তার উপর পানি বর্ষণ করেছেন যার কারণে জমিনের এক খন্ডে ফল-ফুল এবং রকমারী ফসল উৎপন্ন হয় আর জমিনের অন্য খন্ডকে অনাবাদী জমিনে এবং জঙ্গলে পরিণত করেছেন। অথচ একই জমি একই পানি। কিন্তু পার্থক্য রয়েছে পরিণতিতে। ঠিক এমনিভাবে সমগ্র মানব জাতিকে আল্লাহ পাক আদম থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর সকলে জন্যে আসমান থেকে একই হেদায়েতনামা প্রেরণ করেছেন। ফলে কোন কোন অন্তর বিনম্র হয়েছে এবং হেদায়েত কবুল করেছে, আর কোন কোন অন্তর গাফলতের আবর্তে নিপতিত হয়েছে এবং কঠিন হয়েছে। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, আল্লাহর শপথ! যে ব্যক্তিই পবিত্র কোরআন নিয়ে বসেছে সে বাড়তি কিছু পেয়েই উঠেছে। আল্লাহ পাক এজন্যে এরশাদ করেছেনঃ

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ○

"আর আমি কোরআন থেকে যা নাজিল করি তা হলো রোগমুক্তি এবং মোমেনদের জন্যে রহমত। আর এই কোরআনই জালেমদের জন্যে ক্ষতি ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি করেনা"।[১]

এ পর্যায়ে ইমাম রাজী (রঃ) বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। একজন কবি কি সুন্দর বলেছেনঃ

والارض فيها عبرة للمعتبر+ تخبر عن صنع مليك مقتدر

"বিশাল-বিস্তৃত জমিনে অনেক কিছু শিক্ষণীয় রয়েছে"।

"এ জমিন নিজেই সংবাদ দিচ্ছে যে, তাকে কোন শক্তিমান মালিক সৃষ্টি করেছেন"।

تسقى بماء واحد اشجارها + وبقعته واحدة قرارها

"একই পানি দ্বারা সকল বৃক্ষ সিঞ্চিত, আর জমিনও একখন্ডই",

"কিন্তু যে ফল এবং ফসল উৎপন্ন হলো তা বিভিন্ন, তার স্বাদে এবং গন্ধে রয়েছে পার্থক্য"।

والشمس والهواء ليس يختلف + واكلها مختلف لا ياتلف

"আর যে আলো-বাতাস এই বৃক্ষগুলোর উপর পড়ছে তাতে কোন পার্থক্য নেই",

"কিন্তু উৎপন্ন ফলে রয়েছে অনেক পার্থক্য"।

فما الذين اوجب التفاضلا + الا لحكيم لم يرده باطلا

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-১৩, পৃঃ ১০৩-৪
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ২২৬-২৭

"যখন তাপ, আলো, বাতাস, পানি, মাটি একই, তবে এ পার্থক্য কিভাবে হলো"?

"এর দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী স্রষ্টার ইচ্ছাতেই এ পার্থক্য হয়েছে যিনি হেকমত ও তাৎপর্য ব্যতীত কোন কিছুর ইচ্ছা করেন না"।

وَاِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ءَاِذَا كُنَّا تُرٰبًا ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে তওহীদ বা আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের দলিল-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াত সমূহে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের ব্যাপারে যারা সন্দিহান হয়েছিল তাদের সন্দেহ নিরসন করা হয়েছে।

তারা এ সন্দেহ করতো যে, মৃত্যুর পর মাটির সঙ্গে যখন মানুষ মিশে যাবে তখন তাদেরকে পুনরায় কিভাবে একত্রিত করা হবে? অতএব, হাশরের কথা তথা পুনর্জীবন লাভ করে আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযির হওয়ার কথা তারা অসম্ভব মনে করতো। আর একথায় তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতকে অস্বীকার করতো। তারা বলতো ইনি কেমন নবী, যিনি একটি অসম্ভব বিষয়ের খবর দিচ্ছেন এবং এ খবরের উপর বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানাচ্ছেন।

নবুওয়্যতের প্রতি অবিশ্বাসীদের জবাব

وَاِنْ تَعْجَبْ

"(হে রসূল!) আপনি যদি বিস্ময়কর কিছু মনে করতে চান তবে তাদের একথাই বিস্ময়কর, যারা বলেছে, "আমরা যখন মাটি হয়ে যাব তখন কি আমরা আবার নতুনভাবে তৈরী হবো"?

কাফেররা মানুষের পুনরুত্থানকে বিস্ময়কর মনে করতো। মূলতঃ মানুষের পুনরুত্থান সম্পর্কে তাদের এ উক্তিই অত্যন্ত বিস্ময়কর। তারা কেয়ামতের ময়দানে উপস্থিতিকে অস্বীকার করতো অথচ একথা সর্বজনবিদিত যে, একটি কাজ সর্ব প্রথম যার পক্ষে করা সম্ভব, তার পক্ষে দ্বিতীয়বার ঐ কাজটি করা আরো সহজ। মানুষের কোন অস্তিত্বই যেখানে ছিল না আল্লাহ্ পাক সেখানে তাকে অস্তিত্ব দান করেছেন। অতএব, দ্বিতীয়বার মানুষকে জীবন দান করা এবং কেয়ামতের ময়দানে উপস্থিত করা তাঁর পক্ষে আদৌ কঠিন নয়।

অথবা এর অর্থ হলো হে রসূল! আপনার অনেক বিস্ময়কর মোজেযা দেখা সত্ত্বেও মুশরেকরা যখন আপনার নবুওয়্যত ও রেসালতকে অস্বীকার করে এবং আপনার আহবানে সাড়া দিতে রাজী হয়না এমনকি, তাদের নিকট সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ উপস্থাপনের পরও তারা এমন বস্তুর পূজা-অর্চনা করে, যার মধ্যে তাদের উপকার বা অপকারের কোন শক্তিই নেই। তাদের এ আচরণ যদি আপনার জন্যে বিস্ময়ের কারণ হয় তবে তাদের এ কথাও বিস্ময়কর যে, "আমরা যখন মাটির সঙ্গে মিশে যাব তখন কি আমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি

করা হবে?" অথচ প্রকৃত অবস্থা এই, যা কিছু পৃথিবীতে রয়েছে এর কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিলনা, আল্লাহ পাকই সব কিছুর অস্তিত্ব দান করেছেন। অতএব, দ্বিতীয়বার তাদেরকে সৃষ্টি করা তাঁর পক্ষে অতি সহজ। কেননা, আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ۖ

এরাই সে সব লোক যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করেছে অর্থাৎ যারা কেয়ামতকে অস্বীকার করে তারা মূলতঃ স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাককেই অস্বীকার করে, তাঁর অনন্ত অসীম ক্ষমতাকে অস্বীকার করে।

وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ۖ

তাই তারা পায়ে বেড়ী, হাতে হাত কড়া এবং গলায় শেকল দ্বারা বাধা অবস্থায় দোজখে নিক্ষিপ্ত হবে। কেননা এমন অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, পাপীষ্ঠদের উপযুক্ত স্থানই হলো দোজখ।

وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ

অর্থাৎ তারাই হবে দোজখবাসী।

هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

আর তারা তাতে চিরদিন থাকবে। কখনও দোজখের শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ করবে না। কাফেররা দোজখের চির শাস্তি ভোগ করবে, এটিই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের আকীদা।[১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন, হে রসূল! যারা আপনাকে মিথ্যাজ্ঞান করে তাদের এ আচরণে আপনি আশ্চর্যন্বিত হবেন না। কেননা তারা আল্লাহ পাকের অগণিত বিস্ময়কর নিদর্শন সমূহ দেখা সত্ত্বেও তাঁকে অবিশ্বাস করে, কেয়ামতকে অস্বীকার করে। অথচ একথা সর্বজনবিদিত যে মানুষকে সৃষ্টি করার চেয়ে বিশাল-বিস্তৃত আসমান-জমিন সৃষ্টি করা অনেক বড় ব্যাপার। আর একবার যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর পক্ষে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা অতি সহজ ব্যাপার, যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"তারা কি দেখে না? যে, নিশ্চয় আল্লাহ পাক আসমান-জমিন সৃষ্টি করেছেন আর তিনি

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ২২৭-২৮
তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-১৩, পৃঃ ১০৫
তফসীরে তবরী, খন্ড-১৩, পৃঃ ৬৯

ক্লান্তও হননি, তিনি কি মৃতদেরকে জীবিত করার শক্তি রাখেন না? অবশ্যই রাখেন। নিশ্চয় তিনি সর্বশক্তিমান। মূলতঃ তারা হলো কাফের। কেয়ামতের দিন তাদের গলদেশে থাকবে শেকল, তারা হবে দোজখবাসী, চিরকাল তারা দোজখেই থাকবে"।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বাক্যটির অর্থ হলো হে রসূল! কাফেররা যে আপনাকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে তা যদি আপনার নিকট আশ্চর্যজনক ব্যাপার হয় তবে তার চেয়ে বেশী আশ্চর্যজনক বিষয় হলো, তারা ইতিপূর্বে আপনাকে সত্যবাদী, বিশ্বস্ত বা আল-আমীন বলেছে, অথচ এখন তারা আপনাকে অবিশ্বাস করে।

দ্বিতীয়তঃ এর অর্থ হলো, (হে রসূল!) যদি কাফেরদের এ আচরণে আপনি বিস্মিত হন যে তারা এমন কিছুর এবাদত করে যারা তাদের উপকার বা অপকার করতে পারেনা, তবে তার চেয়ে বেশী আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো, তারা তওহীদের যাবতীয় দলিল-প্রমাণ দেখতে পেয়েও আল্লাহর একত্ববাদের অবিশ্বাস করে।

তৃতীয়ত, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো হে আল্লাহর রসূল! বিস্ময়কর বিষয়েই আপনি বিস্মিত হয়েছেন। কেননা কাফেররা যখন একথা মেনে নিয়েছে যে, আল্লাহ পাকই আসমান-জমিন সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আসমান-জমিনের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকেন, আর তিনিই আসমান সমূহকে বিনা খুঁটিতে বুলন্দ করেছেন। তিনিই পৃথিবীতে অনেক বিস্ময়কর বস্তু সৃষ্টি করেছেন। এতদসত্ত্বেও তারা একথা বিশ্বাস করেনা যে, আল্লাহ পাক মানুষকে মৃত্যুর পর পুনঃজীবন দান করবেন এবং মানুষকে তাঁর দরবারে হাযির করবেন, এটিই হলো সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক তিনটি ঘোষণা দিয়েছেনঃ

(১) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا

তারাই কাফের, এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হলো যে, যারা কেয়ামতকে অস্বীকার করে তারাই কাফের।

(২) وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ

তারাই সে সব লোক যাদের নাফরমানীর কারণে তাদের গলদেশে থাকবে (কেয়ামতের দিন) শেকল।

(৩) وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ○

অর্থাৎ তারাই হবে দোজখবাসী এবং তারা চিরদিন দোজখেই থাকবে।[২]

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু), পারা-১৩, পৃঃ ২৮
২। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৯, পৃঃ ৮-৯

۝٥ وَ
يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ ۗ
وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ
الْعِقَابِ ۝٦ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۗ
إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ ۖ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝٧ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ
وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۖ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ ۝٨ عَالِمُ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ۝٩ سَوَاءٌ مِّنكُم مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ
وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝١٠

তরজমা

(৬) আর (হে রসূল!) কল্যাণের পূর্বে তারা আপনাকে শাস্তি তরান্বিত করতে বলে, যদিও তাদের পূর্বে এর বহু দৃষ্টান্ত গত হয়েছে। মানুষের দৌরাত্ম সত্ত্বেও আপনার প্রতিপালক তাদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষমাশীল আর নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকের শাস্তিও অত্যন্ত কঠিন।

(৭) আর কাফেররা বলে, তার প্রতিপালকের তরফ থেকে তার নিকট কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হয়না? (হে রসূল!) আপনিতো শুধু সতর্ককারী এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যেই রয়েছে পথ প্রদর্শক।

(৮) প্রত্যেক নারী গর্ভে যা ধারণ করে আল্লাহ্ পাক তা জানেন। পেট যা গুটিয়ে রাখে এবং যা বাড়ে আল্লাহ পাকের নিকট সব কিছুরই পরিমাপ রয়েছে।

(৯) তিনি গোপন প্রকাশ্য সবই জানেন, তিনি মহান, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।

(১০) তোমাদের মধ্যে যে কথা গোপন রাখে অথবা যে তা প্রকাশ করে, রাতের অন্ধকারে যে লুকিয়ে থাকে এবং দিনের বেলায় যে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ায় তাঁর নিকট সবই সমান।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে মক্কার কাফেরদের একটি সন্দেহ নিরসন করা হয়েছে। এ আয়াতে

তাদের দ্বিতীয় সন্দেহের জবাব দেয়া হয়েছে। মূলতঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসীকে আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানিয়েছেন। কিন্তু সত্যের আহবান গ্রহণ করাতো দূরের কথা, তারা তার পরিবর্তে চরম দৌরাত্ম এবং নাফরমানীর ধৃষ্টতা দেখায়। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। কখনও তিনি তাদেরকে কেয়ামতের দিনের আজাবের ব্যাপারে ভয় প্রদর্শন করেন। আর কখনও দুনিয়ার আজাব তথা আসমানী জমীনি বালা-মসিবতের ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করেন। যখনই তিনি কেয়ামতের দিনের আজাবের কথা বলে সাবধান করেছেন, তখনই তারা কেয়ামতকে অস্বীকার করেছে। আর পুনরুত্থানের ব্যাপারকে তারা কোনদিন বিশ্বাস করেনি। এ বিষয়ে পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখনই তাদেরকে দুনিয়ার আজাবের কথা বলতেন তখন তারা বলতো, "নিয়ে আস তোমার আজাব, আমরা দেখতে চাই আমাদের কি ক্ষতি করতে পারে"। মূলতঃ এসব হলো ভিত্তিহীন কথা-বার্তা। তাদের এ বাড়াবাড়ি এবং ধৃষ্টতার জবাবেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। তারা বলেছিলঃ

فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً

"আমাদের উপর পাথর বর্ষণ কর"।

কখনও তারা বলেছে, "যে পর্যন্ত আমাদের জন্যে কোন ঝর্ণা প্রবাহিত না কর সে পর্যন্ত আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনবোনা"। অথচ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানিয়েছেন এবং বিনিময়ে আখেরাতে সওয়াব এবং দুনিয়াতে বিজয়, সাফল্য এবং সার্বিক কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধান করেছেন। কিন্তু তারা কল্যাণের বদলে অকল্যাণ এবং সওয়াবের বদলে আজাব তরান্বিত করার দাবী জানিয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ

অর্থাৎ তারা কল্যাণের পূর্বে অকল্যাণ তথা আজাব তরান্বিত করতে চায়। আল্লাহ পাক তার জবাবে এরশাদ করেছেনঃ

وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلٰتُ

আল্লাহর আজাবের কথা নতুন কিছু নয়, ইতিপূর্বে এর বহু দৃষ্টান্ত গত হয়েছে। কত আজাব এসেছে এবং কত অবাধ্য-অকৃতজ্ঞ জাতি চিরতরে ধ্বংস হয়েছে, পৃথিবীর ইতিহাস তার সাক্ষী। যারা এ পৃথিবীতে আল্লাহর অবাধ্য-অকৃতজ্ঞ হয়েছে, যারা তাদের নাফরমানী দিয়ে এ সুন্দর বসুন্ধরাকে অসুন্দর করে তুলেছে, যুগে যুগে তাদের প্রতিই নাজিল হয়েছে আজাব এবং তাদের মূলোৎপাটন করা হয়েছে। ঠিক এমনিভাবে তোমাদের প্রতিও আজাব আসতে পারে এবং যে কোন সময় তোমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। অতএব,

তোমাদের কর্তব্য হলো পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ইতিহাস দেখে শিক্ষা গ্রহণ করা। তোমরা এ ভুল ধারণা করোনা যে স্বচক্ষে আজাব দেখে ঈমান আনবে। মনে রেখ, আজাব দেখার পর ঈমান আনয়ন করলে তা গ্রহণযোগ্য হবেনা। ঈমান তখনই গ্রহণযোগ্য হয় যখন মানুষ স্ব-ইচ্ছায়, স্বজ্ঞানে শান্ত অবস্থায় ঈমান আনে। মূলতঃ এ কারণেই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ

আল্লাহ পাক মানুষকে তাদের জুলুম-অত্যাচার ও দৌরাত্ম সত্ত্বেও ক্ষমা করে থাকেন। কেননা, তাঁর প্রতিটি কাজই হেকমতপূর্ণ, বিবেচনা-প্রসূত এবং তাৎপর্যবহ। মানুষের চরম অন্যায়-অনাচার সত্ত্বেও আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমা করেন তথা তাদেরকে সুদীর্ঘ অবকাশ দান করেন। কিন্তু যখন তারা সীমালংঘন করে চরমভাবে তখন তাদেরকে পাকড়াও করেন। আর আল্লাহর ধরা বড় শক্ত ধরা।[১]

এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ ○

(নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকের আজাব অত্যন্ত কঠোর।)

যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

نَبِّئْ عِبَادِىْ اَنِّىْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○ وَاَنَّ عَذَابِىْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ ○

"(হে রসূল!) আপনি আমার বন্দাদেরকে জানিয়ে দিন যে আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান। আর একথাও জানিয়ে দিন যে, আমার আজাব অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ মক্কার মুশরেকরা শান্তি ও কল্যাণের স্থলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আল্লাহর আজাবকে তরান্বিত করার দাবী জানায় এবং বিদ্রুপ করে বলে, হে আল্লাহ! যদি তোমার তরফ থেকে এই ব্যক্তির আহবান সত্য হয় তবে আমাদের উপর আসমান থেকে প্রস্তর বর্ষণ কর। অথবা আমাদের প্রতি কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রেরণ কর। তার জবাবেই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন।[২]

মূলতঃ যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতকে অস্বীকার করেছিল, তারা আল্লাহর আজাবকে অসম্ভব মনে করেছিল। তারা মনে করেছিল এটি কাল্পনিক, বাস্তবিক নয়। এজন্যেই যখন আল্লাহ পাক তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছিলেন তখন তারা আল্লাহর আজাবকে তরান্বিত করার দাবী করেছিল। অথচ ইতিহাস সাক্ষী! ইতিপূর্বে কত অবাধ্য-অকৃতজ্ঞ জাতি আল্লাহ পাকের আজাবে ধ্বংস হয়েছে। আর একথা

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৯, পৃঃ ১০-১১
২। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ২২৮

সর্বজন-বিদিত যে আল্লাহর আজাব অত্যন্ত কঠিন, কঠোর। ইতিপূর্বে কত জাতি আল্লাহর আজাবে নিশ্চিহ্ন হয়েছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। অতএব, মক্কার পৌত্তলিকদের পূর্বকালের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত কেননা,

إِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ○

"নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকের শাস্তি অত্যন্ত কঠোর"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতের এ অংশটি-

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ

(নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক মানুষের জুলুম-অত্যাচার সত্ত্বেও অতি ক্ষমাশীল।) পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহের মধ্যে অত্যন্ত আশাপূর্ণ এবং সান্ত্বনাদায়ক। কেননা এর মধ্যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ মানুষরে বাড়াবাড়ি ও দৌরাত্ম সত্ত্বেও আল্লাহ পাক তাদেরকে ক্ষমা করেন, তাদেরকে অবকাশ দান করেন, এটি তাঁর দয়া এবং মেহেরবানী ব্যতীত আর কিছুই নয়।

কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত এবং وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ উভয় আয়াতের সম্পর্কে মোমেনদের সঙ্গে। তবে উভয় আয়াতের বক্তব্যের জন্যে পূর্বশর্ত হলো আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এবং মর্জি। যার অর্থ হলো, আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে মাফ করবেন, যাকে ইচ্ছা তাকে শাস্তি দেবেন।

এবনে আবি হাতেম, বায়হাকী এবং ওয়াহেদী হযরত সাঈদ এবনুল মোসাইয়্যেব (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। এই হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যদি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ক্ষমা না করা হতো তবে এখানে কেউ জীবিত থাকত না। আর যদি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আজাবের ভয় প্রদর্শন না করা হতো তবে সকলেই আল্লাহ পাকের রহমতের উপর ভরসা করে বসে যেত।[১]

এজন্যে তফসীরকারগণ লিখেছেন, আল্লাহ পাকের আজাব অত্যন্ত কঠিন, তবে আল্লাহ পাকের রহমত গজবের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে আছে। কিন্তু যখন পাপীষ্ঠরা সীমালংঘন করে আর তাদেরকে যে অবকাশ দেয়া হয়, সে সুযোগেও সঠিক পথ অবলম্বন করেনা তখন আল্লাহ পাক কঠোর হস্তে পাকড়াও করেন।

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ط

এ আয়াতে আল্লাহ পাক কাফেরদের তৃতীয় সন্দেহের জবাব দিয়েছেন। কাফেররা বলে, "তার প্রতিপালকের তরফ থেকে আমাদের ফরমায়েশ মোতাবেক নিদর্শন কেন

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ২২৯

আসেনা"? একথার জবাবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি শুধু আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাদেরকে ভয় প্রদর্শনকারী, তাদের ফরমায়েশ মোতাবেক নির্দশন অবতীর্ণ করা না করা আপনার কাজ নয়, আপনার কাজ হলো তাদেরকে সাবধান করা, আল্লাহ পাকের আজাব সম্পর্কে সর্তক করা। তারা আপনার মাধ্যমে অনেক নিদর্শনই দেখেছে যেমন, চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়ার বিস্ময়কর ঘটনাও তারা দেখেছে, কিন্তু তবু তারা ঈমান আনেনি। আপনার নবুওয়্যতের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ তারা আরো অনেক নিদর্শন দেখেছে কিন্তু তারা সরল-সঠিক পথ গ্রহণ করেনি। কাফেরদের সন্দেহের কারণ ছিল এই যে, তারা কোরআনে করীমকে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোজেযা মনে করতো না; বরং তাদের ধারণা ছিল পবিত্র কোরআন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রচিত গ্রন্থ (নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক)। তাদের এ ধারণাও ছিল যে মোজেযা হলো এমন বিষয় যা হযরত মুসা (আঃ) এবং হযরত ঈসা (আঃ)-কে দান করা হয়েছিল। এজন্যে কাফেররা একথাও বলতো যে, হযরত মুসা (আঃ) এবং ঈসা (আঃ)-কে যে মোজেযা দেয়া হয়েছে এমন মোজেযা আপনাকে কেন দেয়া হয়না? অথচ কাফেরদের একথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অর্থহীন। কেননা, প্রত্যেক যুগের নবীকে নবুওয়্যতের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ এমন মোজেযা প্রদান করা হয়েছে যা সে যুগের এবং সে সময়ের উপযোগী। হযরত মুসা (আঃ)-এর যুগে যাদুবিদ্যার বিরাট প্রভাব ছিল। এজন্যে তাঁকে যুগোপযোগী মোজেযা প্রদান করা হয়েছে। আর হযরত ঈসা (আঃ)-এর যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ সাধন হয়েছিল। তাই তাঁকে মৃতকে জীবিত করার, কুষ্ঠ ও শ্বেত রোগীকে সুস্থ করার মোজেযা দান করা হয়েছে যা সে যুগের সকল চিকিৎসকের জন্যে ছিল অসম্ভব।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে ভাষা ও সাহিত্যের বিরাট সমৃদ্ধি ঘটেছিল। এজন্যে তাঁকে আল্লাহ পাক কোরআনে করীম দান করেছেন যা ভাষার অলংকারের দিক থেকে সর্বাধিক উচ্চাঙ্গের, যার মোকাবেলা করা কোন সাহিত্যিকের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ভাষার অলংকার, উচ্চাঙ্গের ভাব এবং বিস্ময়কর তত্ত্ব ও তথ্যের দিক থেকে পবিত্র কোরআন হলো অনন্য-সাধারণ। পবিত্র কোরআন চ্যালেঞ্জ করেছে তারা যেন মাত্র তিনটি আয়াতের মোকাবেলা করে। এ চ্যালেঞ্জ বিগত দেড় হাজার বছর যাবত বিশ্ববাসীর সম্মুখে বিদ্যমান, আজ পর্যন্ত কেউ এর মোকাবেলা করেনি, ভবিষ্যতেও করতে সক্ষম হবেনা। এতদ্ব্যতীত চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়া, শবে মে'রাজে স্বশরীরে মহাশুণ্য পরিভ্রমণ করা, একটি খেজুর বৃক্ষের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরহে ক্রন্দণ করা এবং হোদায়বিয়া নামক স্থানে তাঁর আঙ্গুল মোবারক থেকে পানি প্রবাহিত হওয়া- প্রভৃতি মোজেযা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে যথেষ্ট। তোমাদের ফরমায়েশ মোতাবেক মোজেযা প্রকাশ করা জরুরী নয়। কেননা, এরপরও যদি কোন মোজেযা প্রকাশ করা হয় তবে তাকে হয়তো তারা যাদু বলে অস্বীকার

করবে, যেমন ইতিপূর্বে তারা করেছে।[১]

وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝

"আর প্রত্যেক জাতির জন্যেই পথপ্রদর্শক রয়েছে"।

যেমন আপনাকে মানুষের জন্যে পথ-প্রদর্শকরূপে প্রেরণ করেছি, সৎ পথের দিকে মানুষকে আহবান করাই আপনার কাজ আর তাদের চাহিদা মোতাবেক মোজেযা পেশ করা আপনার দায়িত্ব নয়।

সাঈদ এবনে জোবায়ের (রঃ) বলেছেন, এখানে هاد শব্দ দ্বারা আল্লাহ পাককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেক জাতিকে পথ প্রদর্শন করা আল্লাহ পাকেরই কাজ, তিনিই এর উপর সক্ষম। যেমন কোরআনে করীমে এরশাদ হয়েছেঃ

يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

"আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে সরল পথের দিকে হেদায়েত করেন"।

তফসীরকার একরামা (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে هاد শব্দটির দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে। কেননা তিনি হলেন উম্মতের জন্যে পথ-প্রদর্শক। প্রত্যেক জাতির জন্যেই পথ-প্রদর্শক এসেছেন তবে তাঁদের হেদায়েত ছিল নির্দিষ্ট জাতির উদ্দশ্যে, আর নির্ধারিত সময়ের জন্যে। কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যত হলো সার্বজনীন তথা বিশ্বজনীন। সকল যুগ, কাল এবং দেশ নির্বিশেষে- সমগ্র মানব জাতির জন্যে তিনি পথ-প্রদর্শক। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, "হে মানব জাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদের সকলের নিকট রসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি"।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এর অর্থ হলো হে রসূল! আপনি শুধু ভয় প্রদর্শনকারী, আপনার কাজ হলো, কাফের-মুশরেকদেরকে আল্লাহ পাকের আজাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা এবং আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের জন্যে আহবান করা, আর হেদায়েত তো শুধু একমাত্র আল্লাহ পাকের। অতএব, তারা যদি ঈমান না আনে তবে এজন্যে আপনি দায়ী নন। কেননা, ভয় প্রদর্শন করা আপনার কাজ, আর হেদায়েত আল্লাহ পাকের হাতে। যেমন সূরায়ে ইব্রাহীমে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

الٓرٰ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৪, পৃঃ ৮৭-৮৮
তফসীরে কবীর, খন্ড-১৯, পৃঃ ১৩

"আলিফ, লাম রা"। এই কিতাব (হে রসূল!) আপনার নিকট নাজিল করেছি যেন আপনি গোমরাহীর অন্ধকার থেকে মানুষকে হেদায়েতের আলোর দিকে নিয়ে আসেন তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে"।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক যাকে হেদায়েতের অনুমতি দান করবেন সে-ই হেদায়েত লাভ করবে।

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ؕ

"আল্লাহ পাক জানেন প্রত্যেক নারী তার গর্ভে যা ধারণ করে। পেট যা গুটিয়ে রাখে এবং যা বাড়ে"।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে যারা নবুওয়্যতকে অস্বীকার করেছিল এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকে অবিশ্বাস করেছিল তাদের জবাব প্রদান করা হয়েছে। এর পূর্বে তওহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের কথা বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াত থেকে পুনরায় তওহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের বিরবণ শুরু হয়েছে। তবে সর্বপ্রথম একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে আল্লাহ পাক নিখিল বিশ্বের সবকিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তাঁর এলম সমগ্র বিশ্ব জগতকে পরিবেষ্টনকারী, কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই। আর তিনিই সমগ্র সৃষ্টি জগতের রক্ষাকারী।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) তফসীরে কবীরে পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে এ আয়াতের সম্পর্কের বিবরণ এভাবে পেশ করেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, কাফেররা তাদের ফরমায়েশ মোতাবেক মোজেযা প্রদর্শনের জন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আবদার করেছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে মোজেযা পেশ করেছেন, হেদায়েত গ্রহণের ব্যাপারে তারা সে মোজেযাকে যথেষ্ট মনে করেনি। তাই আল্লাহ পাক এর জবাবে এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক তাদের যাবতীয় অবস্থা সম্পর্কে অবগত। তারা যে আল্লাহর নবীর নিকট মোজেযা প্রদর্শনের আবদার করেছে তা হেদায়েত লাভের জন্যে নয়, বরং হিংসা-প্রসূত একথাও আল্লাহ পাক জানেন। আর তাদের ফরমায়েশ মোতাবেক যদি মোজেযা প্রদর্শন করা হয় তবে তারা তা দ্বারা উপকৃত হবেনা, তাদের অহংকার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে-একথাও আল্লাহ পাক জানেন। যদি তারা হেদায়েত লাভের উদ্দেশ্যে মোজেযা দাবী করতো তবে আল্লাহ পাক অবশ্যই তাদের চাহিদা মোতাবেক মোজেযা প্রদর্শন করতেন। কিন্তু যেহেতু আল্লাহ পাক জানেন যে তারা হেদায়েত লাভের উদ্দেশ্যে নয়; বরং হিংসা ও ঈর্ষার কারণেই নতুন নতুন মোজেযা দাবী করেছে, তাই আল্লাহ পাক তাদের ফরমায়েশ মোতাবেক মোজেযা প্রদর্শনের অনুমতি দান

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৪, পৃঃ ৯০

করেননি।

এ প্রসঙ্গেই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ মনে রেখো, আল্লাহ পাকের নিকট পৃথিবীর কোন কিছুই গোপন নেই। এমনকি, কোন নারী তার পেটে কি ধারণ করে, ছেলে কি মেয়ে, এক কি একাধিক, পূর্ণ কি অপূর্ণ-তাও আল্লাহ পাক খুব ভালভাবেই জানেন। কেননা, তাঁর নিকট বিশ্ব সৃষ্টির কোন কিছুই গোপন নেই। এমনকি, আল্লাহ পাক একথাও জানেন, কোন্ সন্তান জন্ম লাভের পর ঈমান আনবে আর কে কাফের অবস্থায় জীবন যাপন করবে। আর তিনি একথাও জানেন আল্লাহর নবীর বিস্ময়কর মোযেজা সমূহ দেখার পরও কে কাফের থাকবে। আর তিনি এ-ও জানেন যে, মায়েদের পেট কখন বেড়ে ওঠে, আর কতদিনে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে। প্রতিটি বিষয়ই পরিমাণ মোতাবেক রয়েছে, আর প্রত্যেকটি কাজেরই সময় নির্দিষ্ট রয়েছে। কখন কি হবে তা এক আল্লাহ পাকই জানেন, আর কেউ নয়।[১]

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ○

"আল্লাহ পাক গোপন প্রকাশ্য সবই জানেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনি সবার উপরে"।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ পর্যায়ে একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যা বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের প্রত্যেকের সৃষ্টি তার মায়ের উদরে ৪০ দিন যাবত হতে থাকে। এরপর তা জমাট রক্তের রূপ ধারণ করে, এরপর অনুরূপ মেয়াদ পর্যন্ত (৪০ দিন) তা গোশ্ত খন্ডের রূপ ধারণ করে, এরপর স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাক একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন যাকে চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয়। যে সন্তান মায়ের উদরে রয়েছে তার রিয্ক, বয়স, নেককার হওয়া বা বদকার হওয়া-এসব কথাই লিপিবদ্ধ করা হয়।

বর্ণিত আছে যে, ঐ ফেরেশতা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আরজী পেশ করে জানতে চায়, হে আল্লাহ! যে মানুষটি (মায়ের উদরে তৈরী হচ্ছে) সে পুরুষ হবে কি নারী? বদকার হবে কি নেককার? তার রুজি কি হবে? তার বয়স কত হবে?

আল্লাহ পাক এসব কথা ফেরেশতাকে বলে দেন, সে লিপিবদ্ধ করে।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ গায়বের পাঁচটি চাবি রয়েছে, মহাজ্ঞানী আল্লাহ পাক ব্যতীত যা কেউ জানে না। আগামীকাল কি হবে তা আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ জানেনা। পেটে কি জিনিস বড় হচ্ছে, আর কি কম হচ্ছে তা আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ জানেনা। কোথায় বৃষ্টিপাত হবে এর এলম আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কারোরই নেই, কোথায় কার মৃত্যু হবে একথাও আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ জানে না। কেয়ামত কখন কায়েম হবে এ বিষয়ের জ্ঞানও আল্লাহ পাক ব্যতীত আর

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৯, পৃঃ ১৪-১৫

কারোরই জানা নেই। মাতৃগর্ভে কি বৃদ্ধি পায়-এর খবরও আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কারোরই নেই, মাতৃগর্ভে কেউ দশ মাস থাকে, কেউ নয় মাস এ সবই আল্লাহ পাকের জানা।

বিখ্যাত তফসীরকার হযরত যাহ্যাক (রঃ) বর্ণনা করেন, আমি আমার মায়ের উদরে দু'বছর ছিলাম। যখন আমি ভূমিষ্ঠ হই তখন আমার সম্মুখের দু'টি দাঁত বের হয়েছিল।

হযরত আয়েশা (রঃ) বর্ণনা করেন, সন্তানের মায়ের উদরে থাকার মেয়াদ দু' বছর পর্যন্ত হতে পারে।

হযরত মকহুল (রঃ) বর্ণনা করেন, মায়ের উদরে সন্তান নিশ্চিন্ত অবস্থায় আরামে থাকে। তার মায়ের রক্তই তার খাদ্য হয়ে থাকে যা যথানিয়মে তাকে পৌঁছানো হয়ে থাকে। এ কারণেই যতদিন মায়ের উদরে সন্তান থাকে ততদিন তার মাসিক রক্তস্রাব হয়না। যখন সন্তান জন্ম গ্রহণ করে তথা ভূমিষ্ঠ হয়েই সে চিৎকার দেয় কেননা এ নতুন, অপরিচিত স্থান তার জন্যে কষ্টদায়ক হয়। যখন তার নাভীর নাড়ী কর্তন করা হয় তখন আল্লাহ পাক তার রুজি তাব মায়ের বক্ষে পৌঁছে দেন। আর তখনও কোন প্রকার চেষ্টা-তদবীর ব্যতীত এবং নিশ্চিন্ত মনে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সে রুজি পেতে থাকে। এরপর সে বড় হয় এবং স্বহস্তে খেতে শুরু করে। কিন্তু যখনই সে সাবালক হয় তখন সে রিয্‌কের জন্যে হা-হুতাশ করে এবং চারিদিকে চেষ্টা-তদবির শুরু করে। এমনকি, জীবনের ঝুঁকি নিয়েও সে রুজির অন্বেষণ করে। হায় আক্ষেপ! হে আদম সন্তান, তোমার আচরণে আশ্চর্যন্বিত হতে হয় যে আল্লাহ তোমাকে মায়ের উদরে রিয্‌ক পৌঁছিয়েছেন, যিনি তোমাকে মায়ের কোলে রেখে আহার দিয়েছেন, যিনি তোমাকে শৈশব থেকে সাবালক হওয়া পর্যন্ত উপজীবিকা দান করেছেন, এরপর তুমি সাবালক এবং বুদ্ধিমান হয়েই বলতে শুরু করেছ, আমি কোথা থেকে খাব? এরপর মকহুল (রঃ) আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।

বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কন্যা তাঁর নিকট বার্তা-বাহক প্রেরণ করলেন যে, আমার সন্তান অন্তিম অবস্থায় রয়েছে। এ অবস্থায় আপনার আগমন আমার জন্যে খুশির কারণ হবে। তখন তিনি ঐ ব্যক্তিকে বললেন, যাও তাকে বল যা আল্লাহ পাক নিয়ে নেন তা তাঁরই, আর যা রেখে দেন তা-ও তাঁরই। প্রত্যেকটি জিনিসেরই সঠিক পরিমাপ আল্লাহ পাকের নিকট রয়েছে, তাকে বল সবর করতে এবং আল্লাহ পাকের নিকট সওয়াবের আশা রাখতে। আল্লাহ পাক সব বিষয়ে ওয়াকেফহাল, বন্দাদের নিকট তা গোপন থাকুক বা প্রকাশ্য। কিন্তু তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনি সর্বোচ্চ, সবকিছুই তাঁর এলমে রয়েছে। সমগ্র সৃষ্টি জগৎ তাঁর নিকট অসহায়, সকল মাথা তাঁর সম্মুখে ঝুঁকে আছে, সকল বন্দা তাঁর সম্মুখে সম্পূর্ণ শক্তিহীন অসহায়।[১]

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু), পারা-১৩, পৃঃ ৩০-৩১

মায়ের গর্ভে সন্তানের অবস্থান কাল

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى

আলোচ্য আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) মায়ের গর্ভে সন্তানের অবস্থানের মেয়াদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, ওলামায়ে কেরাম এ সম্পর্কে একমত যে, গর্ভে অবস্থানের নূন্যতম সময় হলো ছয়মাস। জনৈক ব্যক্তি একজন স্ত্রীলোককে বিয়ে করে। ছয়মাসেই সে স্ত্রীর ঘরে একটি পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। হযরত ওসমান (রাঃ) স্ত্রীলোকটিকে প্রস্তর নিক্ষেপের মাধ্যমে মৃত্যুদন্ড দেয়ার আদেশ দেন (তাঁর ধারণায় সে ব্যভিচার করেছে) কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ সম্পর্কে আপত্তি করে বলেন, যদি আমি আল্লাহর কিতাবের আলোকে এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে বির্তক করি তবে আপনি জবাব দিতে পারবেন না। কেননা আল্লাহ্ পাক কোরআনে করীমে এরশাদ করেছেনঃ

حَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا

"সন্তানের মায়ের গর্ভে অবস্থান এবং দুধ পানের সময় ৩০ মাস"।

আর অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَفِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ

"আর শিশুর দুধ ছড়ানোর সময় হলো দু' বছর"।

এ দু'টি আয়াতকে একত্রিত করলে গর্ভে অবস্থানের সময় কমপক্ষে ছয় মাস হয়।

হযরত ওসমান (রাঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর এ বক্তব্য শ্রবণের পর স্ত্রীলোকটির জন্যে ঘোষিত শাস্তি বাতিল করেন।

এবনে হোমাম লিখেছেন, হযরত ওসমান (রাঃ) যখন এ শাস্তি বাতিল করেন তখন কেউ এর বিরোধিতা করেনি। এভাবে এ বিষয়ে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয় যে, গর্ভে অবস্থানের সর্ব নিম্ন সময় হলো ছয় মাস। ছয় মাসে সন্তানের জন্মও হয়, জীবিতও থাকে।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মতে, সন্তান গর্ভে অবস্থানের সর্বাধিক সময় হলো দু'বছর। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক (রঃ)-এর মতে, সন্তানের গর্ভে অবস্থানের সর্বাধিক সময় হলো ৪ বছর।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, ইমাম মালেক (রঃ)-এর মতে, সন্তানের গর্ভে অবস্থানের সর্বাধিক সময় হলো পাঁচ বছর।

হাম্মাদ এবনে সালমা (রঃ) বলেছেন, হরম এবনে সেনান নামক ব্যক্তির হরম নামকরণের কারণই ছিল এই যে, সে তার মায়ের গর্ভে চার বছর ছিল। আর হরম শব্দটি "অতি বৃদ্ধ" ব্যক্তির জন্যে ব্যবহৃত হয়।

জনৈক স্ত্রীলোকের স্বামী কয়েক বছর অনুপস্থিত ছিল। সে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে দেখে

তার স্ত্রী গর্ভধারণ করেছে। হযরত ওমর (রাঃ) সে স্ত্রীলোকটিকে প্রস্তর নিক্ষেপের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার ইচ্ছা করেন তখন হযরত মাআজ (রাঃ) বলেন, আমীরুল মোমিনীন যদিও স্ত্রীলোকটিকে শরীয়ত মোতাবেক শাস্তি দিতে পারেন, কিন্তু তার উদরে যে সন্তান রয়েছে তার ব্যাপারে আপনার কোন ক্ষমতা নেই (অর্থাৎ সন্তানকে আপনি হত্যা করতে পারেন না)। যখন সন্তান জন্মগ্রহণ করবে তখন স্ত্রীলোকটিকে আপনি শাস্তি দিতে পারেন।

যাহোক, সন্তান জন্মগ্রহণ করে আর অবস্থা এই ছিল, শিশুটির সম্মুখের দু'টি দাঁতও বের হয়েছিল। ঐ ব্যক্তি শিশুটিকে দেখেই বললোঃ শপথ কা'বার প্রতিপালকের, এ সন্তান আমারই। তখন হযরত ওমর (রঃ) ঐ স্ত্রীলোকটির শাস্তি বাতিল করলেন। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, গর্ভে অবস্থানের মেয়াদ দু' বছরের চেয়ে অধিক হয়, একথা হযরত ওমর (রাঃ) মেনে নিয়েছিলেন।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ সম্পর্কে বলেছেন, এ শাস্তি এজন্যে বাতিল করা হয়েছিল যে, স্বামী সন্তানকে তার নিজের সন্তান বলে দাবী করেছে।[১]

وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ۝

আর প্রত্যেকটি জিনিসের জন্যে আল্লাহ্ পাকের নিকট একটি পরিমাণ রয়েছে, যার পরে তা বাড়েও না কমেও না। আর এর সীমা নির্দিষ্ট রয়েছে আল্লাহ্ পাকের এলমে। তিনি গোপন ও প্রকাশ্য সব বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত।

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী লিখেছেনঃ পৃথিবীর যাবতীয় কাজ একটি সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে হয়। হঠাৎ করে বিনা পরিকল্পনায় কিছু হয় না। সব কিছুর জন্যেই সময়, স্থান, কাল নির্দিষ্ট রয়েছে। আর আল্লাহ পাক সব বিষয়ে অবগত। পৃথিবীতে যা কিছু গোপন বা প্রকাশ্য রয়েছে সবই তাঁর নিকট দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট এবং প্রতিভাত এবং তাঁর ক্ষমতা সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত।

سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ

“তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি কোন কিছু গোপন করে অথবা প্রকাশ করে, এ সব কিছু আল্লাহ্ পাকের নিকট প্রকাশ্য। যে ব্যক্তি অন্যের কাছ থেকে নিজেকে গোপন রাখে বা দিনের বেলায় সকলের সম্মুখে বের হয়ে আসে সবই আল্লাহ্ পাক জানেন”।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে مستخف بالليل শব্দটির অর্থ হলো, যে ব্যক্তি রাতে গোপনে ব্যভিচারে লিপ্ত হয় এবং وسارب بالنهار এর অর্থ হলো, সে দিনের বেলায় সমাজের লোকদের সম্মুখে বের হয়ে প্রকাশ করে যে আমি পাপকার্য থেকে পবিত্র। এর কোন কিছুই আল্লাহ্ পাকের নিকট গোপন থাকেনা অর্থাৎ গোপন ও প্রকাশ্য, অন্ধকার এবং আলোর পার্থক্য সব কিছু মানুষের হিসাবে, আল্লাহ্ পাকের নিকট এসবই সমান। তোমরা কোন কথা গোপন কর বা প্রকাশ কর বা রাতের

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ২৩১-৩২

অন্ধকারে আত্মগোপন কর অথবা দিনের বেলায় আত্মপ্রকাশ কর আল্লাহ পাকের নিকট সবই সমান, যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ[১]

يَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ

তিনি জানেন তোমরা যা কিছু গোপন কর এবং যা কিছু প্রকাশ কর, এক কথায় আল্লাহ পাকের নিকট কোন কিছুই গোপন নেই। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।

যেমন আল্লাহ পাক সূরা ইউনুসে এরশাদ করেছেনঃ

وَمَا تَكُوْنُ فِىْ شَاْنٍ وَّمَا تَتْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْاٰنٍ وَّلَا تَعْمَلُوْنَ
مِنْ عَمَلٍ ...... فِىْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ○ (সূরা ইউনুসঃ ৬১)

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন আর আপনি কোরআনে করীমের যা কিছু তেলাওয়াত করুন না কেন, আর তোমরা যে কাজই কর না কেন, আমি তোমাদের উপর সাক্ষী থাকি যখন তোমরা সে কাজ কর। আর (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে কোন কণা মাত্র বস্তুও গোপন নেই, কি আসমানে, কি জমিনে, কি ছোট, কি বড় সবই সুস্পষ্ট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ পর্যায়ে হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ পাক পবিত্র, তাঁর শ্রবণ শক্তি সকল আওয়াজকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। আল্লাহর শপথ! একজন স্ত্রীলোক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে তার স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে হাযির হয়, সে এত চুপি চুপি তাঁর নিকট তার অভিযোগ পেশ করে যে, আমি সে সময় ঘরেই বসেছিলাম তবে ভাল করে তার কথা শ্রবণ করিনি। কিন্তু আল্লাহ পাক তার সমস্ত কথা শ্রবণ করেছেন। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىْٓ اِلَى
اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ○ (সূরা মুজাদেলা)

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক এ স্ত্রীলোকটির কথা শ্রবণ করেছেন, যে তার স্বামীর ব্যাপারে (হে রসূল!) আপনার সাথে ঝগড়া করছিল আর আল্লাহ পাকের দরবারে অভিযোগ করছিল। আর আল্লাহ পাক তোমাদের উভয়ের কথা শুনছিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ পাক সব কিছু শ্রবণ করেন এবং সব কিছু দেখেন"।

অতএব, পৃথিবীর কোন কিছুই আল্লাহ পাকের নিকট গোপন নেই।

১। খোলাসাতুত তাফাসীর, খন্ড-২,পৃঃ ৪৬৬

لَهٗ
مُعَقِّبٰتٌ مِّنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ؕ وَاِذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ
بِقَوْمٍ سُوْٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ ﴿١١﴾ هُوَ
الَّذِيْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ﴿١٢﴾ ۚ
وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ
فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِى اللّٰهِ ۚ وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ ﴿١٣﴾ ؕ

তরজমা

(১১) মানুষের অগ্র-পশ্চাতে তার প্রহরী নিযুক্ত, তারা আল্লাহ পাকের নির্দেশ-ক্রমে তার হেফাজত করে। নিশ্চয় আল্লাহ পাক কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের অবস্থা নিজেরা পরিবর্তন করে। আল্লাহ পাক যখন কোন জাতির অমঙ্গলের ইচ্ছা করেন তখন তা রদ করার কেউ নেই এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই।

(১২) তিনিই তোমাদেরকে দেখিয়ে থাকেন বিদ্যুৎ যাতে তোমরা ভয় পাও এবং আশ্বস্তও হও। আর তিনিই সৃষ্টি করেন ঘন মেঘ-মালা।

(১৩) আর বজ্র নির্ঘোষ এবং ফেরেশতাগণ তাঁর হামদের মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করতে থাকে। আর তিনিই প্রেরণ করেন বিদ্যুৎ-গর্জন, যার উপরে তিনি ইচ্ছা করেন তা পতিত করেন। এতদসত্ত্বেও তারা আল্লাহ পাকের সম্বন্ধে কলহ করে, অথচ তাঁর পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন।

তফসীরুল কোরআন

প্রত্যেকটি মানুষের সঙ্গে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রহরী ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে যারা মানুষের সম্মুখে এবং পেছনে থাকে এবং আল্লাহ পাকের আদেশ-ক্রমে মানুষের হেফাজত করতে থাকে। মানুষকে বালা-মসিবত এবং কষ্ট থেকে রক্ষা করতে থাকে। তারা বারে বারে আসা যাওয়া করে, রাতে একদল আসে, আর দিনে আসে ভিন্ন একদল। আর

যেভাবে মানুষের কার্য বিবরণী লিপিবদ্ধ করার জন্যে দু'জন ফেরেশতা মোতায়েন রয়েছে একজন ডান কাঁধে, আর একজন বাম কাঁধে। ডান কাঁধে মোতায়েন ফেরেশতা নেক আমল লিখতে থাকে, আর বাম কাঁধের ফেরেশতা বদ আমল লিখতে থাকে। ঠিক এমনিভাবে আরো দু'জন ফেরেশতা বন্দার সামনে ও পেছনে থাকে যারা তার প্রহরায় রত থাকে। অতএব, প্রত্যেকটি মানুষের সঙ্গে সর্বদা চারজন ফেরেশতা মোতায়েন থাকে। দু'জন আমল লিপিবদ্ধ করার জন্যে, আর দু'জন প্রহরার জন্যে। যারা সন্ধ্যায় আসে তারা ভোরে চলে যায়। আল্লাহ্ পাক সবই জানেন, এরপর আল্লাহ্ পাক তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেনঃ তোমরা আমার বন্দাদের কি অবস্থায় দেখে এসেছ?

তখন তারা বলে, আমরা যখন সেখানে পৌছি তখন তাদেরকে নামাজে মশগুল পাই। আর যখন আমরা ফিরে আসি তখনও তাদেরকে নামাজে রত অবস্থায় রেখে আসি।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের সাথে তারা রয়েছে যারা তোমাদের থেকে আলাদা হয়না, শুধু যখন তোমরা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দাও অথবা কামাচারে লিপ্ত হও তখন তারা সরে থাকে। অতএব, তোমাদের কর্তব্য হলো তাদের ব্যাপারে লজ্জাবোধ করা এবং তাদের সম্মান করা। প্রকৃত অবস্থা এই যে, আল্লাহ্ পাক যখন কোন বন্দার ক্ষতি সাধন মঞ্জুর করেন তখন ঐ ফেরেশতারা ক্ষতিকর কাজটি হতে দেয়।

মুজাহেদ (রঃ) বর্ণনা করেন, প্রত্যেক বন্দার প্রতি একজন ফেরেশতা নিযুক্ত রয়েছে যে শয়নে-স্বপনে-জাগরণে ঐ বন্দার হেফাজতে মশগুল থাকে। মানব-দানব এবং কীট-পতঙ্গ ও বিষাক্ত জন্তুর আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা করে। ফেরেশতা তাকে বলেঃ "দূরে সরে যা" তবে আল্লাহ্ পাকের হুকুমে যদি কোন ক্ষতিকর কিছু তার নিকট আসে তবে তাকে বাধা দেয়া হয়না।

কা'বে আহবার বলেছেন, যদি আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাদেরকে তোমাদের উপর মোতায়েন না করতেন যে পানাহার ও অন্যান্য সময় তোমাদের নিকটে থাকে তবে জ্বীনেরা তোমাদের উপর আক্রমণ করতো। এভাবে আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে মানুষের জন্যে প্রহরী নিযুক্ত রয়েছে। যেহেতু দু'জন ফেরেশতা ডান কাঁধে ও বাম কাঁধে রয়েছে যারা নেক আমল ও বদ আমল লিপিবদ্ধ করে থাকেন আর রাতে দু'জন এবং দিনে দু'জন প্রহরায় রত থাকেন এজন্যে معقبت বহুবচনের শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।[১]

হযরত ওসমান (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, একজন বন্দার সঙ্গে ক'জন ফেরেশতা থাকে? তিনি এরশাদ করলেনঃ একজন ডান কাঁধে থাকে নেক আমল লিপিবদ্ধকারী যে বাম কাঁধের ফেরেশতার উপর নেতৃত্ব করে। যখন তুমি কোন নেক আমল কর তখন একের স্থলে ১০টি নেকী লিপিবদ্ধ হয়। আর যখন তুমি কোন মন্দ কাজ কর তখন বাম কাঁধে মোতায়েন ফেরেশতা মন্দ

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু), পারা-১৩, পৃঃ ৩১-৩২
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ২৩৪-৩৫

কাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার অনুমতি প্রার্থনা করে। তখন ডান কাঁধের ফেরেশতা বলে একটু অপেক্ষা কর হয়তো সে তওবা এস্তেগফার করবে। এভাবে তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করে। কিন্তু তবুও যদি সে ব্যক্তি তওবা না করে তবে নেক আমল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতা বলে, এবার লিপিবদ্ধ কর। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে তার থেকে দূরে রাখুন, এত বড় মন্দ সাথী সে আল্লাহকে ভয় করে লজ্জা বোধ করে না। মানুষ যখন তার রসনায় কোন কথা নিয়ে আসে তার উপরও আল্লাহ্ পাক প্রহরী নিযুক্ত করে রাখেন আর দু'জন ফেরেশতা আগে পিছে থাকে। আল্লাহ্ পাক একথাই বলেছেন আলোচ্য আয়াতে- له معقبت(অর্থাৎ মানুষের অগ্র-পশ্চাতে তার প্রহরী নিযুক্ত রয়েছে) আর একজন ফেরেশতা তোমার মাথায় চুল ধরে আছে। যখন তুমি আল্লাহ্ পাকের সম্মুখে বিনয় প্রকাশ কর তখন আল্লাহ্ পাক তোমার মর্তবা বুলন্দ করেন। আর যখন তুমি আল্লাহ্ পাকের সম্মুখে অহংকার কর, অবাধ্য হও, তখন তিনি তোমাকে অপমানিত এবং অক্ষম করে দেন। আর দু'জন ফেরেশতা তোমার ওষ্ঠদ্বয়ে রয়েছে। তুমি আমার প্রতি যে দরূদ পাঠ কর ঐ ফেরেশতা তার হেফাজত করে। আর একজন ফেরেশতা তোমার মুখের নিকট দন্ডায়মান রয়েছে যেন কোন বিষাক্ত জন্তু তোমার মুখের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে না পারে। আর দু'জন ফেরেশতা তোমার চোখের উপর রয়েছে। অতএব, এ দশজন ফেরেশতা প্রত্যেক আদম সন্তানের সাথে রয়েছে। এরপর দিনের জন্যে এবং রাতের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন ফেরেশতা আসা-যাওয়া করতে থাকে। অতএব, প্রত্যেকটি মানুষের সাথে দিন রাতে ২০ জন ফেরেশতা মোতায়েন রয়েছে। এদিকে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য ইবলিস কর্মরত রয়েছে এবং রাত্রিবেলা ইবলিসের সন্তানেরা এ দায়িত্ব পালন করে।

মসনদে আহমদে রয়েছে, তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে জ্বীন সাথীও রয়েছে, ফেরেশতা সাথীও রয়েছে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, হে আল্লাহর রসূল! আপনার সাথেও রয়েছে? তখন তিনি এরশাদ করেছেন হ্যাঁ, তবে আল্লাহ্ পাক তার উপর আমাকে সাহায্য করেছেন। সে আমাকে কল্যাণকর ব্যতীত আর অন্য কিছুর কথা বলেনা।[১] (মুসলিম শরীফ)

مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ

(আল্লাহ্ পাকের আদেশ-ক্রমে) অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের আদেশ-ক্রমে ঐ ফেরেশতাগণ আগে-পিছে আসা যাওয়া করতে থাকে। অথবা এর অর্থ হলো আল্লাহ্ পাকের আদেশ-ক্রমে বন্দার হেফাজত করতে থাকে।

অথবা এর অর্থ হলো, আল্লাহ্ পাকের হুকুমের কারণে তোমাদের হেফজাত করতে থাকে এবং আল্লাহর আজাব থেকে বন্দাকে রক্ষা করতে থাকে। আর তার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করতে থাকে। তার জন্যে অবকাশ প্রদানের আবেদন করতে থাকে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, কোন কোন তফসীরকার বলেছেন له এর সর্বনামটি

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু), পারা-১৩, পৃঃ ৩২
তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-১৩, পৃঃ ১১৫

দ্বারা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর অর্থ হলো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হেফাজতের জন্যে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যে ফেরেশতা মোতায়েন রয়েছে তারা তাঁর আগে-পিছে থাকে এবং শয়তান জ্বীন ও মানুষ থেকে তাঁর হেফাজত করতে থাকে।

আবদুর রহমান এবনে জায়েদ বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে আমের এবনে তোফায়েল আমেরী এবং আরবাদ এবনে রবীয়া সম্পর্কে। কালবী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আমের এবনে তোফায়েল আমেরী এবং আরবাদ এবনে রবীয়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়। তখন তিনি মসজিদের ভেতর সাহাবায়ে কেরামের একটি দলের সঙ্গে ছিলেন। তারা উভয়েই মসজিদে প্রবেশ করে। আমের এবনে তোফায়েল ছিল কানা, তবে অত্যন্ত সুশ্রী ছিল। তার দিকে সকলেই দৃষ্টিপাত করলো। একজন আরজ করলোঃ আমের এবনে তোফায়েল আপনার দিকে আসছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আসতে দাও, যদি আল্লাহ পাকের দরবারে তার কল্যাণ মঞ্জুর হয় তবে তিনি তাকে হেদায়েত করবেন। আমের এসে দাঁড়িয়ে গেল এবং বললোঃ হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম!) যদি আমি মুসলমান হই তবে আমি কি পাব?

তিনি এরশাদ করলেনঃ অন্য মুসলমানদের যা অধিকার ও দায়িত্ব রয়েছে তা তোমারও হবে। অর্থাৎ অন্য মুসলমানদের সমান মর্যাদা লাভ করবে।

আমের বললো, আপনার পরে, এ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আমাকে দেয়া হবে, এ অঙ্গীকার করুন, তাহলে আমি মুসলমান হবো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, এ ক্ষমতা আমার হাতে নেই, এ ক্ষমতা সম্পূর্ণ আল্লাহ পাকের হাতে রয়েছে, তিনি যা ইচ্ছা তা করেন, তখন সে বিকল্প প্রস্তাব পেশ করলো আর তা হলো মরু এলাকায় যাযাবর অবস্থায় যারা বাস করে তাদের উপরে আমাকে ক্ষমতা দিন আর নগর এলাকার উপর আপনি ক্ষমতাবান থাকুন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তা-ও হতে পারেনা। তখন সে বললো, তাহলে আপনি আমাকে কি দেবেন? তিনি এরশাদ করলেন, আমি তোমাকে অশ্বের লাগাম দেব, যার উপর আরোহন করে তুমি জেহাদ করবে। সে বললো, আমার নিকট কি তা নেই? (অর্থাৎ অশ্ব আমার নিকটও রয়েছে যার উপর আরোহন করে আমি যুদ্ধ করি।)

তখন সে বলল, আপনি আমার সাথে উঠে আসুন, আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার সঙ্গে বের হয়ে আসলেন, আমের (তার সাথী) আরবাদকে বলে রেখেছিল, তুমি যখন দেখবে যে আমি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কথায় মশগুল রয়েছি, তখন তুমি তাঁর পশ্চাতে এসে তরবারি দ্বারা আক্রমণ করবে। তাই আমের যখন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে কথা কাটা-কাটি করছিল, তখন আরবাদ তাঁর প্রতি আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে তাঁর পশ্চাতে আসল এবং খাপ থেকে তরবারি কিছুটা বের করলো কিন্তু

আল্লাহ পাক তাকে বিরত রাখলেন এবং সম্পূর্ণ তরবারিটি সে বের করতে সক্ষম হলোনা। কেননা, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম লক্ষ্য করলেন, আরবাদ তরবারি বের করতে শুরু করেছে। তখন তিনি এই বলে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তুমি যেভাবে চাও তাকে শেষ করে দাও (অর্থাৎ গায়বী শক্তিতে তার শাস্তি বিধান কর)।

সেদিন আকাশে মেঘ ছিলনা, আবহাওয়া ছিল অত্যন্ত গরম, আকাশ ছিল অত্যন্ত পরিস্কার। কিন্তু ঐ মুহূর্তে হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকে উঠল এবং আরবাদের উপর পড়ল এবং তাকে জ্বালিয়ে ছাই করে দিল। তখন আমের পশ্চাদ্ধাবন করলো এবং বললো, (মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আপনি আপনার প্রতিপালকের নিকট দোয়া করেছেন এবং আরবাদকে মেরে ফেলেছেন। আল্লাহর শপথ! আমি আপনার বিরুদ্ধে অনেক অশ্বারোহী যুবক একত্রিত করবো এবং এ ময়দান সৈন্যবাহিনী দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেব। তখন হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, আল্লাহ পাক তোমাকে তা করতে দেবেন না।

যাহোক, আমের বের হয়ে গিয়ে একজন স্ত্রীলোকের বাড়ীতে আশ্রয় নিল এবং সকালে উঠে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অশ্বে আরোহন করলো এবং মরুভূমির দিকে চলে গেল। সে অত্যন্ত অহংকারের সঙ্গে বললো, হে মৃত্যুর ফেরেশতা! আমার সম্মুখে আস। এরপর কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল এবং বললো, শপথ লাত, ওজ্জার! যদি আজ দ্বি-প্রহর পর্যন্ত আমি মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁর সাথী যমদূত পর্যন্ত পৌঁছে যাই তবে আমার এ বর্শা দিয়ে উভয়কে শেষ করবো। আল্লাহ পাক একজন ফেরেশ্তা প্রেরণ করলেন, যিনি ডানা দিয়ে আঘাত দিলে সে অশ্ব থেকে পড়ে গেল এবং তার হাঁটুতে এক প্রকার রোগ দেখা দিল যা সাধারণতঃ উষ্ট্রের পিঠে হয়। এরপর সে বাধ্য হয়ে সলুলিয়া নামক স্ত্রীলোকটির বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করলো। এরপর পুনরায় সে অশ্বে আরোহন করলো, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে অশ্বপৃষ্ঠেই তার মৃত্যু হলো। এভাবে আল্লাহ পাক হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দোয়া কবুল করলেন। আমের প্লেগ রোগে এবং আরবাদ বিদ্যুতের আঘাতে ধ্বংস হলো।

মূলত ঃ এ ঘটনা সম্পর্কেই আলোচ্য আয়াত سَوَاءٌ مِّنكُم থেকে يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ পর্যন্ত নাজিল হয়।

এ ঘটনা সা'লাবী বর্ণনা করেছেন। তেবরাণী এ ঘটনাকে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনায় একথা রয়েছে যে, আরবাদ যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পশ্চাতে এসে খাপ থেকে তরবারি বের করতে চেষ্টা করে তখন তার হাত শুষ্ক হয়ে যায়। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে ছেড়ে চলে আসেন। তারা উভয়ে চলে যায়। "রকম" নামক স্থানে পৌঁছার পর আরবাদের উপর বিদ্যুৎ আঘাত হানে এবং সে ধ্বংস হয়।

সা'লাবী এবং তেবরানীর বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, সা'লাবীর বর্ণনায়

রয়েছে আরবাদ এবনে রবীয়া আর তেবরানীর বর্ণনায় রয়েছে আরবাদ এবনে কয়েস। দ্বিতীয়তঃ সা'লাবীর বর্ণনায় রয়েছে, আমের প্লেগ রোগ ধ্বংস হয়, কিন্তু তেবরাণীর বর্ণনায় এর উল্লেখ নেই।

তৃতীয়তঃ সা'লাবীর বর্ণনা বিস্তারিত, আর তেবরানীর বর্ণনা সংক্ষিপ্ত।[১]

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ط

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে বন্দাদের হেফাজতের উল্লেখ ছিল এ মর্মে যে, আল্লাহ পাক ফেরেশ্তাদের মাধ্যমে তাঁর বন্দাদের হেফাজত করেন, যারা আল্লাহর বন্দাদের প্রহরায় রত থাকেন, আর আলোচ্য আয়াতে সেই বিপদাপদের উল্লেখ রয়েছে, যা মানুষের অপকর্মের অবশ্যম্ভবী পরিণতি স্বরূপ মানব জীবনে আসে। এতে রয়েছে, মানব জীবনের উত্থান-পতনের নীতি-কথা, তাই এ আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ

নিশ্চয় আল্লাহ পাক কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না সে জাতি তার অবস্থার পরিবর্তন করে।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক অকারণে কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, তথা তাঁর দয়া মায়া, রহমত, নেয়ামত এবং হেফাজত থেকে কোন জাতিকে বঞ্চিত করেন না, যে পর্যন্ত সে জাতি তার নিজের আচরণ পরিবর্তন না করে। যখন সে নিজেই নিজের অবস্থা পরিবর্তন করে তথা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার বদলে অকৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে, আল্লাহ পাকের অনুগত ও বাধ্য হবার স্থলে অবাধ্য, নাফরমান হয়ে ওঠে, আল্লাহর বিধান সমূহকে অমান্য করে, আল্লাহর জিকর থেকে গাফলত করে, অন্যায়-অনাচার-অবিচার এককথায় পাপাচারে লিপ্ত হয়, তখন আল্লাহ পাকও তাদের ব্যাপারে তাঁর নীতি পরিবর্তন করেন। নিজের দয়া মায়া থেকে বঞ্চিত করেন। যখন প্রকাশ্যে কোন জাতি পাপাচারে লিপ্ত হয়, আর পাপাচার সচরাচর হতে থাকে, তখন এমন জাতি কোপগ্রস্ত হয়, তারা ভাগ্যাহত হয় এবং আল্লাহ ব্যতীত কেউ তাদের সাহায্যকারী থাকেনা। এমনকি, যে ফেরেশ্তা তাদের হেফাজতে মোতায়েন থাকত, তারাও আল্লাহর হুকুমেই সরে দাঁড়ায়।[২]

তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়, আল্লাহ পাক সুবিচার করেন, অবিচার করেন না। যদি আল্লাহ পাক কোন জাতিকে পাকড়াও করেন তবে তা শুধু সেই ভাগ্যাহত জাতির অব্যাহত নাফরমানী এবং পাপাচারের শোচনীয় পরিণাম স্বরূপই করেন।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ২৩৬-৩৮
তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-১৩, পৃঃ ১১৫-১৬
তফসীরে তবরী, খন্ড-১৩, পৃঃ ৮০
২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৪, পৃঃ ৯২

অতএব, এমন পরিবর্তনের জন্যে তারাই দায়ী থাকে।[১]

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, এবনে আবি হাতেমে রয়েছেঃ আল্লাহ পাক বণী ইসরাঈলের নিকট একবার ওহী প্রেরণ করেছেন যে, নিজের সম্প্রদায়কে একথা জানিয়ে দাও, যে জনপদে বা গৃহে আল্লাহর আনুগত্য এবং এবাদতের স্থলে নাফরমানী এবং পাপাচার হয় তবে আল্লাহ পাক তাদের আরাম এবং শান্তির বস্তু সমূহকে দূর করে দেন, আর এমন বস্তু সমূহকে প্রেরণ করেন যা তাদের জন্যে কষ্টদায়ক হয়। আলোচ্য আয়াত إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয়।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তফসীরকারগণ আরো লিখেছেন, এর অর্থ হলোঃ হে মানব জাতি! ভাল ও মন্দ তথা কল্যাণ ও অকল্যাণের চাবি তোমাদেরকে প্রদান করা হলো। যখন তোমরা আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ মেনে চলবে, যে গুণাবলী অর্জনের নির্দেশ তিনি দিয়েছেন তা অর্জন করবে, আর যা বর্জনীয় বলে ঘোষণা করেছেন তা বর্জন করবে তখন আল্লাহ পাকের রহমতের দ্বার তোমাদের জন্যে উন্মুক্ত হবে।

পক্ষান্তরে, যখন কোন ব্যক্তি, সমাজ বা জাতি আল্লাহর অবাধ্য-অকৃতজ্ঞ হবে, তখন তার শাস্তিও অবধারিত হবে।[২]

وَإِذَا أَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْءًا

আর যখন আল্লাহ পাক কোন জাতির অকল্যাণ চান, তখন তা রদ করার কোন ব্যবস্থা থাকেনা। আর তিনি ভিন্ন তার কোন সাহায্যকারীও নেই। অর্থাৎ কোন জাতি যখন তার অবস্থার পরিবর্তন করে, আল্লাহ পাকের বিধান অমান্য করে, আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়, অহরহ পাপাচারে লিপ্ত হয় এমন অবস্থায় আল্লাহ পাক তাদের শাস্তি বিধানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন বা তাদেরকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে ইচ্ছা করেন, তখন এমন কোন শক্তি থাকেনা যা তাদের বিপদকে দূরীভূত করতে পারে বা ঐ অবস্থায় তাদেরকে সাহায্য করতে পারে। যাদের সাহায্য পাবে বলে পথভ্রষ্ট মানুষ ভ্রান্ত ধারণা করে তারা কোন প্রকার সাহায্যই তখন করতে পারেনা। এমনকি তাদের হেফাজতে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যে ফেরেশতা নিযুক্ত থাকে তারাও তখন আল্লাহ পাকের হুকুমের কারণে দূরে সরে যায় এবং তাদের হেফাজত থেকে বিরত থাকে। আর একথা ধ্রুব সত্য, আল্লাহ পাক কোন জাতিকে তার অন্যায়-অনাচারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপই ধ্বংস করার বা বিপদগ্রস্ত করার ইচ্ছা করেন।

যুগে যুগে এ পৃথিবীতে যে সমস্ত সম্প্রদায় জুলুম-অত্যাচারে লিপ্ত হয়েছে এবং তার শোচনীয় পরিণাম স্বরূপ এ পৃথিবীর বুক থেকে তারা চির বিদায় গ্রহণ করেছে, তাদের শিক্ষামূলক ঘটনাবলী বিশ্ববাসীর সম্মুখে তুলে ধরেছে পবিত্র কোরআন। যেমন আদ জাতি, সামুদ জাতি, হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতি, এরা সকলেই জুলুম-অত্যাচার

১। তফসীরে মাজেদী, খন্ড-১, পৃঃ ৫১৩
২। খোলাসাতুত তাফাসীর, খন্ড-২, পৃঃ ৪৬৭

অন্যায়-অবিচারে লিপ্ত হয়েছিল, তাই তারা নিক্ষিপ্ত হয়েছে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে, আল্লাহর কোপগ্রস্ত হয়ে এ পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করেছে। সামুদ জাতিকে মাটির চাপে নিঃস্পেষিত করা হয়, আদ জাতি বায়ুর প্রবল আক্রমণে উড়ে যায় এবং হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতি এক প্রলয়ংকরী বন্যায় প্লাবিত এবং ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়, এভাবে তাদের অন্যায়-অবিচারের অবসান ঘটে। পবিত্র কোরআনের ঘোষণাঃ আল্লাহ পাক অত্যাচারী লোকদেরকে আদৌ পছন্দ করেন না। তিনি জালেমদেরকে বরদাশত করেন না।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ও মর্জির বরখেলাফ কোন কিছু হওয়া সম্ভব নয়। এটি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতবাদ। আল্লামা আলুসী (রঃ) একথাই লিখেছেন।

هُوَ الَّذِىْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে মানুষের হেফাজতের যে ব্যবস্থা করা হয় এবং আল্লাহ পাক কিভাবে ফেরেশতা মোতায়েন করে মানুষের সংরক্ষণের বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করেন তার বিবরণ স্থান পেয়েছে। এরপর যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর অবাধ্য হয়, তাদের অন্যায়-অনাচারের শাস্তি স্বরূপ যে বিপদ আসে তার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি নেককারদের জন্যে পুরস্কার এবং পাপাচারীদের জন্যে শাস্তির যে বিধান রয়েছে তার ঘোষণা স্থান পেয়েছে।

মূলতঃ আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করে এবং তাঁর দয়া মায়া দেখে মানুষ যেন সম্পূর্ণ নির্ভীক নিশ্চিন্ত না হয়ে যায়, এর পাশাপাশি আল্লাহ পাকের গজব দেখে যেন মানুষ নিরাশ না হয়ে যায় তাই আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

هُوَ الَّذِىْ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ

তিনিই আল্লাহ পাক, যিনি তোমাদেরকে বিদ্যুৎ দেখান যেন তোমরা ভয় পাও এবং আশান্বিতও হও। এখানেই আল্লাহ পাকের কুদরতের জীবন্ত নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। আশা এবং ভয় এখানে পাশাপাশি, কাছাকাছি। আকাশে যখন মেঘমালা দেখা যায়, বিদ্যুৎ যখন চমকে উঠে তখন বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনায় মন আনন্দিত হওয়া অতি স্বাভাবিক। কিন্তু এর পাশাপাশি ঝড় এবং তুফানের ভয়েও মানব মন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে।

মূলতঃ একদিকে আল্লাহর রহমতের আশা অন্যদিকে আল্লাহর গজবের ভয় যখন মানব মনে একত্রিত হয়, তখন মানুষ আল্লাহর নাফরমানীর ব্যাপারে সতর্ক হয় এবং আল্লাহর হুকুম পালনে তৎপর হয়।

ইমাম রাজী (রহঃ) পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে লিখেছেন যে এ আয়াত সমূহে তিনটি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছেঃ

১. আল্লাহ্ পাকের কুদরত এবং হেকমতের বিবরণ,

২. আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত ও এহসানের ঘোষণা,

৩. আল্লাহ্ পাকের আজাব এবং কহর।

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন, আকাশে যে মেঘমালা দেখা দেয় এবং বিদ্যুতের যে গর্জন হয় এর সবই আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ-ক্রমেই হয়।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-কে এক প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের بـرق হলো পানি। আকাশে যখন বিদ্যুৎ চমকে তখন তা দেখে মুসাফের ভীত হয় আর যে নিজের বাসস্থানে অবস্থান করে সে আশান্বিত হয়। কেননা বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখে সে আশা করে যে তার ফসলে বরকত হবে। এরপর এরশাদ হয়েছেঃ

وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ

আর তিনি উত্থিত করেন দূর্বহ মেঘমালা। এসবই মানুষের কল্যাণের জন্যে আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে ব্যবস্থা। মেঘের সংঘর্ষণে যে বিদ্যুৎ চমকে তথা অগ্নি- স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হয় তাকে সায়েকা (বজ্র) বলা হয়। আর সায়েকার যে কিরণ হয় তাকে বলা হয়েছে "বরক" তথা বিদ্যুৎ আর এ সংঘর্ষণের কারণে যে আওয়াজ বা হুংকার হয় তাকেই বলা হয় রা'দ তথা গর্জন। এসব কিছুর ব্যবস্থাপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এ সত্য উপলব্ধি করতে এতটুকু বিলম্ব হয়না যে এসব কিছুর পিছনে রয়েছে এক মহা শক্তি। আর সেই শক্তি হলো সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীনের।

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ۚ

আল্লাহ্ পাকের ভয়ে রা'দ এবং অন্যান্য ফেরেশতাগণ তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকে এবং তাঁর প্রতি হামদ প্রকাশ করতে থাকে। তথা তারা سبحان الله بحمده বলতে থাকেন। তিরমিযী শরীফ এবং নেসায়ী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে। তিনি বলেন, ইহুদীরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে জিজ্ঞাসা করে, আমাদেরকে বলুন রা'দ কি জিনিস? তখন তিনি এরশাদ করলেন, মেঘমালার ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ফেরেশতাগণের মধ্যে একজন ফেরেশতা হলেন রা'দ, আল্লাহ্ পাক যেদিকে হুকুম করেন সেদিকে মেঘমালাকে তাড়া করা তার দায়িত্ব। এরপর তারা পুনরায় জিজ্ঞাসা করে আমরা যে গর্জন শ্রবণ করি তা কিভাবে হয়, তখন তিনি এরশাদ করেন, এ গর্জন ঐ ফেরেশতারই।

এবনে মরদবিয়া হযরত জাবের (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, মেঘমালার ব্যবস্থাপনায় একজন ফেরেশতা মোতায়েন রয়েছে যার কাজ হয় বিক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্ন মেঘমালাকে একত্র করা, তার হাতে একটি কোড়া থাকে। যখন তিনি ঐ কোড়াটি উত্তোলন

করেন বিদ্যুৎ চমকে উঠে, যখন তিনি ধমক দেন তখন গর্জন শ্রুত হয়, যখন তিনি আঘাত করেন, তখন বিদ্যুৎ নিক্ষিপ্ত হয়।

مِنْ خِيْفَتِهٖ

অর্থাৎ আল্লাহর ভয়ে রা'দ এবং অন্যান্য ফেরেশতাগণ তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকে। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এর সর্বনাম দ্বারা ফেরেশতাদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তখন বাক্যটির অর্থ হবে এই রা'দ নামক ফেরেশতার ভয়ে তার সহকারী ফেরেশতাগণ আল্লাহ পাকের নামের তসবীহ পড়তে থাকে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রা'দ এর হুংকার শ্রবণ করে এই দোয়া পাঠ করবে–

سبحٰن الذى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفة وهو على كل شىء قدير

তবে যদি তার উপর বিদ্যুতের আঘাতও হয় তবু তার মৃত্যু হবে দ্বীন ইসলামের উপর। হযরত আবদুল্লাহ এবনে জোবায়ের (রাঃ) যখন এই গর্জন শ্রবণ করতেন তখন তিনি কথা-বার্তা বন্ধ করে দিতেন এবং এই দোয়া পাঠ করতে থাকতেন। তিনি বলতেন, এ গর্জনের মধ্যে রয়েছে বিশ্ববাসীর জন্যে কঠোর ধমক। যাহ্যাক (রঃ)-এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) কথা বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, রা'দ ফেরেশতা মেঘমালার ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত রয়েছেন। যেখানে আল্লাহর হুকুম হয় সেখানে মেঘমালাকে পরিচালনা করা তাঁর কাজ। তিনি আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করতে থাকেন। যখন তিনি আল্লাহ পাকের পবিত্রতা বর্ণনা করেন তথা তসবীহ পাঠ করেন তখন আসমানের সমস্ত ফেরেশতা তাঁর সাথে উচ্চস্বরে তসবীহ পাঠ করে, তখন কেউ এ তসবীহ পাঠ না করে থাকেনা। আর তখন পৃথিবীতে বৃষ্টিপাত হয়।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের প্রতিপালক এরশাদ করেছেন, যদি আমার বন্দাগণ আমার হুকুম মোতাবেক জীবন যাপন করতো তবে আমি তাদেরকে রাত্রি বেলা বৃষ্টি দ্বারা তৃপ্তি দিতাম এবং দিনের বেলা রৌদ্র দিতাম (যেন তাদের কাজ-কর্মে অসুবিধা না হয়) আর তারা পুরোপুরি রা'দের হুংকার শ্রবণ করতোনা (যেন ভীত- সন্ত্রস্ত না হয়)।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছেন। তিনি লিখেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মেঘের গর্জন শ্রবণ করে এ দোয়া পাঠ করতেনঃ

اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك (তিরমিযী শরীফ)

হে আল্লাহ! তোমার গজবের কারণে আমাদেরকে হত্যা করোনা, তোমার আজাব দিয়ে

আমাদেরকে ধ্বংস করোনা, আর আমাদেরকে তার পূর্বে রক্ষা কর।

অন্য বর্ণনায় এ দোয়াটি রয়েছেঃ

سبحٰن من يسبح الرعد بحمده

পবিত্র সেই আল্লাহ পাক, যাঁর হামদের তাসবীহ্ পাঠ করে রা'দ।

এবনে জাকারিয়া (রঃ) বর্ণনা করেন, রা'দ এর গর্জন শ্রবণ করে যে এ দোয়া পড়ে-

سبحٰن الله وبحمده

তার উপর বিদ্যুৎ নিক্ষিপ্ত হয়না।

وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَّشَآءُ

তিনি যার উপর চান বিদ্যুৎ গর্জন পতিত করেন।

وَهُمْ يُجَادِلُوْنَ فِى اللّٰهِ

আর তারা আল্লাহ্ পাকের ব্যাপারে কলহ্ করে অর্থাৎ কাফেররা আল্লাহ্ পাকের তওহীদ ও একত্ববাদ এবং তাঁর অনন্ত অসীম কুদরত-হেকমতের ব্যাপারে এবং মানুষের পুনরুত্থানের ব্যাপারে কলহ্ করে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীনের গুণাবলীর উপর তারা বিশ্বাস করেনা।

আল্লামা বগভী লিখেছেন, হযরত মোহাম্মদ আলী বাকের (রঃ) বলেছেন, বিদ্যুৎ মুসলিম-অমুসলিম সকলের উপরই নিক্ষিপ্ত হতে পারে তবে যে মুসলমান আল্লাহর জিকরে মশগুল থাকে তার উপর নিক্ষিপ্ত হয়না।

শানে নুজুল

ইমাম নেসায়ী (রঃ) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত একখানি হাদীস সংকলন করেছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম একজন সাহাবীকে জনৈক কাফেরের নিকট তাকে ঈমান আনয়নের দাওয়াত দেয়ার জন্যে প্রেরণ করলেন। (এ ব্যক্তি ছিল অত্যন্ত বড় অবিশ্বাসী কাফের) সে বললো, তুমি যে প্রতিপালকের দিকে আমাকে ডাক তিনি কি লোহার, না তামার, না রূপার, না স্বর্ণের। ঐ সাহাবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট হাযির হয়ে তার জবাবের কথা জানালেন। তিনি তাঁকে দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বার গমনের নির্দেশ দিলেন। সে ব্যক্তি একই জবাব দিল। তখন আল্লাহ্ পাক তার উপর বিদ্যুৎ নিক্ষেপ করলেন। সে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ঐ সময় وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ আয়াত নাজিল হয়।

আল্লামা বগভী লিখেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে আরবাদ এবনে রবীয়া সম্পর্কে, যার ঘটনা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। হযরত হাসান বসরী (রহঃ) এ আয়াতের শানে নজুল সম্পর্কে উপরোল্লিখিত কাফেরের বেয়াদবীর কথা বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর বর্ণনায়

রয়েছে যে, কয়েকজন সাহাবায়ে কেরাম ঈমানী দাওয়াত নিয়ে ঐ কাফেরের নিকট গমন করেন। তিনবার দাওয়াতের পর যখন ঐ কাফেরের বেয়াদবী এবং ধৃষ্টতা চরমে পৌঁছে তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তার উপর বিদ্যুৎ নিক্ষিপ্ত হয়। সাহাবায়ে কেরাম দ্রুতবেগে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ খবর দেয়ার জন্যে যেতে লাগলেন, পথে অন্য একদল সাহাবায়ে কেরামের সাথে তাঁদের দেখা হয়। তাঁরা বলেন, ঐ লোকটি পুড়ে গেছে। তখন প্রত্যাবর্তনকারী সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কিভাবে জানতে পারলে? তাঁরা বললেন, আল্লাহ্ পাক তাঁর রসূলের নিকট ওহী প্রেরণ করেছেন এবং এ আয়াত নাজিল করেছেন।

وَهُوَ شَدِيْدُ الْمِحَالِ

তিনি অত্যন্ত বড় শক্তিশালী। মুজাহেদ (রহঃ) আলোচ্য বাক্যের এ অর্থই করেছেন। আর আবু ওবায়দা (রহঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো তিনি অত্যন্ত কঠিন শাস্তি প্রদানকারী। বিখ্যাত আরবী অভিধান গ্রন্থ কামুসে এর অর্থ লেখা হয়েছে ধ্বংস করা, শাস্তি দেয়া প্রভৃতি। হযরত আলী (রাঃ)-এর অর্থ করেছেন, আল্লাহ পাকের ধরা বড় শক্ত ধরা।

لَهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ ؕ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ
بِشَيْءٍ اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ؕ وَمَا
دُعَآءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ﴿١٤﴾ وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ۩ ﴿١٥﴾ قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ؕ قُلِ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ
لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ؕ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ۙ اَمْ
هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمٰتُ وَالنُّوْرُ ۚ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ
فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ؕ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَّهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١٦﴾

তরজমা

(১৪) সত্য ডাক তাঁরই জন্যে নির্দিষ্ট এবং তারা আল্লাহ পাক ব্যতীত যাদেরকে ডাকে তারা তাদেরকে কোন সাড়াই দেয়না। তাদের দৃষ্টান্ত সে ব্যক্তির ন্যায় যে পানির দিকে দু'হাত প্রসারিত করে এ আশায় যে পানি আপনা-[illegible]ন তাদের মুখে পৌঁছে যাবে; অথচ

পানি কখনও সে পর্যন্ত পৌঁছবার নয়। আর কাফেরদের আবেদন (দেবতাদের নিকট) নিষ্ফলই।

(১৫) আর আসমান-জমীনে যা কিছু আছে সকলেই ইচ্ছায় অনিচ্ছায় আল্লাহ্ পাককে সেজদা করে থাকে এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাদের ছায়াও সেজদারত থাকে।

(১৬) (হে রসূল!) জিজ্ঞাসা করুন, আসমান সমূহ ও জমীনের প্রতিপালক কে? (হে রসূল!) আপনি বলুন, আল্লাহ। (হে রসূল!) আপনি জিজ্ঞাসা করুন, তবে কি তোমরা আল্লাহ্ পাকের পরিবর্তে এমন সাহায্যকারী গ্রহণ করেছো যারা নিজেদেরই লাভ বা ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয়? (হে রসূল!) জিজ্ঞাসা করুন, তবে কি অন্ধ ও চক্ষুস্মান এক সমান? অন্ধকার ও আলো কি কখনও এক সমান হতে পারে? নাকি তারা আল্লাহ্ পাকের এমন শরীক সাব্যস্ত করে নিয়েছে যে তারাও আল্লাহ পাকের সৃষ্টির ন্যায় (কোন কিছু) সৃষ্টি করেছে। ফলে সে সৃষ্টি তাদের দৃষ্টিতে একই প্রকার মনে হয়েছে? (হে রসূল!) আপনি বলুন, আল্লাহ্ পাকই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, তিনি যে একক, তিনি প্রবল প্রতাপশালী।

তফসীরুল কোরআন

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ

অর্থাৎ সত্য ডাক একমাত্র আল্লাহ পাকের জন্যেই নির্দিষ্ট রয়েছে। তিনিই এবাদত-বন্দেগীর যোগ্য। আর তাঁর এবাদত-বন্দেগীর জন্যে মানুষকে আহ্বান করাই কর্তব্য। আর নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্যে তাঁর নিকটই মিনতি জানানো কর্তব্য। অথবা এর অর্থ হলো এখলাসের সঙ্গে দোয়া করা তথা এখলাসের সঙ্গে শুধু আল্লাহ্ পাকের নিকটই দোয়া করতে হয়। অথবা আলোচ্য আয়াতে حق অর্থ আল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহ পাকের ডাক হলো সত্যের ডাক।

আল্লামা এবনে কাসীর (রহঃ) এবং আল্লাম বগভী (রহঃ) লিখেছেন, আল্লাহর জন্যে সত্যের দাওয়াত হলো তওহীদ।

মোহাম্মদ এবনে মুনকাদের (রহঃ) বলেছেন, এর অর্থ لا اله الا الله অর্থাৎ আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন মা'বুদ বা উপাস্য নেই।[১]

ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন, একরামা (রহঃ) বলেছেনঃ বাক্যটির অর্থ হলো নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক, তিনিই হক্ব, তাঁর ডাকই সত্য। অর্থাৎ তাঁর নিকটই দোয়া করা উচিত, আর কারো নিকট নয়।

অথবা এর অর্থ হলো শুধু এক আল্লাহরই বন্দেগী করা উচিত আর কারো নয়।

ইমাম তবরী (রহঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহর একত্ববাদ। আর একথার স্বাক্ষ্য দেয়া যে আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন মা'বুদ বা উপাস্য নেই।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ২৪২

ইমাম তবরী (রহঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এর অর্থ তওহীদ।

ইমাম কাতাদা (রহঃ) বলেছেন, دعوة الحق এর অর্থ হলো لا اله الا الله

এবনে জোরায়েজ এবং এবনে যায়েদও অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রহঃ) লিখেছেনঃ (له دعوة الحق) এ আয়াতের অর্থ হলো দোয়া শুধু আল্লাহ্ পাকের দরবারেই করা যায়। শ্রবণ করার শক্তি এবং দোয়া কবুল করার শক্তি একমাত্র তাঁরই, আর কারো নয়। আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কারো নিকট দোয়া করা নিতান্ত নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। কেননা, আল্লাহ্ পাক ব্যতীত আর কারো নিকট কোন ক্ষমতাই নেই।[১]

যেহেতু সকল মঙ্গল-অমঙ্গলের যিনি মালিক তিনি আল্লাহ্ পাকই, আর কেউ নয়, অতএব তাঁকেই ডাকা উচিত আর কাউকে নয়। কেননা যারা অক্ষম, যারা অপদার্থ তাদেরকে ডাকলে কোন লাভ হয়না। লাভ-ক্ষতির মালিক একমাত্র আল্লাহ্ পাকই। আর কেউ নয়, তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِيْبُوْنَ لَهُمْ بِشَيْءٍ

যারা আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কিছুকে ডাকে তারা কোনদিন সাড়া দেবে না, তাই তাদের ডাক কোন কাজেই আসেনা। তাদের দৃষ্টান্ত হলো এরূপঃ

اِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ ؕ

কূপের কাছে বসে কেউ যদি পানির দিকে হাত বাড়িয়ে পানিকে ডেকে বলে আয় পানি আয়, আমার মুখে আয়, তবে কি সে পানি তার মুখে চলে আসবে? না কোনদিন আসবে না, সে ডাকতে পারবে, কেউ তার ডাকে সাড়া দেবে না।

বস্তুতঃ যারা আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কিছুকে ডাকে, তাদের প্রকৃত অবস্থা এরূপই। তারা তাদের বানানো মূর্তিকে ডাকে, দেব-দেবীকে ডাকে, বৃক্ষ-তরুলতাকে ডাকে কিন্তু কোন সৃষ্টি তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারে না।

বস্তুতঃ কাফেরদের ডাক সবই ভুল, সবই ভ্রান্তি, সবই পথভ্রষ্টতা, এতদ্ব্যতীত আর কিছুই নয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, যেহেতু পানি প্রাণহীন বস্তু, তার কোন অনুভূতিও নেই সে জানেও না কে তাকে ডাকে, তাই কারো ডাকে তার সাড়া দেয়ার প্রশ্ন উত্থিত হয়না। ঠিক এ অবস্থাই হলো কাফেরদের দেব-দেবীদের, যতই তারা ডাকে তাতে কোন উপকার নেই, কেননা তারা প্রাণহীন, তাদের কারো কোন কথা শ্রবণ করার শক্তি নেই, জবাব দেয়ারও কোন শক্তি নেই।

১। তফসীরে মাজেদী, খন্ড-১, পৃঃ ৫১৪

মুজাহেদ (রঃ) এবং আতা (রঃ) আলোচ্য আয়াতের এ অর্থই বর্ণনা করেছেন, আর হযরত আলী (রঃ) থেকেও এ অর্থই বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যারা আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কিছুর পূজা করে, তাদের অবস্থা হলো এরূপ যেমন, কোন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি পানির মধ্যে নিজের হাত ছড়িয়ে রাখে, যে পর্যন্ত সে হাত দ্বারা কোশ করে পানি না তুলবে সে পর্যন্ত তার মুখে পানি পৌঁছবেনা, যেভাবে সে পানি পানে ব্যর্থ হবে, ঠিক এভাবে কাফেরদের আরাধনাও ব্যর্থ হয়ে থাকে, কেননা তারা সম্পূর্ণ অসহায়।

وَمَا دُعَاءُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ

(আর কাফেরদের দোয়া তো নিষ্ফলই। কেননা তারা অসহায় অক্ষম সৃষ্টির কাছে দোয়া করে।)

প্রশ্ন হতে পারে, কাফেরদের অনেক আকাংক্ষাইতো পূর্ণ হতে দেখা যায়, এর কারণ কি? তফসীরকারগণ এর জবাবে বলেছেন, কাফেরদের যে আকাংক্ষা পূর্ণ হয় তা তাদের দোয়ার কারণে নয়, বরং স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের যথা নিয়মেই তা পূর্ণ হয়।

আল্লাম আলুসী (রহঃ) লিখেছেন, কাফেরদের যে দোয়া সমূহ কবুল হয়না বলা হয়েছে, সেগুলো হলো আখেরাত সম্পর্কীয় দোয়া, দুনিয়া সম্পর্কীয় নয়। কেননা দুনিয়াতে আল্লাহ পাক কাফেরদেরকে রিয্ক দান করেন, শুধু রিয্কই নয় অনেক নেয়ামত তারা লাভ করে, কিন্তু আখেরাতে তাদের শাস্তি অবধারিত, আর এ শাস্তি হবে চিরস্থায়ী।

আল্লামা আলুসী (রহঃ) এ পর্যায়ে হযরত এবনে আব্বাস (রহঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কাফেরদের চিৎকার, হাহাকার আল্লাহ পাকের দরবারে পৌঁছানো হয়না। আল্লাহ পাকের দরবার থেকে তাদের আর্তনাদকে দূরে রাখা হয়।[১]

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا

আসমানে জমিনে যা কিছু আছে, ইচ্ছায় হোক কি অনিচ্ছায় সকলেই আল্লাহকে সেজদা করে অর্থাৎ সমস্ত ফেরেশতাগণ এবং ঈমানদার বন্দাগণ সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সেজদারত হয়, আর যারা মুনাফেক ও কাফের তারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভয়ে সেজদারত হয়। আর তাদের ছায়াও আল্লাহ পাকের সেজদা করে থাকে।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, এখানে সেজদারত হওয়ার তাৎপর্য হলো, আল্লাহ পাকের হুকুমের অনুগত থাকা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়। আর ছায়ার অনুগত হওয়ার অর্থ হলো আল্লাহ পাকের ইচ্ছা মতে ছায়া কখনও সম্প্রসারিত হয়, কখনও সংকুচিত হয়, কখনও বাড়ে কখনও কমে, এটিই হলো ছায়ার সেজদা। যেহেতু সকাল-সন্ধ্যায় ছায়া বৃদ্ধি পায় তাই আয়াতে সকাল-সন্ধ্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেনঃ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ দ্বারা

১। তফসীরে রুহুল মাআনী, খন্ড-১৩, পৃঃ১২৬

ফেরেশতাগণ এবং মোমেনদের আত্মা সমূহকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর ضلال শব্দ দ্বারা ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে।

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

(হে রসূল!) আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, কে আসমান জমিনের প্রতিপালক? কে পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন? এ বিশাল-বিস্তৃত পৃথিবী সৃষ্টি ও ব্যবস্থাপনা কার সৃষ্টি-নৈপূণ্যের নিদর্শন?

قُلِ اللّٰهُ ط

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন আল্লাহ পাকই সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা, তিনিই রিয্‌কদাতা, তিনিই ভাগ্যনিয়ন্তা। একথাটি এত সুস্পষ্ট যে তা কেউ অস্বীকার করতে পারেনা। তাই (হে রসূল) আপনি এ প্রশ্নের জবাব দিন, যেন কাফের মুশরেককরা এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। আর সে শিক্ষা এই যে, যখন তোমরা আল্লাহর পাকের প্রতিপালনকে অস্বীকার করতে পার না, এমন অবস্থায় কোন হীন সৃষ্টিকে কেন আল্লাহ পাকের সাথে শরীক কর? যিনি সর্বশক্তিমান, সর্বগুণাকর, তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক করা কত অযৌক্তিক, কত অসুন্দর। আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুশরেকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আসমান জমিনের স্রষ্টা কে? তারা জবাব দিল আপনিই বলুন, তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করলেনঃ

قُلِ اللّٰهُ ط

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি জবাব দিন যে আল্লাহ পাকই আসমান জমিনের স্রষ্টা ও পালনকর্তা।

قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَاۤءَ

(হে রসূল!) আপনি বলুন, এতদসত্ত্বেও কি তোমরা আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্যদেরকে সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করছো? অর্থাৎ যখন তোমরা একথা অস্বীকার করতে পার না যে, আল্লাহ পাকই স্রষ্টা ও পালনকর্তা, এমন অবস্থায় আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্যকে কোন্ যুক্তিতে সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ কর।

لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا ط

অর্থাৎ যাদেরকে তোমরা সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করছো তারা এত অসহায়, নিরুপায় এত অক্ষম যে তোমাদের সাহায্য করাতো দূরের কথা তারা নিজেদেরও কোন উপকার করতে সক্ষম নয়। অতএব, তাদেরকে সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করার ন্যায় নির্বুদ্ধিতা আর কিছুই হতে পারেনা।

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ

(হে রসূল!) আপনি তাদেরকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করুন, তোমরাই বল, অন্ধ এবং

চক্ষুষ্মান কি কখনও এক হতে পারে? তা কখনও হতে পারেনা। অর্থাৎ নির্বোধ এবং বুদ্ধিমান যখন এক হতে পারেনা ঠিক তেমনিভাবে যে তার বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা নিজের স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের মা'রেফাত অর্জন করে এবং তাঁর বন্দেগীতে রত হয় এবং তাঁর সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে, আর যে বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করেনা, স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের পরিচয় লাভ করেনা, তারা কোন অবস্থাতেই এক সমান হতে পারেনা।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে اعمى বা অন্ধ বলতে কাফেরদের সে উপাস্যকে বোঝানো হয়েছে যে তার পূজারীদের কোন খবরই রাখেনা। আর بصير শব্দ দ্বারা সেই মা'বুদকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যিনি সকলের অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।[১]

أَمْ هَلْ تَسْتَوِى الظُّلُمٰتُ وَالنُّورُ

আলো এবং আঁধার কি এক সমান হতে পারে? তা কখনও হতে পারেনা। ঠিক এমনিভাবে ঈমান ও কুফর কখনও এক সমান হতে পারেনা, ঈমান হলো নূর বা আলো আর কুফর হলো অন্ধকার। এরপর কাফেরদেরকে পুনরায় প্রশ্ন করা হয়েছেঃ

أَمْ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ

(হে রসূল!) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন, তবে তোমরা যাদেরকে উপাস্য মনে কর তারা কি আল্লাহর সৃষ্টির ন্যায় এমন কিছু সৃষ্টি করেছে? যে কারণে তোমরা তাদের ব্যাপারে সন্দিহান হয়েছ। অথচ তারাতো সম্পূর্ণ অসহায়। তোমাদের ঠাকুর দেবতা বা উপাস্যরাতো একটা মাছির ডানাও সৃষ্টি করতে পারেনা। তাদেরকেই তো তোমরা তৈরি কর। অতএব, তাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করার ন্যায় নির্বুদ্ধিতা আর কিছুই হতে পারেনা। হে রসূল! আপনি ঘোষণা করুন, আল্লাহ পাকই সব কিছুর স্রষ্টা, তিনি একক, তিনি প্রবল প্রতাপশালী, তিনি পরাক্রমশালী, পৃথিবীর কোন কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না, তিনিই সব কিছুকে অস্তিত্ব দান করেছেন। আলোচ্য আয়াতে তওহীদ বা আল্লাহর একত্ববাদের দলিল-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে এবং শেরক বা পৌত্তলিকতার ভিত্তিমূলে আঘাত করা হয়েছে। সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে আল্লাহ পাক এক, অদ্বিতীয়, তাঁর পবিত্র সত্তায় এবং তাঁর যাবতীয় গুণাবলীতে তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, কোন শরীক হতে পারেনা। তিনি ভিন্ন আর সব কিছুই তাঁর সৃষ্টি। তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা। অতএব, এবাদত শুধু তাঁরই করতে হবে, তাঁর প্রতিই বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং তাঁর প্রতিই ভরসা রাখতে হবে।[২]

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ২৪৬
২। তফসীরে মাজেদী, খন্ড-১, পৃঃ ৫১৫

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ
زَبَدًا رَّابِيًا ۚ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ
زَبَدٌ مِّثْلُهُ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ
جُفَاءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ ۚ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ
اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴿١٧﴾ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَالَّذِينَ لَمْ
يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا
بِهِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ ۖ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿١٨﴾

তরজমা

(১৭) তিনি আসমান থেকে বৃষ্টিপাত করেন। এরপর উপত্যকা সমূহ তাদের পরিমাণ মোতাবেক প্লাবিত হয়, এই প্লাবন ভাসিয়ে নিয়ে গেল আবর্জনাগুলো যা তার উপর ছিল, আর যে সমস্ত পদার্থকে অলংকার অথবা তৈজষপত্র প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হয় তাতেও এ প্রকার আবর্জনা (উপরে উঠে থাকে)। এভাবেই আল্লাহ পাক হক্ব ও বাতিলের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। বস্তুতঃ যা আবর্জনা তা ফেলে দেয়া হয়, আর যা মানুষের প্রয়োজনীয় তা ভূ-পৃষ্ঠে থেকে যায়। এভাবেই আল্লাহ পাক দৃষ্টান্ত সমূহ বর্ণনা করে থাকেন।

(১৮) যারা তাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয় তাদের জন্যে রয়েছে উত্তম বিনিময়। পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ মানেনি তথা তাঁর ডাকে সাড়া দেয়নি (পরকালে) যদি তাদের নিকট পৃথিবীর সমস্ত সম্পদও থাকে এবং এর সঙ্গে ঐ পরিমাণ আরও ধন-সম্পদ থাকে তাদের নাজাতের জন্যে, তারা সবই দিতে ইচ্ছুক হবে, তাদের হিসাব হবে অত্যন্ত কঠিন এবং দোজখই হবে তাদের চিরস্থায়ী নিবাস। বলাবাহুল্য তা অত্যন্ত জঘন্য আশ্রয়-স্থল।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদেরকে অন্ধ এবং মোমেনদেরকে চক্ষুষ্মান বলা হয়েছে।

কুফর এবং নাফরমানীকে অন্ধকার আর ইসলামকে নূর বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। আর এ আয়াতে হক্ব ও বাতিলের দু'টি দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে। একটি পানির আর একটি অগ্নির, আসমান থেকে আল্লাহ পাক পানি বর্ষণ করেন, বৃষ্টিপাত হয় তাঁর নির্দেশ-ক্রমে। নদী-নালা ভরে যায় এই পানিতে। পানি একই পরিমাপে নাজিল হয় তবে প্রত্যেক নদী-নালা তার প্রশস্ততা, গভীরতা এবং পরিমাপ মোতাবেক ঐ পানি গ্রহণ করে। ঠিক এমনিভাবে আল্লাহ পাক আসমান থেকে পবিত্র কোরআন নাজিল করেছেন। আর মানুষের অন্তর-ভূমি তার যোগ্যতা অনুসারে এই আসমানী রহমতকে গ্রহণ করে এবং ফয়েজ লাভ করে। যেমন, নদী-নালা বা উপত্যকা তার প্রশস্ততা এবং যোগ্যতা মোতাবেক আসমান থেকে অবতীর্ণ বৃষ্টির পানি ধারণ করে। আর ঐ পানির উপরে ফেনা এমনভাবে ফুলে ওঠে মনে হয় সবই সেখানে ফেনা, পানির অস্তিত্ব সেখানে নেই। কিন্তু পানি থাকে তার নীচে। ঠিক এভাবে বাতিল বা অসত্য ফেনার ন্যায় সত্যের উপর থাকে, আর সত্য পানির ন্যায় নীচে থাকে। যখন ক্ষণিকের মধ্যে বাতিল দূরীভূত হয় ফেনার মত, তার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায় তখন সত্য উদ্ভাসিত হয় আর বাতিলের নাম-নিশানাও থাকে না।

মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম ইসলামের দাওয়াত দিলেন, পবিত্র কোরআন নাজিল হলো, বাতিল বা অসত্য তখন চরম শক্তিশালী ছিল। বাতিল-পন্থীরা ইসলামের মহাসত্যকে ধ্বংস করার সর্বাত্মক চেষ্টা করলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অকথ্য নির্যাতন করা হলো সুদীর্ঘ তেরটি বছর। বাতিলের ঢেউ সব কিছু যেন গ্রাস করে ফেলবে। ঐ অবস্থায় আল্লাহ পাকের নির্দেশ-ক্রমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে (রাঃ) স্বীয় মাতৃভূমি ছেড়ে হিজরত করতে হলো মদীনা মোনাওয়ারায়। এরপর সুদীর্ঘ আটটি বছর যাবত হক্ব ও বাতিলের সংঘর্ষ অব্যাহত রইল। বদর, ওহোদ, খন্দকসহ অন্যান্য ঐতিহাসিক রণাঙ্গণগুলো হক্ব ও বাতিলের তথা সত্য-অসত্যের সশস্ত্র সংগ্রামের জীবন্ত ইতিহাস হয়ে আছে। অবশেষে অষ্টম হিজরীতে আল্লাহ পাক মহা বিজয় দান করলেন। বাতিল ও অসত্য শুধু ভুলণ্ঠিত হলোনা, বরং নিশ্চিহ্ন হলো এবং হক্ব বা সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। ৩৬০টি মূর্তি স্বহস্তে ভেঙ্গে ফেলার সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ আয়াত পাঠ করেছিলেনঃ

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ○

"(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, নিশ্চয় সত্য এসেছে, মিথ্যা বিদায় নিয়েছে আর মিথ্যাতো বিদায় নেয়ারই যোগ্য"।

যেভাবে পানির উপরের ফেনা কিছুক্ষণ পরই তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে ঠিক এমনিভাবে বাতিল সত্যের অব্যাহত আঘাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতে হক্ব ও বাতিলের আরো একটি দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। অলংকার বা কোন তৈজষপত্র তৈরির উদ্দেশ্যে স্বর্ণ রৌপ্যকে যখন আগুনে পোড়ানো হয় তখন তাতে আবর্জনা বা ফেনা ভেসে

ওঠে। ঐ আবর্জনা বা ফেনাই দৃষ্টিগোচর হয়; মূল্যবান ধাতু পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই দেখা যায় ফেনা আপনা-আপনি উধাও হয়ে গেছে, তার চিহ্নও শুষ্ক হয়ে যায়। আর এভাবে নিশ্চিহ্ন হয়, যা আসল যা মানুষের প্রয়োজনের শুধু তাই থেকে যায়। ঠিক এভাবে কখনও অন্যায়-অনাচারের, অসত্যের প্রভাব এত বেড়ে যায়, মিথ্যা এবং বাতিল এত শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে তাদেরই জয় জয়কার মনে হয়। এমনি অবস্থায় দুর্বল চিত্ত মানুষ বাতিলের অনুসারী হয়ে পড়ে। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই সত্যধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, অসত্য বা বাতিল, মিথ্যা অধর্ম ফেনার ন্যায় উধাও হয়ে যায়।

সত্য ও অসত্যের তথা হক্ব ও বাতিলের সংঘর্ষ পৃথিবীতে আবহমানকাল ধরেই আছে তবে সত্যের জয় এবং বাতিল বা অসত্যের পরাজয় অনিবার্য, অবধারিত। যদি কোন সময় বাতিল শক্তিশালী হয়ে যায়, সত্যকে আপাতঃ দৃষ্টিতে দুর্বলও মনে হয় তবু প্রকৃত মোমেন ভীত হয়না। কেননা পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ ○

"আর তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়োনা, চিন্তিতও হয়োনা, তোমরাই হবে বিজয়ী যদি তোমরা প্রকৃত মোমেন হও"।

এ আয়াত নাজিল হয়েছিল তৃতীয় হিজরীতে অনুষ্ঠিত ওহোদের যুদ্ধে মুসলমানদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল সেই বিপদজনক মুহূর্তে। আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে বাতিলের সাময়িক প্রভাবে ভীত না হওয়ার আদেশ দিয়েছেন। অবশেষে বিজয় সত্য ও ন্যায়ের, তথা ইসলামের। আলোচ্য আয়াতের 'দু'টি দৃষ্টান্ত দ্বারা একথাই সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ط

"আল্লাহ পাক এভাবেই হক্ব ও বাতিলের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, এ দৃষ্টান্তের তাৎপর্য হলো, আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআন নাজিল করেছেন এবং তার পূর্বে অন্যান্য আসমানী কিতাবও তিনি নাজিল করেছেন। মানুষ তার যোগ্যতা অনুসারের এই আসমানী গ্রন্থ দ্বারা উপকৃত হয় এবং এর মহান শিক্ষার আলোকে নিজেকে আলোকিত করে। আল্লাহ পাকের তরফ থেকে অবতীর্ণ এই পবিত্র কোরআন কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে থাকবে। যতদিন আল্লাহ পাক পৃথিবীকে টিকিয়ে রাখা পছন্দ করবেন ততদিন পর্যন্ত মানুষের অন্তর আলোকিত করার জন্যে তাকে পৃথিবীতে রাখবেন। এর দৃষ্টান্ত পানি যা আসমান থেকে নাজিল হয়। নদী-নালা উপত্যকা সবই ঐ পানি দ্বারা পরিপূর্ণ হয়। প্রত্যেকটি নদী-নালার প্রশস্ততা এবং গভীরতা অনুযায়ী ঐ পানি ধারণ করে। আর মানুষও তার অন্তরের শক্তি অনুযায়ী পবিত্র কোরআন থেকে ফয়েজ হাসিল করে। এমনিভাবে দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে এরশাদ হয়েছে, যে কোন ধাতু যথা স্বর্ণ রৌপ্য দ্বারা অলংকার বা তৈজষপত্র প্রস্তুত করতে হলে

তাকে আগুনে পোড়ানো হয়, যে কারণে তার ভেতরের আবর্জনা উপরে ভেসে ওঠে, কিছুক্ষণ পর তা শুকিয়ে যায়, যা মানুষের প্রয়োজনীয় তা থেকে যায়। আর ফেনা বা আবর্জনা উধাও হয়ে যায়। এভাবে সত্য-অসত্যের তথা হক্ব ও বাতিলের মোকাবেলায় প্রথমে বাতিলের আবর্জনা দেখতে পাওয়া যায়।

আল্লামা এবনে কাসীর (রহঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াতের প্রথম দৃষ্টান্তটি সে সব লোকদের ব্যাপারে দেয়া হয়েছে যাদের আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ একীন এবং বিশ্বাস থাকে এবং যারা আল্লাহ পাকের দ্বীনের এলম রাখে। তবে কোন কোন অন্তরে সন্দেহ থাকে কিন্তু সন্দেহ সহ কোন নেক আমল আল্লাহ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য হয়না। এজন্যে একীন হলো আমলের কবুলিয়তের জন্যে পূর্বশর্ত।

یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم

جہاد زندگ مین یہ ہیں مردون کی شمشرین

"সুদৃঢ় বিশ্বাস, অব্যাহত সাধনা এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পরিপূর্ণ ভালবাসা-জীবন সংগ্রামে এসবই হলো মর্দে মোমেনের হাতিয়ার"।

আল্লামা এবনে কাসীর (রহঃ) এ পর্যায়ে বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে এলম এবং হেদায়েত দিয়ে আল্লাহ পাক আমাকে প্রেরণ করেছেন তার দৃষ্টান্ত হলো সেই বৃষ্টির ন্যায় যা জমিনের উপর পতিত হয়, জমিনের এক অংশ তাকে গ্রহণ করে এবং তার ফলে জমিনে ফলমুল উৎপন্ন হয়। আর জমিনের কোন কোন অংশ পানিকে ধারণ করে রাখে, আল্লাহ পাক তার দ্বারাও মানুষকে উপকৃত হওয়ার তওফিক দান করেন। মানুষ ঐ পানি পান করে এবং মানুষের ফসলের উৎপন্ন করার কাজেও তা ব্যবহৃত হয়। জমিনের কিছু অংশ অত্যন্ত শক্ত, ফলে পানিকে সে ধারণ করে না আর পানির অভাবে সে অংশে কোন কিছু উৎপন্নও হয় না। এ দৃষ্টান্ত হলো সে ব্যক্তির যে এলম হাসিল করেছে তথা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করেছে, আমার আবির্ভাবের কারণে আল্লাহ পাক তাকে উপকৃত করেছেন, সে নিজেও জ্ঞান অর্জন করেছে, নিজে শিখেছে অন্যকে শিখিয়েছে। আর যারা দ্বীনি এলম হাসিল করেনি, দ্বীনের দাওয়াত গ্রহণ করেনি, আমি যে হেদায়েত নিয়ে প্রেরিত হয়েছি তা কবুল করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত হলো জমিনের শক্ত অংশের।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার এবং তোমাদের দৃষ্টান্ত হলো সে ব্যক্তির ন্যায় যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করলো, যখন চতুর্দিক আলোকিত হলো তখন পোকাগুলো নিজেদেরকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করে প্রাণ দিতে লাগলো। ঐ ব্যক্তি অনেক চেষ্টা করলো কিন্তু পোকাগুলো বিরত হলোনা; বরং পোকাগুলো অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়ে ধ্বংস হতে লাগলো। ঠিক আমার এবং তোমাদের

দৃষ্টান্তও তাই। আমি তোমাদের কোমরে হাত দিয়ে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হতে তোমাদেরকে বাধা দেই কিন্তু তোমরা আমার কথা শ্রবণ কর না, আমার হাত থেকে ছুটে গিয়ে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হতে থাক।[১]

لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنٰى ط

এ আয়াতে ভাল মন্দ বা নেক ও বদ কার্যের পরিণতি ঘোষণা করা হয়েছে, যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে এবং ঈমান অনুযায়ী জীবন গড়ে তোলে তথা আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে সম্বল সংগ্রহ করে, আখেরাতের চির সুখ, চির শান্তি, চির কল্যাণ শুধু তাদেরই প্রাপ্য।

পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনেনা, তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসারী হয়না, আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়ে জীবন যাপন করে, আল্লাহ পাকের বিধান নিয়ে বাড়াবাড়ি করে, আল্লাহ পাকের নেয়ামত নিয়ে কাড়াকাড়ি করে, হালাল ও হারামের মধ্যে কোন পার্থক্য করেনা, দুনিয়ার এ জীবনে তারা যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে তাদের কঠিন কঠোর শাস্তি অবধারিত। ঈমান ব্যতীত আখেরাতে নাজাতের কোন পথ নেই। নেক আমল ব্যতীত শান্তি ও কল্যাণ লাভের কোন পন্থা নেই। তাই আখেরাতের মহাবিপদ থেকে উদ্ধার লাভের জন্যে যদি তারা সমগ্র বিশ্বের সকল সম্পদ ও তার দ্বিগুণ পরিমাণও ব্যয় করতে ইচ্ছুক হয় তবু তাদের রক্ষা নেই।

اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْحِسَابِ

অর্থাৎ তাদের হিসাব হবে অত্যন্ত কঠিন কঠোর, প্রত্যেকটি কথা এবং কাজের হিসাব হবে, আর তাদের ঠিকানা হবে দোজখ আর তা অত্যন্ত মন্দ ঠিকানা।

ইব্রাহীম নখয়ী (রঃ) বলেছেনঃ কঠিন হিসাবের তাৎপর্য হলো হিসাব গ্রহণে তাদের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করা হবে এবং তাদের কোন গুণাহ মাফ করা হবে না।[২]

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ এ আয়াতে নেককার, বদকার উভয় দলের পরিণাম ঘোষিত হয়েছে। যারা আল্লাহ পাকের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে তথা তওহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের প্রতি ঈমান এনেছে, সুবিচার কায়েম করেছে আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে শরীয়ত নিয়ে এসেছেন তা সঠিকভাবে অনুসরণ করেছে তাদের শুভ-পরিণতি সুনিশ্চিত।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ শুভ-পরিণতি হলো জান্নাত। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহর বিধান অমান্য করে, তাঁর একত্ববাদে ঈমান আনে না তারাই বদকার, তাদের শোচনীয় পরিণাম সম্পর্কে একাধিক শাস্তির ঘোষণা রয়েছে।

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু), পারা-১৩, পৃঃ ৩৭-৩৮
২। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ২৪৯-৫০

(১) لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا

সারা পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ এমনকি, এর দ্বিগুণও যদি তাদের শাস্তি থেকে মুক্তি লাভের জন্যে তারা ব্যয় করতে আগ্রহী হয়, তবু তারা শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে না।

(২) اُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْٓءُ الْحِسَابِ

তাদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত কঠিন হিসাব।

তাই অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ○ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ○

অর্থাৎ যারা কণা পরিমাণও নেক আমল করবে তার সওয়াব বা শুভ-পরিণতি তারা অবশ্যই দেখতে পাবে। এর পাশাপাশি যারা সামান্যতম মন্দ কাজও করবে তার শাস্তিও অবশ্যই তারা দেখতে পাবে।

(৩) وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ط

আর তাদের ঠিকানা হলো দোজখ। কেননা দোজখের শাস্তি তথা তাদের অপকর্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সম্পর্কে তারা ছিল গাফেল। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবনের আনন্দ-উল্লাসে তারা ছিল মত্ত-মুগ্ধ। তাই আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে তারা কঠিন কঠোর শাস্তি ভোগ করবে।

(৪) وَبِئْسَ الْمِهَادُ ○

আর আবাস-স্থল হিসেবে দোজখ হলো অত্যন্ত মন্দ স্থান।[১]

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৮, পৃঃ ২২৮-২৯

أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۚ
إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٩﴾ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا
يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴿٢٠﴾ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ
وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿٢١﴾ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ
وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٢﴾ جَنَّاتُ
عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۖ
وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ﴿٢٣﴾ سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا
صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٢٤﴾

তরজমা

(১৯) (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালকের তরফ থেকে আপনার প্রতি যা নাজিল হয়েছে তা যে ব্যক্তি সত্য বলে জানে, সে আর অন্ধ কি সমান হতে পারে? বস্তুতঃ যাদের বুদ্ধি আছে তারাই উপদেশ গ্রহণ করে।

(২০) যারা আল্লাহ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেনা।

(২১) আর আল্লাহ পাক যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখার নির্দেশ দিয়েছেন যারা তা অক্ষুণ্ন রাখে এবং যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং যারা কঠোর হিসাবকে ভয় করে।

(২২) আর যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সবর অবলম্বন করে এবং নামাজ কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিয্ক দান করেছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, আর যারা মন্দের উত্তরে ভালই করতে থাকে তাদের জন্যেই রয়েছে আখেরাতের ঘর, শুভ-পরিণতি।

(২৩) (আর তা হলো) চিরস্থায়ী জান্নাত তারা তাতে প্রবেশ করবে আর তাদের পিতা-মাতা, পিতামহ, পতি-পত্নী এবং সন্তান-সন্তুতির মধ্যে যারা নেক আমল করেছে তারাও (ঐ জান্নাতে প্রবেশ করবে) আর ফেরেশতাগণ তাদের নিকট উপস্থিত হবে প্রত্যেকটি দ্বার দিয়ে।

(২৪) এবং তারা বলবে, তোমরা সবর অবলম্বন করেছ বলেই তোমাদের প্রতি শান্তি (তোমাদের প্রতি সালাম) কত ভাল এই পরিণাম!

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে হক্ব ও বাতিলের পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে এবং নেককারদের শুভ-পরিণতি এবং বদকারদের শোচনীয় পরিণামও ঘোষণা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে মোমেনকে চক্ষুষ্মান এবং বুদ্ধিমান বলা হয়েছে আর কাফেরকে অন্ধ ও নির্বোধ বলা হয়েছে। এরপর বুদ্ধিসম্পন্নদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। এর সঙ্গে একথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে, যারা বুদ্ধিমান তারাই উপদেশ গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে, যারা নির্বোধ তারা উপদেশ গ্রহণ করেনা, সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে তথা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনেনা। এরশাদ হয়েছেঃ

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ

যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ পাকের প্রতি, তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং একথা বিশ্বাস করে যে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি যা নাজিল হয়েছে তা সম্পূর্ণ সত্য, এ ব্যক্তি কি সে ব্যক্তির সমান হতে পারে? যে অন্ধ, যার বিবেক-বুদ্ধি বলতে কিছুই নেই, যে ভাল এবং মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেনা। কোন দিনও উভয়ে সমান হতে পারেনা তাই মোমেন ও কাফের কখনও এক সমান হতে পারেনা। এজন্যেই পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছেঃ

لَا يَسْتَوِىٓ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ

অর্থাৎ দোজখী ও বেহেশতবাসীগণ কখনও সমান হতে পারেনা। একজন নির্বোধ আর একজন বুদ্ধিমান, একজন অন্ধ আর একজন চক্ষুষ্মান, একজনের নিকট ঈমানের আলো রয়েছে আর একজন গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন রয়েছে। অতএব, আলো-আঁধার যেমন এক সমান হয়না, তেমনি মোমেন ও কাফের কখনো এক সমান হতে পারেনা।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে যাকে চক্ষুষ্মান এবং বুদ্ধিমান বলা হয়েছে তিনি হলেন হযরত হামজা (রাঃ) অথবা হযরত আম্মার এবনে ইয়াসের (রাঃ) আর যাকে নির্বোধ এবং অন্ধ বলা হয়েছে সে হলো আবু জেহেল।[১]

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ

"আর বুদ্ধিমান লোকেরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে"।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ২৫০

বুদ্ধিমান লোকদের বৈশিষ্ট্য

الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ

যারা আল্লাহ পাককে দেয়া অঙ্গীকার পূর্ণ করে অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম দিন সমগ্র মানব জাতি থেকে আল্লাহ পাক তাঁর রবুবিয়্যতের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন এবং জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তখন সমগ্র মানব জাতি অঙ্গীকার করেছিল, হ্যাঁ ইয়া রব। তুমি অবশ্যই আমাদের প্রতিপালক। এ অঙ্গীকার যারা পূর্ণ করে তথা স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের যাবতীয় বিধান যারা মেনে চলে তারাই প্রকৃত অবস্থায় বুদ্ধিমান আর এটিই হলো বুদ্ধিমানদের প্রথম বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য

وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ ○

অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকার বা আল্লাহর বন্দাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেনা। এখানে উল্লেখ্য, প্রথম বৈশিষ্ট্য হিসেবে (الَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ) শুধু আল্লাহ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকারের কথা ছিল। আর আলোচ্য বাক্যে আল্লাহ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকারের পাশাপাশি মানুষের সাথে কৃত অঙ্গীকারের কথাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

তৃতীয় বৈশিষ্ট্য

وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ أَنْ يُّوْصَلَ

অর্থাৎ যে সম্পর্ককে অক্ষুণ্ন রাখার আদেশ দিয়েছেন আল্লাহ পাক, যারা সে সম্পর্ককে অক্ষুণ্ন রাখে তথা আত্মীয়-স্বজনকে যারা সাহায্য-সহায়তা করে, তাদের দুঃখ নিবারণে সচেষ্ট থাকে এবং তাদের প্রতি ভাল ব্যবহার করে।

তফসীরকারগণ লিখেছেন, সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম ও সমস্ত আসমানী গ্রন্থের উপর ঈমান আনা এবং সকল মোমেনের সাথে ভাল ব্যবহার করা এ বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। তবে অধিকাংশ তফসীরকারগণ বলেছেন, এ আয়াতের মর্মকথা হলো সেলায়ে রহমী তথা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা, তাদের প্রতি এহসান করা, এটি বুদ্ধিমান লোকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

হযরত আবদুর রহমান এবনে আওফ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি স্বয়ং শ্রবণ করেছি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ "আমিই আল্লাহ, আমিই রহমান, আমিই সৃষ্টি করেছি "রহম", আমার নাম "রহমান" থেকেই রহমকে নিঃষ্পন্ন করেছি। যে এ সম্পর্ককে ধরে রাখবে আমিও তাকে আমার সাথে জুড়ে রাখব। আর যে এ সম্পর্ককে ছিন্ন করবে আমিও তার সাথে সম্পর্ককে ছিন্ন করব।

হযরত আবদুর রহমান এবনে আওফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন তিনটি জিনিস আরশের নীচে থাকবে। (১) পবিত্র কোরআন (২) আমানত (৩) রহম।

(পবিত্র কোরআন বন্দাদের থেকে অথবা বন্দাদের পক্ষ থেকে দাবী উত্থাপন করবে। অর্থাৎ যে পবিত্র কোরআনের হক্ব আদায় করবে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে পবিত্র কোরআন তার নাজাতের আরজী পেশ করবে। পক্ষান্তরে, যে কোরআনে করীমের হক্ব আদায় করেনি; তার বিরুদ্ধে পবিত্র কোরআন কথা বলবে।)

আর রহম তথা আত্মীয়-স্বজনের সম্পর্কের দাবী ঘোষণা করবে। ভাল করে শুনে নাও, যে আমাকে জুড়ে রেখেছে, অর্থাৎ যে আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভাল সম্পর্ক রেখেছে, তাদের হক্ব আদায় করেছে, আল্লাহ পাক তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন। আর যে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, তথা আত্মীয়-স্বজনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবেনা, আল্লাহ পাক তার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবেন। (বগভী)

হযরত আনাস এবনে মালেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরজ করলো, আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যা আমাকে জান্নাতের নিকটবর্তী করবে এবং দোজখ থেকে দূরে রাখবে। তিনি এরশাদ করেনঃ আল্লাহর বন্দেগী কর। কোন কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করোনা, নামাজ কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখ (অর্থাৎ-আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ভাল ব্যবহার কর)। (বগভী)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর এবনুল আস (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছনঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ়কারী সে ব্যক্তি নয়, যে পরস্পরকে সমান বদলা দেয়; বরং আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ়কারী সে ব্যক্তি যে কোন আত্মীয়ের পক্ষ থেকে আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্ট করা হয়, বা কোন আত্মীয় তার সঙ্গে সম্পর্ক বিনষ্ট করতে প্রয়াসী হয় এমন অবস্থায় সে ঐ সম্পর্ককে বজায় রাখে এবং সুদৃঢ় করে। (বোখারী)

হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ! (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমার পক্ষ থেকে ভাল ব্যবহারের সর্বাধিক উপযুক্ত কে?

তিনি এরশাদ করলেন, তোমার মা।

সে আরজ করলো, এরপর?

তিনি এরশাদ করলেন, তোমার মা। সে পুনরায় আরজ করলো, এরপর কে? তিনি এরশাদ করলেন, তোমার মা। সে আরজ করলো, এরপর কে? তিনি এরশাদ করলেন, তোমার পিতা। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তোমার পিতা বলার পর এরশাদ করেছেনঃ এরপর তোমার আত্মীয়-স্বজন আত্মীয়তার নৈকট্য অনুযায়ী।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ পিতার সঙ্গে এটিও ভাল ব্যবহার যে তুমি পিতার মৃত্যুর পর তার বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে। (মুসলিম)

হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমার বংশ সম্পর্কে অবগত হও, যাতে করে তোমার আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে ভাল সম্পর্ক রাখতে পার। আত্মীয়-স্বজনের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখলে (তাদের প্রতি এহসান করলে রিয্ক বাড়ে এবং বয়সে বরকত হয়)। (তিরমিজী)

চতুর্থ বৈশিষ্ট্য وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ

"আর যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করতে থাকে", যেন কোন কাজ তাঁর মর্জির খেলাফ না হয়।

পঞ্চম বৈশিষ্ট্য وَيَخَافُونَ سُوْءَ الْحِسَابِ

অর্থাৎ তারা আখেরাতের কঠিন হিসাব-নিকাশকে ভয় করে। কেননা, অবশেষে প্রত্যেককে কেয়ামতের দিন জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের জন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হিসাব দিতে হবে।

ষষ্ঠ বৈশিষ্ট্য وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ

আর যারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সবর অবলম্বন করে তথা আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালনে সুদৃঢ় থাকে। এ অর্থ বর্ণনা করেছেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)। আতা (রহঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো যারা বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করে। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর অর্থ যারা কু-প্রবৃত্তির তাড়নায় মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকে আর তাদের এ বিরত থাকা আর সবর করার উদ্দেশ্য হলো একমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ। আত্ম প্রচার বা খ্যাতি লাভের উদ্দেশে নয়, অর্থ-সম্পদ বা ক্ষমতা লাভের লক্ষ্যে নয়; বরং শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে।

সপ্তম বৈশিষ্ট্য وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ

আর যারা নামাজ কায়েম করে অর্থাৎ সঠিক ভাবে নামাজ আদায় করে তথা নামাজের হক্ব আদায় করে।

অষ্টম বৈশিষ্ট্যঃ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ

আর যারা আল্লাহর রাহে ব্যয় করে, আল্লাহ্ পাক যে রিয্ক তাদেরকে দান করেছেন তা থেকে কিছু অংশ ফরজ যাকাত হিসাবে, অথবা নফল সদকা হিসাবে আল্লাহর রাহে গোপনে বা প্রকাশ্যে ব্যয় করে।

নবম বৈশিষ্ট্য وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ

আর যারা নেক আমলের মাধ্যমে মন্দ কাজের ক্ষতিপূরণ করে।

অর্থাৎ কোন মন্দ কাজ হয়ে গেলে তার জন্যে অনুতপ্ত হয়ে অধিক পরিমাণে নেক আমল করে। যাতে করে মন্দ কাজের ক্ষতিপূরণ হয়। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) আলোচ্য বাক্যের এ ব্যাখ্যা করে পবিত্র কোরআনের এ আয়াত তেলাওয়াত করেছেনঃ

إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ

"নিশ্চয় নেকী সমূহ গুণাহগুলোকে দূরীভূত করে"।

হযরত আবুজর (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যখন তোমার দ্বারা কোন গুণাহর কাজ হয়ে যায় তখন সাথে সাথে কোন নেক আমল কর, তবে ঐ নেক আমল গুণাহকে দূরীভূত করবে। এবনে আসাকের আমর এবনে আস্ওয়াদ বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যখন তোমার দ্বারা দশটি গুণাহর কাজ হয়ে যায় তখন একটি নেক আমল কর, যার কারণে গুণাহ দূরীভূত হয়। এবনে কাইসান এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে–আলোচ্য আয়াতের "হাসানা" শব্দটির অর্থ হলো তওবা, অর্থাৎ যারা কোন গুণাহ হয়ে গেলে তওবা করে ফেলে এবং তওবার মাধ্যমে গুণাহকে দূরীভূত করে।

ইমাম আহমদ (রঃ) আতা (রঃ)-এর সূত্রে একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যখন তুমি কোন গুণাহ কর তখন সঙ্গে সঙ্গে তওবা কর।[১] যে গুণাহ গোপনে হয়েছে তার তওবা হবে গোপনে, আর যে গুণাহ প্রকাশ্যে হয়েছে তার তওবাও হবে প্রকাশ্যে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ আয়াতের অর্থ হলো যারা মন্দ ব্যবহারের জবাবে মন্দ ব্যবহার করেনা; বরং মন্দের প্রতি-উত্তরে ভাল ব্যবহার করে। যারা মূর্খতাপূর্ণ ব্যবহার করে তাদের মন্দ আচরণে তারা সবর অবলম্বন করে। সুদ্দী (রঃ) এবং কাতাদা (রাঃ) এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। যেমন পবিত্র কোরআনের সূরায়ে ফোরকানে এরশাদ হয়েছেঃ

وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُونَ قَالُوا سَلٰمًا ○

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ২৫৩

যখন মূর্খ লোকেরা তাদেরকে সম্বোধন করে কিছু বলে, তারা জবাবে "সালাম" বলে বিদায় নেয় তথা মন্দ আচরণের প্রতিশোধ নেয়না; বরং সালাম বলে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখে।

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ

অর্থাৎ যারা শুধু এক আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে সবর অবলম্বন করে।

সবরের অর্থ

সবর অর্থ শুধু কোন বিপদাপদে ধৈর্য্য ধারণ করাই নয়; বরং নিজের মতের বিরোধী কথাবার্তার কারণে অস্থির ও পেরেশান না হওয়াও এর অন্তর্ভুক্ত।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ সবরের দু' প্রকার বর্ণনা করেন, একটি হলো আল্লাহ্ পাকের বিধি-নিষেধ পালনে সুদৃঢ় থাকা, এ পর্যায়ে যত প্রকার কষ্ট হয় তা সহ্য করা এবং যে কোন ক্ষতির আশংকা থাকলে তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা।

দ্বিতীয়তঃ নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, আল্লাহ্ পাকের নাফরমানীর কাজ যত লোভনীয় এবং আকর্ষণীয়ই হোক না কেন তা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা।

وَ الَّذِيْنَ صَبَرُوا

আর যারা সবর অবলম্বন করে, তথা যারা উপরোল্লিখিত গুণাবলীর অধিকারী হয়।

ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ

কথা এখানেই শেষ নয়, বরং এসব হতে হবে শুধু আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কেননা, যদি আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সবর না হয় তবে এর কোন গুরুত্ব নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই সবর আসে। এমন সবরের কোন গুরুত্ব নেই। আর যে সবর অনিচ্ছাকৃত হয়, তার কোন ফজিলতও নেই।[১]

আল্লামা শিব্বীর আহমদ ওসমানী (রঃ) এ পর্যায়ে লিখেছেনঃ এ সবর হতে হবে শুধু আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, এজন্যে নয় যে লোকেরা তাকে ধৈর্য্য ও সহনশীলতার প্রতীক বলে সুনাম করবে, আর এজন্যেও নয় যে সবর অবলম্বন ব্যতীত কোন গত্যন্তরই ছিল না অতএব, বাধ্য হয়ে সবর করতেই হয়েছে, বরং সবর করতে হবে শুধু আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের মহান উদ্দেশ্যে, তাতে যত ক্ষতিই হোক না কেন তা বরদাশত করবে, এমন অবস্থায় আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে সবরের ফজিলত ও মাহাত্ম অপরিসীম।[২]

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত মুফতী শফী সাহেব (রঃ), খন্ড-৫, পৃঃ ১৭৯ ((মাকতাবা মুস্তাফাইয়া কর্তৃক প্রকাশিত)
২। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃঃ ৩১৩
ইউনিভার্সিটি প্রেস, জুলবুমা, পশ্চিম জার্মানী

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেনঃ যারা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সওয়াব লাভের আশায়, নিজেদেরকে পাপাচার থেকে বিরত রাখে, এভাবে সবর অবলম্বন করে।

وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ

অর্থাৎ যারা নামাজের যাবতীয় শর্তসমূহ পালন করে, যথা সময়ে যথা নিয়মে নামাজ আদায় করে ভীত-সন্ত্রস্ত এবং বিনীত হয়ে।

وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ

অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাকের প্রদত্ত রিযক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহর রাহে ব্যয় করে।

এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, পৃথিবীতে যার কাছে যা আছে সবই আল্লাহ পাকের প্রদত্ত, আর তা থেকে সামান্য অংশ (আড়াই শতাংশ) ব্যয় করা কোন অবস্থাতেই কষ্টকর হওয়া উচিত নয়।

سِرًّا وَّعَلَانِيَةً

অর্থাৎ আল্লাহর রাহে দান গোপন ও প্রকাশ্য উভয় অবস্থাতেই করা যেতে পারে তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেনঃ ফরজ, ওয়াজিব, সদকাহ, যাকাত, ফেতরা প্রকাশ্যেই করা উত্তম, তবে নফল সদকাহ গোপনে করা ভাল। কোন কোন হাদীসে গোপনে সদকাহ করার ফজিলত বর্ণিত হয়েছে।

وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ

অর্থাৎ যারা মন্দ আচরণের জবাবে ভাল আচরণ করে, শত্রুতার জবাবে বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করে, জুলুমের জবাব দেয় ক্ষমা ও ঔদার্য দ্বারা।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী আলোচ্য আয়াতের এ অর্থও করেছেনঃ যারা গুণাহ ও মন্দ কাজের সঙ্গে সঙ্গে ভাল কাজ তথা নেক কাজ করে, অর্থাৎ কারো দ্বারা যদি কোন গুণাহর কাজ হয়ে যায়, তখন সে অনতিবিলম্বে আল্লাহ পাকের এবাদতে মশগুল হয়ে যায়, কেননা হাদীস শরীফে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত মাআজ (রাঃ)-কে ওসিয়ত করে এরশাদ করেছেনঃ মন্দ কাজের পরই নেক কাজ কর, তা হলে তা মন্দ কাজের গুণাহকে দূরীভূত করে দেবে।

কোন গুণাহ হয়ে গেলে যদি মানুষ লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমাপ্রার্থী হয়, নেক আমল করে, তবে আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করেন।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেনঃ যারা মন্দ আচরণের জবাবে ভাল ব্যবহার করে, যখন তাদেরকে কোন লোক কষ্ট দেয়, তখন তারা সবর অবলম্বন করে, তাদেরকে ক্ষমা করে, যেমন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ

করেছেন

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

অর্থাৎ যে তোমার সাথে মন্দ ব্যবহার করে, তুমি তার সাথে ভাল ব্যবহার কর, তাহলে যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিল সে-ও তোমার বন্ধুতে পরিণত হবে।[১]

أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ

উপরোল্লিখিত গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্য সমূহ যাদের মধ্যে থাকবে, তারাই হবে সে সব লোক যাদের জন্যে রয়েছে আখেরাতের গৃহ, আখেরাত তথা পরকালীন জিন্দেগীর অনন্ত অসীম নেয়ামত তারাই ভোগ করবে, চিরশান্তি, চিরসাফল্য তারাই লাভ করবে।

ইমাম আহমদ (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর এবনুল আস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

هل تدرون اول من يدخل الجنة من خلق الله

অর্থাৎ তোমরা কি জান আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্ব প্রথম জান্নাতে কে প্রবেশ করবে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেনঃ আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূলই ভাল জানেন। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ সর্ব প্রথম জান্নাতে দরিদ্র মোহাজেরগণ প্রবেশ করবে, যাদের দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত সংরক্ষণ করা হয় এবং যাদের মৃত্যু হয় এ অবস্থায় যে, তাদের প্রয়োজনের কথা তাদের মনেই থেকে যায়, যার আয়োজন করা হয়না। তখন আল্লাহ পাক তাঁর ফেরেশতাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে আদেশ দেবেন যে, তাদের নিকট যাও এবং তাদেরকে সালাম জানাও। ফেরেশতাগণ আরজ করবেনঃ হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমরা তোমার এমন সৃষ্টি যাদেরকে তুমি আসমানের অধিবাসী করেছ এবং তোমার সৃষ্টির মধ্যে আমরা নির্বাচিত। আমাদের প্রতি কি আদেশ হচ্ছে যে, আমরা তাঁদের নিকট হাযির হই এবং তাঁদেরকে সালাম পেশ করি? তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ এরা আমার এমন বন্দা যারা শুধু আমার বন্দেগী করতো, কোন অবস্থাতেই আমার সাথে শেরক করতো না এবং তাদের দ্বারাই ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত সংরক্ষণ করা হতো এবং তাদের দ্বারাই মন্দ কাজ থেকে আত্মরক্ষা করা হতো, আর তাদের কারো মৃত্যু হতো এমন অবস্থায় যে, তাদের অন্তরে কোন প্রয়োজনের কথা থাকতো কিন্তু সে তা পূর্ণ করতে পারতো না। তিনি বলেন, তখন ফেরেশতাগণ বেহেশতের প্রত্যেক দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে বেহেশতবাসীগণকে সালাম দিয়ে মোবারকবাদ জানাবে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَالْمَلَٰئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ

"ফেরেশতাগণ বেহেশতের প্রত্যেক দ্বার দিয়ে প্রবেশ করবে (এবং বলবে) তোমাদের

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ২৫৮

প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক এজন্যে যে, তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) সবর অবলম্বন করেছিলে। কত উত্তম আখেরাতের আবাস্থল"![1]

আবুল কাসেম তেবরানী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ প্রথম যে তিন দল লোক বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে, তারা হলো দরিদ্র মোহাজেরগণ, যাঁদের মাধ্যমে মন্দ কাজ থেকে আত্মরক্ষা করা হতো। আর যখন তাদেরকে আদেশ দেয়া হতো তখন তারা শ্রবণ করতো এবং আনুগত্য প্রকাশ করতো, যদি সে যুগের রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট তার কোন প্রয়োজন থাকে, তবে মৃত্যু পর্যন্ত এ প্রয়োজনের আয়োজন করা হতো না। এ প্রয়োজনের কথা তার মনেই থেকে যেতো। আর কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক জান্নাতকে ডাক দেবেন। জান্নাত তার যাবতীয় সৌন্দর্যসহ হাযির হবে। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ

"আমার সেই বন্দাগণ কোথায়? যারা আমার পথে জেহাদ করেছে, যাদেরকে আমার পথে কষ্ট দেয়া হয়েছে। তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর"।

وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن
بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ
فِي الْأَرْضِ ۙ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٢٥﴾ اللَّهُ يَبْسُطُ
الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا الْحَيَاةُ
الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ﴿٢٦﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ
عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي
إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ﴿٢٧﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ
أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ﴿٢٩﴾

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (আরবী), খন্ড-২, পৃঃ ২৭৯

তরজমা

(২৫) আর যারা আল্লাহ্ পাকের সাথে সুদৃঢ় অঙ্গীকার করার পরও তা ভঙ্গ করে এবং আল্লাহ পাক যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে আর দুনিয়াতে অশান্তি সৃষ্টি করে তাদের জন্যে রয়েছে আল্লাহর লা'নত এবং তাদের জন্যে আছে মন্দ আবাস।

(২৬) আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা তার জন্যে রিযূক বৃদ্ধি করে দেন আর যার জন্যে ইচ্ছা তা সংকীর্ণ করে দেন। কিন্তু তারা পার্থিব জীবন নিয়ে মেতে রয়েছে অথচ আখেরাতের তুলনায় এ জীবন অত্যন্ত তুচ্ছ এবং ক্ষণস্থায়ী ভোগ-সম্পদ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

(২৭) আর কাফেররা বলে তার প্রতিপালকের নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হয়না? (হে রসূল!) আপনি বলে দিন, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন, আর যে তার দিকে মনোনিবেশ করে তিনি তাকে পথ প্রদর্শন করেন।

(২৮) যারা ঈমান এনেছে আর আল্লাহ্ পাকের স্মরণে যাদের মন প্রশান্ত হয়, মনে রেখো শুধু আল্লাহ্ পাকের স্মরণেই (মানব) মন সান্ত্বনা লাভ করে থাকে।

(২৯) যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে কল্যাণ এবং শুভ পরিণতি তাদেরই জন্যে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে বুদ্ধিমানদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে, আর আলোচ্য আয়াতে যারা নির্বোধ তাদের নিদর্শনগুলো এরশাদ হয়েছে। যেমন তারা আল্লাহ্ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করেনা, আল্লাহ্ পাক যে সম্পর্ককে অক্ষুন্ন রাখার নির্দেশ প্রদান করেছেন তারা সে সম্পর্ককে ছিন্ন করে এবং তারা পৃথিবীতে অশান্তি, ফেৎনা–ফ্যাসাদ এবং উপদ্রব সৃষ্টি করে থাকে। নিজেদের প্রতি এবং অন্যান্যদের প্রতিও তারা জুলুম-অত্যচার করতে কুণ্ঠিত হয় না। তাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের লা'নত হয়ে থাকে তথা আল্লাহর রহমত থেকে তারা বিতাড়িত এবং বঞ্চিত হয়ে থাকে। তাই সর্বাপেক্ষা জঘন্য এবং নিকৃষ্ট স্থানেই হয় তাদের ঠিকানা।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আখেরাতে নাফরমানদের জন্যে যে শাস্তি রয়েছে তাতো আছেই, এতদ্ব্যতীত যে গুণাহর শাস্তি আল্লাহর তরফ থেকে দুনিয়াতেই হয়ে থাকে তা হলো বিদ্রোহ এবং আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সৌজন্যমূলক ব্যবহার না করা। শাস্তিকে অধিকতর তরান্বিতকারী এতদ্ব্যতীত কোন গুনাহ নেই। (আহমদ, বোখারী, আবু দাউদ, তিরমিজী, এবনে মাজাহ্)

আত্মীয়তার সম্পর্কের গুরুত্ব

হযরত জোবায়ের এবনে মাতআম (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট নিজেই শুনেছি, তিনি এরশাদ করেছেনঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক

ছিন্নকারী ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আবি আওফা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি, সে সব লোকদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের রহমত নাজিল হয়না যাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্টকারী থাকে। (বায়হাকী)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কারো উপকার করে যে তার উপকারের কথা ঐ ব্যক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয় সে জান্নাতে যাবেনা। পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তানও জান্নাতে যাবেনা। আর যে সর্বদা নেশাগ্রস্ত থাকে সে-ও জান্নাতে যাবেনা। (নেসায়ী, দারমী)[১]

এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ পূর্ববর্তী আয়াতে যারা নেককার ও ভাগ্যবান তাদের গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে, আর আলোচ্য আয়াতে যারা পাপীষ্ঠ এবং হতভাগা তাদের অবস্থার বিবরণ স্থান পেয়েছে। তারা আল্লাহ্ পাকের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করেনা। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে তারা সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেনা। আল্লাহ্ পাকের বিধি-নিষেধ পালন করেনা, এরাই অভিশপ্ত। এদের পরিণতি ভয়াবহ।[২]

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ وَفَرِحُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۗ
وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ○

"আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে স্বচ্ছল জীবিকা দান করেন, আর যাকে ইচ্ছা তার রিয্ক সংকীর্ণ করে দেন। তারা এ পার্থিব জীবন নিয়ে মেতে রয়েছে, অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার এ জীবন অত্যন্ত তুচ্ছ এবং ক্ষণস্থায়ী ভোগ-সম্পদ ব্যতীত তার কিছুই নয়"।

যেহেতু পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, যারা আল্লাহ পাকের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তারা দুনিয়াতে হয় অভিশপ্ত, আর আখেরাতে তাদের শাস্তি হবে অবধারিত। এমন অবস্থায় প্রশ্ন হতে পারে যে, তাহলে কাফেররা আল্লাহর কোন নেয়ামত পাবেনা, নেয়ামতের দ্বার তাদের জন্যে থাকবে রুদ্ধ অথচ বাস্তব অবস্থা এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। দুনিয়াতে কাফেররা আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করে চলেছে। মানব মনের এ প্রশ্নের জবাবেই আল্লাহ্ পাক আলোচ্য আয়াতে এরশাদ করেছেন, পৃথিবীতে কারো রিয্ক বৃদ্ধি করা বা কম করা–এটি নিতান্তই আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছাধীন। এর সাথে ঈমান ও কুফরীর কোন সম্পর্ক নেই। এমন অবস্থা অহরহ পরিলক্ষিত হয় যে, কাফেরের নিকট সম্পদ থাকে আর মোমেন হয় দারিদ্র্য-প্রপীড়িত। আর ক্ষেত্রবিশেষে অন্য রকমও হয়। মূলতঃ পৃথিবী হলো পরীক্ষাগার। আল্লাহ্ পাক কোন বন্দাকে সম্পদ দান করে

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ২৫৮
তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু), পারা-১৩, পৃঃ ৪১

পরীক্ষা করেন। আর একখানি হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, দুনিয়ার নেয়ামত আল্লাহ পাক মোমেন-কাফের উভয়কেই দান করে থাকেন, কিন্তু আখেরাতের নেয়ামত শুধু মোমেনগণকেই দান করা হবে।

وَفَرِحُوا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ط وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ۝

"আর কাফেরেরা দুনিয়ার জীবন নিয়েই মুগ্ধ, অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার এ জীবন অত্যন্ত তুচ্ছ"।[১]

আল্লামা' এবং কাসীর (রঃ) এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ মোমেনগণকে আখেরাতে যে নেয়ামত দান করা হবে তার তুলনায় দুনিয়া অতি তুচ্ছ, আখেরাত হলো উত্তম এবং চিরস্থায়ী। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর শাহাদতের আঙ্গুলের দিকে ইঙ্গিত করে এরশাদ করেছেন, এ অঙ্গুলিটিকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দেখ সমুদ্রের পানির তুলনায় আঙ্গুলে কতখানি পানি আসে। আখেরাতের তুলনায় দুনিয়া এতখানি। (মুসলিম শরীফ)

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পথিপার্শ্বে একটি মৃত বকরী পড়ে থাকতে দেখে এরশাদ করেনঃ এ মৃত বকরীটি যেমন তার মালিকের নিকট মূল্যহীন এবং গুরুত্বহীন ঠিক তেমনিভাবে সারা পৃথিবী আল্লাহ পাকের নিকট সম্পূর্ণ মূল্যহীন।[২]

وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اٰيَةٌ

"আর কাফেররা বলে, "তার প্রতিপালকের তরফ থেকে কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হয় না"?

কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতো, যদি আপনি প্রকৃত সত্য রসূল হন তবে হযরত মুসা (আঃ) এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর ন্যায় কোন অলৌকিক কিছু প্রদর্শন করুন। তাদের একথার জবাবেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَآءُ

(হে রসূল!) আপনি বলুন, আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে পথভ্রষ্ট করেন, আর যে তাঁর দিকে মনোনিবেশ করে তাকে হেদায়েত করেন। নিশ্চয় আল্লাহ পাক অনেক বিস্ময়কর, অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ করেছেন। কিন্তু যে কথা বিশেষভাবে তোমাদের মনে রাখতে হবে তা হলো হেদায়েত এবং পথভ্রষ্টতা এক আল্লাহ পাকেরই হাতে। তাই তিনি এত অলৌকিক ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করাবার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও তোমাদেরকে তা থেকে বঞ্চিত

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৯, পৃঃ ৪৬
২। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৮, পৃঃ ৪৭

রেখেছেন। আর অন্য সম্প্রদায়কে হেদায়েত লাভের তওফিক দান করেছেন। তাই তারা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের দাবীর সত্যতা উপলব্ধি করেছে।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ মুশরেকরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছে যে, পূর্বকালের নবীগণের ন্যায় এই নবী কোন অলৌকিক ঘটনা কেন প্রদর্শন করেন না?

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এই ওহী আসে যে, কাফেরদের আবদার হলো আমি সাফা পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দেই, আরব জাহানে এমন সমুদ্র প্রবাহিত করি যার পানি হবে সুমিষ্ট, পাহাড়-পর্বত ঘেরা এই জমিনকে ফসলের উপযোগী আবাদী জমিনে রূপান্তরিত করি। কিন্তু এসব কিছু করার পরও যদি কাফেররা ঈমান না আনে তবে তাদেরকে এমন শাস্তি দেব যা ইতিপূর্বে কারো হয়নি। হে রসূল! আপনার যদি ইচ্ছা হয় তবে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করি, আর যদি ইচ্ছা করেন তবে তাদের জন্যে তওবা এবং রহমতের দ্বার উন্মুক্ত রাখি।

হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় পন্থা পছন্দ করেন।

মূলতঃ হেদায়েত এবং পথভ্রষ্টতা শুধু আল্লাহ পাকের হাতেই রয়েছে, মোজেয প্রদর্শনের উপর তা নির্ভরশীল নয়। যারা বেঈমান, যারা পথভ্রষ্ট তাদের জন্যে কোন নিদর্শনই যথেষ্ট নয়। তাদের জন্যে কোন কিছুই উপকারী হয়না, তারা নিদর্শন দেখে কিন্তু মানেনা। তবে যখন আজাব দেখে তখন তারা বিশ্বাস স্থাপনে প্রস্তুত হয় আর তখনকার ঈমান বা বিশ্বাস ফলপ্রসূ হয় না।[১]

قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ ......

(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন যে, নিশ্চয় আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে পথভ্রষ্ট করেন– অর্থাৎ হেদায়েত এবং পথভ্রষ্টতা আল্লাহ পাকেরই হাতে।

وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ۝

আর যে তাঁর দিকে মনোনিবেশ করে তথা যে ঈমান এবং আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হতে প্রয়াসী হয় তিনি তাকে হেদায়েত দান করেন।

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ

আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশকারী লোক হলো তারা, যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহর জিকরে যাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে, তাদের মনের গহনে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এবং একীন সুদৃঢ় হয় এবং সর্বপ্রকার সন্দেহ দূরীভূত হয়।

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু), পারা-১৩, পৃঃ ৪২

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে "জিকর" শব্দ দ্বারা পবিত্র কোরআনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর ঈমান হলো মনের শান্তির উপকরণ। মুনাফেকী হলো মনের অশান্তির কারণ, তাই যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে তারা শান্তি লাভ করে অথবা এর অর্থ হলো যারা আল্লাহ পাকের জিকরে মশগুল হয় তারা শয়তানের প্রতারণা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে, ফলে তারা আন্তরিক শান্তি লাভ করে।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ প্রত্যেকটি মানুষের অন্তরে দু'টি স্থান রয়েছে, একটিতে ফেরেশতা আত্মপ্রকাশ করে আর অন্যটিতে শয়তান আত্মপ্রকাশ করে। যখন মানুষ আল্লাহ পাককে স্মরণ করে তখন শয়তান পিছু হটে যায়। আর যখন মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করেনা তখন শয়তান তার ওষ্ঠদ্বয় মানব অন্তরে স্থাপন করে। এভাবে তার অন্তরে শয়তানী অসওয়াসা সৃষ্টি হয়।

মনের শান্তি আল্লাহর স্মরণে

অথবা আয়াতের অর্থ হলো, ঈমানদারগণের পবিত্র অন্তর সমূহের খাদ্য হলো আল্লাহ পাকের স্মরণ, আল্লাহ পাকের স্মরণের মাধ্যমেই মানব-অন্তর শান্তি লাভ করে-যেমন মৎস্য পানিতে, পাখি আকাশে এবং চতুঃষ্পদ জন্তু জঙ্গলে শান্তি লাভ করে।

পক্ষান্তরে, যদি আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে গাফেল হয় অথবা গাফলতের আবর্তে নিপতিত কোন ব্যক্তির সংসর্গ পায়, তবে মোমেন ব্যক্তির মনের শান্তি দূরীভূত হয়, যেমন পানি থেকে মৎস্যকে বের করা হলে মৎস্য ব্যাকুল হয়।

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ○

"সতর্ক হও, জেনে রাখ শুধু আল্লাহর স্মরণেই মানব অন্তর শান্তি লাভ করে"।

এক্ষেত্রে একটি সন্দেহের উদ্রেক হয়, আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ

"সে ব্যক্তিই মোমেন যখন তার নিকট আল্লাহর জিকর করা হয় তখন তার অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত হয়"।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে আল্লাহর জিকর দ্বারা মনে শান্তি আসে কিন্তু একই সঙ্গে মানব মনে শান্তি এবং ভয় কিভাবে একত্রিত হতে পারে? এর জবাবে তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, আজাবের কথা শ্রবণ করলে মোমেনের অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত হয় আর সওয়াবের সুসংবাদ লাভ করলে মনে শান্তি এবং সান্ত্বনা আসে, মোমেন ভয় করে আল্লাহ পাকের আজাব থেকে, আর শান্তি লাভ করে আল্লাহ পাকের দানের আলোচনায়। অতএব, শান্তির অবস্থা এবং ভয়ের অবস্থা হয় ভিন্ন ভিন্ন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, মনের শান্তি এবং ভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। তাই শান্তি এবং ভয় মানব মনে একত্রিত হতে পারে।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, একজন যুবকের মৃত্যুর সময় হযরত রসূলে করীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকট তশরিফ নিয়ে গেলেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মনের অবস্থা কি? তিনি আরজ করলেনঃ আমি আল্লাহ পাকের রহমতের আশা করি এবং আমার গুণাহর কারণে ভয়ও করি। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ এমন অবস্থায় যখন কোন বন্দার অন্তরে দু'টি কথা একত্রিত হয় তখন আল্লাহ পাক তার আশা পূর্ণ করেন আর যে বিষয়কে সে ভয় করে তা থেকে রক্ষা করেন।[১] (তিরমিজী, এবনে মাজা)

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ طُوْبٰى لَهُمْ وَحُسْنُ مَاٰبٍ

"যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে সৌভাগ্য তাদেরই, আর তাদের জন্যেই রয়েছে উত্তম ঠিকানা"।

'তুবার' ব্যাখ্যা

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) আলোচ্য আয়াতের طوبى শব্দটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো খুশি বা আনন্দ অর্থাৎ যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে তারা হবে আনন্দিত।

আর একরামা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো তাদের শুভ-পরিণতি সুনিশ্চিত।

কাতাদা (রঃ) বলেছেন, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে তাদের জন্যে রয়েছে কল্যাণ।

ইব্রাহীম (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো নেককার মোমেনদের জন্যে কল্যাণ এবং সম্মান রয়েছে।

সাঈদ এবনে জোবায়ের (রঃ) বলেছেন, আবিসিনীয় ভাষায় শব্দটির অর্থ হলো জান্নাত।

বগভী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু উমামা (রাঃ), হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) এবং হযরত আবু দরদা (রাঃ) বলেছেন, তুবা হলো জান্নাতের একটি বৃক্ষ যা সমস্ত জান্নাতের উপর ছায়া ফেলে।

ওবায়েদ এবনে ওমর বলেছেনঃ 'তুবা' হলো জান্নাতে আদনের মধ্যে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে নির্দিষ্ট একটি স্থান। একটি বৃক্ষ যার শাখাগুলো প্রত্যেক জান্নাতী মোমেনের বাড়ীর উপর ছায়া ফেলে।

মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এ বৃক্ষের প্রতিটি পাতা একদল লোকের উপর ছায়া ফেলে আর প্রত্যেক পাতার উপর একজন ফেরেশতা আল্লাহ পাকের জিকর করতে থাকে।

আহমদ, এবনে আব্বাস, তেবরানী, এবনে মরদবিয়া, বায়হাকী হযরত আতাবা এবনে আবদুল্লাহ সালমীর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এক ব্যক্তি আরজ করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ!

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ২৫৯-৬০

(সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) জান্নাতের মধ্যে কি ফল থাকবে?

তিনি এরশাদ করলেনঃ হ্যাঁ, সেখানে একটি বৃক্ষ থাকবে তার নাম হলো তুবা।

প্রশ্নকারী আরজ করলো, পৃথিবীর কোন্ বৃক্ষের সঙ্গে তার সাদৃশ্য রয়েছে? তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ এ পৃথিবীর কোন বৃক্ষর সঙ্গেই তার সাদৃশ্য নেই। তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি কি সিরিয়া গিয়েছ? সে বললো, না। এরপর তিনি এরশাদ করলেনঃ সিরিয়ায় একটি বৃক্ষ রয়েছে যাতে তুবা বৃক্ষের কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে।

প্রশ্নকারী বললোঃ বৃক্ষটি কত বড় হবে?

তিনি এরশাদ করলেনঃ যদি তুমি তোমার পরিবারবর্গের উষ্ট্রের কাফেলা নিয়ে উক্ত বৃক্ষের গোড়ায় ঘোরাফেরা কর এবং তুমি বৃদ্ধ হয়ে যাবে আর তারাও বৃদ্ধ হয়ে যাবে, তবু ঐ বৃক্ষের গোড়া একবার প্রদক্ষিণ করা সম্ভব হবে না।

প্রশ্নকারী আরজ করলো, তাতে কি আঙ্গুরও থাকবে?

তিনি এরশাদ করলেন, হ্যাঁ।

প্রশ্নকারী আরজ করলো, ঐ আঙ্গুরের দানা কত বড় হবে?

তিনি এরশাদ করলেনঃ একটি কাক এক মাস যাবত উড়ে যতখানি স্থান অতিক্রম করে তার সমান। (আল হাদীস)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, তুবা কি?

তিনি এরশাদ করলেনঃ জান্নাতের একটি বৃক্ষ (যা এতখানি স্থানে ছড়িয়ে আছে যে ১০০ বছর চলতে থাকলে যতখানি স্থান অতিক্রম করা হয় তার সমান। ঐ বৃক্ষের পাতা থেকেই জান্নাতবাসীদের পোষাক বের হবে।

মায়াবিয়াহ এবনে কোররা বর্ণনা করেন, তুবা এমন একটি বৃক্ষ যার বীজ আল্লাহ পাক তাঁর দস্তে মোবারকে বপন করেছেন এবং তার মধ্যে রুহ ফুঁকে দিয়েছেন। আর ঐ বৃক্ষ থেকেই অলংকার এবং পোষাক বের হবে। আর তার ডালাগুলো জান্নাতের দেয়ালের বাহির থেকেও দেখা যাবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর কথা বর্ণিত আছে যে, জান্নাতে একটি বৃক্ষ আছে যাকে "তুবা" বলা হয়। আল্লাহ পাক তাকে নির্দেশ দেবেন আমার বন্দা যা কিছু চায় তুমি তোমার ভেতর থেকে তা বের করে দাও। তখন হুকুম মোতাবেক বৃক্ষটি ফেটে যাবে এবং তার ভেতর থেকে বন্দার ইচ্ছানুযায়ী অশ্ব, জীন, লাগাম এবং যাবতীয় আসবাবপত্র বের হয়ে আসবে। এমনিভাবে বন্দার আকাংক্ষা মোতাবেক উষ্ট্রী এবং তার যাবতীয় আসবাবপত্রও ঐ বৃক্ষ থেকে বের হয়ে আসবে এবং পোষাকও সে বৃক্ষ থেকে বের হয়ে আসবে।[১] (বগভী, এবনে আবিদ্দুনিয়া)

১ তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ২৫৯-৬০

كَذٰلِكَ اَرْسَلْنٰكَ فِيْٓ اُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ
مِنْ قَبْلِهَآ اُمَمٌ لِّتَتْلُوَا۟ عَلَيْهِمُ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ
بِالرَّحْمٰنِ ؕ قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ مَتَابِ ﴿٣٠﴾
وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ
الْمَوْتٰى ؕ بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ؕ اَفَلَمْ يَايْـَٔسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ
لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتّٰى
يَاْتِيَ وَعْدُ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿٣١﴾

তরজমা

(৩০) এভাবে আমি (হে রসূল!) আপনাকে প্রেরণ করেছি এমন এক জাতির প্রতি, যার পূর্বে বহু জাতি গত হয়েছে যেন আপনি আমার প্রেরিত নির্দেশ সমূহ তাদেরকে শুনিয়ে দেন, অথচ তারা দয়াময়কে অস্বীকার করে। (হে রসূল!) আপনি বলুন, তিনিই আমার প্রতিপালক, তিনি ব্যতীত অন্য কোন মা'বুদ নেই। তাঁর উপরই আমি ভরসা করি এবং তাঁর নিকটই আমার প্রত্যাবর্তন।

(৩১) যদি কোন কোরআন এমন হতো যা দ্বারা পবর্তকে গতিশীল করা যেত, অথবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা যেত অথবা মৃতের সাথে কথা বলা যেত, তবু তাতে বিশ্বাস স্থাপন করতো না; বরং সমস্ত বিষয়ই আল্লাহ্ পাকের হাতে। তবে কি ঈমানদারগণ এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়নি যে আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করলে সকল মানুষকেই সৎপথে পরিচালিত করতে পারেন। যারা কাফের হয়েছে, তাদের কৃতকর্মের পরিণামে তাদের বিপর্যয় ঘটতেই থাকবে। অথবা বিপর্যয় তাদের আশে-পাশে আপতিত হতেই থাকবে, যে পর্যন্ত যা আল্লাহ্ পাকের প্রতিশ্রুতি, তা না ঘটবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তাঁর ওয়াদার বরখেলাফ করেন না।

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং হাসান বসরী (রঃ) ও কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো হে রসূল! ইতিপূর্বে যেভাবে আমি অন্যান্য উম্মতের নিকট বিভিন্ন যুগে বহু নবী রসূল প্রেরণ করেছি, ঠিক তেমনিভাবে আপনাকেও এ উম্মতের নিকট নবী রসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি। আর যেভাবে পূর্ববর্তী উম্মত সমূহের

নিকট প্রেরিত কোন কোন নবীকে কিতাব দান করেছি, ঠিক তেমনিভাবে আপনার নিকটও কিতাব নাজিল করেছি, যাতে করে আপনি তাদের নিকট এ কিতাব তেলাওয়াত করেন। যেভাবে পূর্বকালে প্রেরিত নবীগণকে অস্বীকার করা হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে আপনাকেও মিথ্যাজ্ঞান করা হয়েছে। অতএব, আপনার মনক্ষুণ্ন হওয়ার কিছুই নেই। তবে যারা আপনাকে মিথ্যাজ্ঞান করে তাদের পরিণতি দেখা উচিত। যারা ইতিপূর্বে আল্লাহর অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হয়েছে এবং আল্লাহর আজাব তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে ঠিক তেমনিভাবে যারা আপনাকে মিথ্যাজ্ঞান করে তাদের পরিণতিও হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। কেননা, তারা–

وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمٰنِ ؕ

দয়াময় আল্লাহ পাককে অস্বীকার করে। আর এজন্যে যে তারা আপনার প্রতি এবং পবিত্র কোরআনের প্রতি বিশ্বাস করেনা। এ মূর্খ লোকেরা আল্লাহ পাকের নাম যে "রহমান" একথাও জানেনা। বর্ণিত আছে যে, একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দোয়া করছিলেন, ইয়া আল্লাহ!, ইয়া রাহমান! বলে, তখন আবু জেহেল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এভাবে দোয়া করতে শ্রবণ করে বলে, "এখনতো মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) দু' খোদাকে মানে"। সে আল্লাহকে ডাকে এবং রহমানকে ডাকে। আমরাতো ইয়ামামার রহমান (মুসায়লামাতুল কায্যাব) ব্যতীত আর কোন রহমানকে জানিনা। এর জবাবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ هُوَ رَبِّىْ

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা যাকে অস্বীকার কর সেই দয়াময় আল্লাহ পাকই আমার প্রতিপালক। তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, আমি তাঁর প্রতিই ভরসা করি। আর তাঁর নিকটই আমার প্রত্যাবর্তন"।[১]

وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمٰنِ ؕ

"অথচ তারা দয়াময় আল্লাহ পাকের অকৃতজ্ঞ হয়"।

অর্থাৎ যাঁর রহমত অনেক বেশি, যাঁর নেয়ামত সকলেই লাভ করে, বিশেষ করে তাদের হেদায়েতের জন্যে তিনি স্বীয় রসূল প্রেরণ করেছেন, কোরআনে করীম নাজিল করেছেন যা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের সার্বিক কল্যাণের প্রতীক। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এ অকৃতজ্ঞ লোকেরা এত বড় নেয়ামতের শোকর আদায় করেনা।

শানে নজুল

আল্লাম বগভী (রঃ) বলেছেন, তফসীরকার কাতাদা, মোকাতেল এবং এবনে

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৯, পৃঃ ৫১
তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু), পারা-১৩, পৃঃ ৪৫
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৪, পৃঃ ১০৪

জোরায়েজ বর্ণনা করেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে হোদায়বিয়ায় অনুষ্ঠিত চুক্তির সময়। এবনে জরীর, এবছে আবি হাতেম এবং আবুশ্ শেখ ইমাম কাতাদার একথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ঘটনার বিবরণ এই, যখন কোরায়েশ এবং মুসলমানদের মধ্যে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের সিদ্ধান্ত হয় তখন সাহল এবনে আমর কোরায়েশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেয়। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাঃ)-কে হুকুম দিলেন, "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" লেখ। কোরায়েশ বললো, আমরা আর কোন রহমানকে জানিনা, আমরা জানি ইয়ামামার রহমানকে, অর্থাৎ মুসায়লামাতুল কাজ্জাবকে। তারা আল্লাহ পাককে রহমান মানেনা। তোমরা পূর্বে যা লিখতে তাই লেখ (অর্থাৎ বিইসমিকা আল্লাহুম্মা (আল্লাহর নামে শুরু করি)। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ط

তারা রহমানকে অস্বীকার করে তথা আল্লাহ পাকের দয়াময় হওয়ার কথা তারা অস্বীকার করে।

তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ আয়াত কোরায়েশের কাফের সম্প্রদায় সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা রহমানকে সেজদা কর। জবাবে কাফেররা বলেছিল, রহমান কি? তখন আলোচ্য বাক্যটি নাজিল হয়।

قُلْ هُوَ رَبِّىْ

"(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, তিনিই আমার প্রতিপালক, যাঁর অনন্ত অসীম দয়াময় হওয়া তোমরা অস্বীকার কর। তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা। তিনি ব্যতীত এবাদতের যোগ্য কেউ নেই, আমি তাঁর প্রতিই ভরসা করি, তোমাদের মোকাবেলায় তিনিই আমাকে সাহায্য করবেন। আর তাঁর নিকট আমার প্রত্যাবর্তন, তিনিই আমাকে সওয়াব দান করবেন"।

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ

"আর যদি এমন কোরআন হতো যাতে পাহাড়-পর্বত চলত"।

শানে নজুল

তেবরানী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, মক্কার কোরায়েশরা হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করলো, আপনি যা কিছু বলছেন তা যদি সত্য হয় তবে আমাদের মৃত পূর্বপুরুষদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাতের ব্যবস্থা করুন, যাতে করে আমরা তাদের অবস্থা দেখতে পারি এবং তাদের সাথে কথা বলতে পারি এবং তারা যেন আপনার সত্যতা বর্ণনা করে। দ্বিতীয়তঃ মক্কার

পাহাড়গুলোকে তাদের স্থান থেকে সরিয়ে দিন। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

এবনে আবি হাতেম এবং এবনে মরদবিয়া আতীয়া উফীর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কোরায়েশের লোকেরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করলো, যদি মক্কার পাহাড়গুলো এখান থেকে সরিয়ে দেন এবং এ স্থানকে উন্মুক্ত ময়দানে পরিণত করেন যেন আমরা সেখানে চাষবাস করতে পারি; অথবা যেভাবে হযরত সোলায়মান (আঃ) হাওয়াই জাহাজে করে দূর-দূরান্তের সফর করতেন, তাঁর সম্প্রদায়ও তাঁর সাথে থাকতো, ঠিক এমনিভাবে আমাদের জন্যেও সে ব্যবস্থা করুন। অথবা যেভাবে হযরত ঈসা (আঃ) মৃতদেরকে জীবিত করতেন আপনিও আমাদের মৃত পূর্বপুরুষদের জীবিত করুন তবে আমরা আপনার প্রতি ঈমান আনবো। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।

আল্লাম বগভী বিস্তারিতভাবে একথাও লিখেছেন যে, আলোচ্য আয়াত মুশরেকদের কয়েক ব্যক্তি সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। আবু জেহেল, এবনে হেশাম এবং আবদুল্লাহ এবনে উমাইয়া তন্মধ্যে অন্যতম ছিল। আবদুল্লাহ এবনে উমাইয়া এক ব্যক্তির মাধ্যমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এ প্রস্তাব প্রেরণ করে যে, যদি আপনি আমাদেরকে অনুসারী বানাতে চান তবে কোরআন শরীফের মাধ্যমে এখানের পাহাড়গুলোকে সরিয়ে দিন, যাতে করে উন্মুক্ত ময়দানে আমরা চাষাবাদের সুযোগ পাই। এখানে নদী-নালা প্রবাহিত করুন যেন আমরা বৃক্ষ-তরুলতায় ভরা বাগান তৈরি করতে পারি। আপনি নবুওয়্যতের দাবীর ব্যাপারে আল্লাহর নবী দাউদ (আঃ)-এর চেয়ে কম নন। আপনিতো বলে থাকেন যে দাউদ (আঃ)-এর জন্যে আল্লাহ পাক পাহাড়গুলোকে অনুগত করে দিয়েছিলেন, যারা তাঁর সাথে একত্রিত হয়ে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করতো। আপনি বাতাসকে আমাদের অনুগত করে দিন। খাদ্য-দ্রব্য সংগ্রহ সহ অন্যান্য প্রয়োজনে আমাদেরকে সিরিয়া যেতে হয়, আমরা সিরিয়া উড়ে যেতে চাই এবং দিনে দিনে ফিরে আসতে চাই। যেমন আপনি বলেছেন, বাতাসকে আল্লাহ পাক সোলায়মান (আঃ)-এর অনুগত করে দিয়েছেন। মুশরেকদের এসব কথার পরই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়।[১]

أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ

অথবা যদি ধরণী বিদীর্ণ হতো, অর্থাৎ আল্লাহ পাক বাতাসকে অনুগত করে দিতেন আর মানুষ বাতাসের উপর আরোহন করে দূর-দূরান্তে সফর করতো।

অথবা এর অর্থ হলো, আসমানী গ্রন্থের মাধ্যমে জমীনকে বিদীর্ণ করা হতো এবং তাতে নদী-নালা প্রবাহিত করা যেত।

أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ২৬৩-৬৫
তফসীরে কবীর, খন্ড-১৯, পৃঃ ৫২-৫৩
খোলাসাতুত তাফাসীর, খন্ড-২,পৃঃ ৪৭৯

অথবা আসমানী কিতাবের মাধ্যমে মৃতদের জীবিত করা যেত কিন্তু আল্লাহ পাক তাদের জন্যে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। যদি এ সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করাও হতো তবু তারা ঈমান আনতো না। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى

"যদি আমরা তাদের নিকট ফেরেশতা প্রেরণ করতাম এবং মৃত ব্যক্তিরা তাদের সাথে কথা বলতো তবু তারা ঈমান আনতোনা"।

وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ط

"তারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞই থাকতো"।

بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ط

অর্থাৎ কাফেরদের এসব আবদার রক্ষা না করা এজন্যে নয় যে, আল্লাহ পাক এসবের শক্তি রাখেন না, বরং আল্লাহ পাক সর্বশক্তিমান, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তাঁর নিকট কোন কিছুই অসম্ভব নয়, তবে তিনি তা করতে চাননি কেননা, তিনি জানেন এসব বিস্ময়কর বিষয় দেখার পরও তারা ঈমান আনবেনা।

اَفَلَمْ يَايْـَٔسِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

তবে কি মোমেনগণ এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়নি যে, আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে সকল মানুষকেই হেদায়েত করতে পারেন, কিন্তু আল্লাহ পাকের তওফিক ব্যতীত কেউ হেদায়েত লাভ করতে পারেনা। আর কাফেররা যে মোজেযা দেখার আবদার করেছে, এর চেয়ে বড় বড় মোজেযা তারা দেখেছে। চন্দ্রকে দ্বিখন্ডিত করার মোজেযা তারা দেখেছে কিন্তু তবু তারা ঈমান আনেনি। আবু জেহেলের হাতে রক্ষিত কাঁকর কথা বলেছে তবু তারা ঈমান আনেনি, পাহাড়কে চলমান করার চেয়ে চন্দ্র দ্বিখন্ডিত করা নিশ্চয় কঠিনতর কাজ। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা ঈমান আনেনি।

اَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيْعًا ط

একথা জানা সত্ত্বেও মোমেনগণ কাফেরদের ঈমান আনয়নের ব্যাপারে নিরাশ হয়নি যে আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে দুনিয়ার সকল মানুষকে হেদায়েত করতে পারেন। অথবা এর অর্থ হলো মোমেনদের ঈমান হলো এই, যদি আল্লাহ পাক ইচ্ছা করেন তবে দুনিয়ার সকল মানুষকে মোমেন বানিয়ে দিতেন-এ বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও মোমেনগণ কাফেরদের ঈমান আনয়নের ব্যাপারে আশা রাখে, তখনও নিরাশ হয়নি।

অধিকাংশ তফসীকারগণ আলোচ্য আয়াতের اَفَلَمْ يَايْـَٔسِ الَّذِيْنَ শব্দটির অর্থ লিখেছেন الم يعلم। অর্থাৎ ঈমানদারগণ কি জানতো না যে আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে দুনিয়ার সকল

মানুষকে হেদায়েত করতেন।

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, "আমাদের ফরমায়েশ মোতাবেক নিদর্শন দেখলে আমরা ঈমান আনব", কাফেরদের এমন কথা শ্রবণ করে কোন কোন সরল-প্রাণ মুসলমান এ আশা করতেন যে, যদি পূর্বোল্লেখিত বিস্ময়কর ঘটনা সমূহ ঘটত, তথা কাফেরদের আবদার অনুযায়ী আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ মোজেযা সমূহ প্রদর্শন করতেন তবে হয়তো কাফেররা ঈমান আনত। তারই জবাবে আল্লাহ পাক আলোচ্য আয়াতে এরশাদ করেছেন, তোমাদের ধারণা নির্ভুল নয়। কাফেরদের এত শত্রুতা সত্ত্বেও তোমরা এখনো তাদের সম্পর্কে এ আশা করে বসেছ যে, তারা ঈমান আনবে, অথচ তারা অনেক অলৌকিক ঘটনা এ পর্যন্ত দেখেছে কিন্তু ঈমান আনেনি; যদি মানুষের অন্তরে সত্য গ্রহণের আকাংক্ষা ও ইচ্ছা না থাকলেও সকলকে হেদায়েত করার বিধান আল্লাহ পাকের থাকত, তবে তিনি সকলকে হেদায়েত করতেন, কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে, এ পৃথিবী মানুষের জন্যে পরীক্ষাগার। যে হেদায়েত চায় সে হেদায়েত পায়। আর যে হেদায়েতের কেন্দ্রের সঙ্গে শত্রুতা করে সে বঞ্চিত হয়। হেদায়েত গ্রহণের জন্যে কাউকে বাধ্য করা হয়না। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ

"যার ইচ্ছা ঈমান আন, আর যার ইচ্ছা নাফরমান হও"।

আরো এরশাদ হয়েছেঃ

فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا

(সূরায়ে মুজ্জাম্মেল)

"যার ইচ্ছা তার প্রতিপালকের দিকে পথ অবলম্বন করতে পারে"।

কিন্তু যারা আল্লাহর রসূলের সঙ্গে শত্রুতা করে, তাদের হেদায়েতের আশা করা নিরর্থক।

وَلَا يَزَالُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا تُصِيْبُهُمْ بِمَا صَنَعُوْا قَارِعَةٌ

যে পর্যন্ত না আল্লাহ পাকের ওয়াদা পৌঁছেছে, কাফেররা তাদের কৃতকর্মের কারণে আঘাত পেতে থাকবে। অথবা তাদের বাড়ী-ঘরের পার্শ্বেই বিপদ আপতিত হবে। আলোচ্য আয়াতে قارعة শব্দটির অর্থ হলো বালা-মুসিবত, বিপদাপদ যথা দুর্ভিক্ষ বা হত্যাকান্ড, অর্থ-সম্পদের ক্ষতিসাধন প্রভৃতি। তাদের কুফরী ও নাফরমানীর কারণে তাদের উপর বালা-মুসিবত আসতে থাকবে।

এ পর্যায়ে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য শব্দটির অর্থ হলো সে সৈন্যবাহিনী যা কাফেরদের বিরুদ্ধে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রেরণ করতেন।

أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ

অথবা তাদের বস্তির নিকট বালা-মুসিবত আপতিত হবে যা তাদের জন্যে বিপদের কারণ হবে। কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এ বাক্যটিতে সম্বোধন করা হয়েছে স্বয়ং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অর্থাৎ তিনি স্বয়ং অবতরণ করবেন তাদের বাড়ী-ঘরের নিকট, যেমন মক্কার অদূরে হোদায়বিয়া নামক স্থানে ৬ষ্ঠ হিজরীতে তিনি অবতরণ করেছিলেন। এমনি অবস্থায় قارعة শব্দের অর্থ হবে কাফেরদের বিরুদ্ধে সকল অভিযান।

আয়াতের মর্মকথা

যদি কাফেরদের ফরমায়েশ মোতাবেক নিদর্শন সমূহ পেশ করা হয়, তবু মক্কার কাফেররা কখনও ঈমান আনবে না। যতক্ষণ তাদের প্রতি বিপদের ঘনঘটা অনবরত না হতে থাকবে ততক্ষণ তাদের দৌরাত্ম অব্যাহত থাকবে। যখন তারা দেখবে যে, চারদিক অন্ধকার আর অন্ধকার থেকে আত্মরক্ষার আর কোন পথ নেই, তখন তাদের হুশ ফিরে আসবে, তাদের উপর বিপদ আপতিত হবে তথা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে গজব আসবে তখন তারা উপলব্ধি করবে যে, তারা সত্য পথ থেকে বঞ্চিত।

حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ

(যে পর্যন্ত না আল্লাহর ওয়াদা পূর্ণ হয়েছে)

এখন প্রশ্ন হলো, আল্লাহর ওয়াদাটি কি? আল্লাহর ওয়াদা হলো একদিন অবশ্যই ইসলামের বিজয় হবে, অবশ্যই মক্কা বিজয় হবে, সারা আরবে দ্বীন ইসলাম কায়েম হবে। যে পর্যন্ত এ দিন না আসবে সে পর্যন্ত তাদের দৌরাত্ম অব্যাহত থাকবে।

إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ

নিশ্চয় আল্লাহ পাক কখনও তাঁর ওয়াদা খেলাফ করেন না। আল্লাহ পাক তাঁর ওয়াদা পূরণে অটল, তাঁর ওয়াদা পূরণে ব্যতিক্রম নেই।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ঈমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এর দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে এ মর্মে যে, আল্লাহ পাক যে ওয়াদা করেছেন তা অবশ্যই পূর্ণ হবে, এমন একদিন আসবে যখন আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে বিজয় দান করবেন। কাফেরদের সকল অহংকার, সকল দৌরাত্ম ভূলুণ্ঠিত হবে। তাই এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে বিজয় দান করবেন, আর এটি আল্লাহ পাকের ওয়াদা আর তিনি কখনও ওয়াদা বরখেলাফ করেন না।[১]

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৯, পৃঃ ৫৪

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ
بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ
كَانَ عِقَابِ ﴿٣٢﴾ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۚ وَجَعَلُوا
لِلَّهِ شُرَكَاءَ ۖ قُلْ سَمُّوهُمْ ۚ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ
بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ۗ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ
السَّبِيلِ ۗ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿٣٣﴾ لَهُمْ عَذَابٌ فِي
الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ
وَّاقٍ ﴿٣٤﴾ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۗ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ ۗ
أُكُلُهَا دَائِمٌ وَّظِلُّهَا ۗ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ وَّعُقْبَى الْكٰفِرِينَ
النَّارُ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِينَ آتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ
مِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهُ ۗ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ
اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۗ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَآبِ ﴿٣٦﴾ وَكَذٰلِكَ أَنْزَلْنٰهُ
حُكْمًا عَرَبِيًّا ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ
مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا وَاقٍ ﴿٣٧﴾

তরজমা

(৩২) (হে রসূল!) আপনার পূর্বেও কত রসূলকে তারা বিদ্রুপ করেছে এবং আমি কাফেরদেরকে কিছু অবকাশ দিয়েছিলাম, এরপর তাদেরকে পাকড়াও করেছি। অতএব, কেমন ছিল আমার শাস্তি!

(৩৩) বলতো, যে সকলের মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে প্রত্যেকের কর্মকান্ড নিয়ে,

(তাঁর কবল থেকে কে রক্ষা পেতে পারে?) আর কাফেররা আল্লাহ পাকের সাথে শরীক করে (হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা তাদের পরিচয় দাও, তোমরা কি পৃথিবীর এমন কিছু সংবাদ তাঁকে দিতে চাও যা তিনি জানেন না? কিংবা এমনি ভাষা ভাষা কথা বলছো? ওসব কিছুই নয় মূলতঃ কাফেরদের প্রতারণাই তাদেরকে মাতিয়ে রেখেছে এবং তাদেরকে সৎ পথ থেকে নিবৃত্ত রাখা হয়েছে। আল্লাহ পাক যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন পথ-প্রদর্শক নেই।

(৩৪) দুনিয়ার জীবনেই রয়েছে তাদের জন্যে শাস্তি আর আখেরাতের শাস্তিতো আরো কঠোর এবং আল্লাহ পাকের শাস্তি থেকে তাদেরকে রক্ষা করারও কেউ নেই।

(৩৫) পরহেজগারদের জন্যে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত এরূপ, তার তলদেশে নির্ঝর-মালা প্রবাহিত, এবং কাফেরদের পরিণতি হলো দোজখ।

(৩৬) আর আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি (হে রসূল!) তারা আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে খুশিই হয় কিন্তু কোন কোন দল এর কিছু অংশকে অস্বীকার করে। (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে যেন আমি শুধু এক আল্লাহর বন্দেগী করি এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করি। আমি তাঁরই দিকে আহবান জানাই এবং তাঁরই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন।

(৩৭) আর এভাবেই আমি আরবী ভাষায় এই নির্দেশ-বাণী নাজিল করেছি (হে রসূল!) জ্ঞান প্রাপ্তির পরও যদি আপনি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করেন তবে আল্লাহর কবল থেকে আপনার সহায় এবং রক্ষাকারী কেউ থাকবে না।

তফসীরুল কোরআন

শানে নজুল

যেহেতু মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট তাদের ফরমায়েশ মোতাবেক মোজেযা দাবী করেছিল এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিদ্রূপ করছিল, তাই আল্লাহ পাক তাঁকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে এ আয়াত নাজিল করেছেন। কেননা কাফেরদের আচরণ ছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে অত্যন্ত কষ্টদায়ক, তাই আল্লাহ পাক এ আয়াতে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ করেছেনঃ

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا

(হে রসূল!) কাফেররা আপনার প্রতি বিদ্রূপ করে আপনাকে যে কষ্ট দিচ্ছে এটি নতুন কিছু নয়; বরং ইতিপূর্বেও অন্যান্য নবী রসূলগণের সঙ্গে এমন অন্যায় আচরণই করা হয়েছে। তাঁদের বিদ্রূপ করা হয়েছে, তাঁদেরকেও চরম কষ্ট দেয়া হয়েছে, তাই তাঁরা যেভাবে সবর করেছেন, ঠিক তেমনি আপনিও সবর করুন। আল্লাহ পাকের বিধান হলো

কাফেরদেরকে তিনি অবকাশ দান করে থাকেন। তারা গাফলতের আবর্তে নিপতিত হয়ে থাকে। কিন্তু যখন তাদের অন্যায়-অনাচারের ঘট পূর্ণ হয়ে যায়, তখন তিনি তাদেরকে পাকড়াও করেন। আর সে পাকড়াও হয় অত্যন্ত শোচনীয় এবং ভয়াবহ। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ۚ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ○

"এরপর আমি তাদেরকে পাকড়াও করি, বল কেমন ছিল শাস্তি"![1]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আল্লাহ পাক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ করেছেনঃ হে রসূল! আপনার পূর্বের নবী রসূলগণকেও এভাবে কষ্ট দেয়া হয়েছে, তাই আপনি চিন্তিত হবেন না। আমি এ কাফেরদেরকে কিছুটা অবকাশ দিয়েছি। অবশেষে তাদের শাস্তি অবশ্যই হবে। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক জালেমকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু যখন পাকড়াও করেন তখন জালেম হতবাক হয়ে যায়। এরপর তিনি এ আয়াত

وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ

(এভাবেই আপনার পরওয়ারদেগারের তরফ থেকে পাকড়াও করা হয়)।

তেলাওয়াত করেন।[2]

যারা পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের অবাধ্য-অকৃতজ্ঞ হয়েছে তাদের কঠিন কঠোর শাস্তির ইতিহাস সর্বজনবিদিত। আদ জাতি, সামুদ জাতি, ফেরাউন, নমরুদ সহ সকল জালেম সম্প্রদায়ের কীর্তিকলাপ এবং তাদের ধ্বংসের কথা ইতিহাসের পাতায় সুরক্ষিত রয়েছে। আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাক কোন জালেম সম্প্রদায়কে তাদের অন্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি বিধান করেন না, বরং তাদেরকে যথেষ্ট সময় অবকাশ দেয়া হয়। একদিকে তাদের অন্যায়ের ঘট পূর্ণ হতে থাকে অন্যদিকে তাদেরকে সত্য গ্রহণের তথা হেদায়েতের পথ অবলম্বনের যথেষ্ট সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু যখন তারা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে আরো ঔদ্ধত্য দেখায় তখন তাদের শাস্তি অবধারিত হয়ে পড়ে। পূর্বকালের বিভিন্ন পথভ্রষ্ট জাতির শিক্ষামূলক ঘটনা থেকে মক্কার কাফেরদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত ছিল কিন্তু তারা তা করেনি, তাই অদূর ভবিষ্যতে এমন সময় আসবে যখন তাদেরকে কঠিন কঠোর শাস্তি দেয়া হবে।[3]

ইমাম তবরী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে আল্লাহ পাক বিশেষভাবে এরশাদ করেছেনঃ হে রসূল! এ মুশরেকরা যদিও আপনাকে বিদ্রুপ করে আপনার নিকট বারে বারে

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৯, পৃঃ ৫৫
২। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু), পারা-১৩, পৃঃ ৪৭
৩। তফসীরে মাজেদী, খন্ড-১, পৃঃ ৫১৪

নতুন নতুন নিদর্শন প্রদর্শনের দাবী জানিয়েছে, এর দ্বারা আপনার প্রতি তাদের বিদ্রুপ প্রকাশ পেয়েছে। আমি তাদেরকে অবকাশ দিয়েছি, অবশেষে তাদের এ অবকাশ শেষ হবে এবং তাদের কঠোর কঠিন শাস্তি হবে।[১]

اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

"বলতো, যে সকলের মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে প্রত্যেকের কীর্তিকলাপ নিয়ে তাঁর (আল্লাহ পাকের) কবল থেকে কে রক্ষা পেতে পারে"?

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে তওহীদের আলোচনা ছিল। আর এ আয়াতে কাফের ও মুশরেকদের অবস্থা এবং শাস্তির কথা স্থান পেয়েছে।[২]

সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাক প্রত্যেকের মাথার উপর দাঁড়িয়ে সকলের যাবতীয় কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছেন। সবই তাঁর সম্মুখে। কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই। সব কিছু তিনি সচক্ষে দেখেন। অতএব, কারো শাস্তি বিধানের সর্বময় ক্ষমতা তাঁর রয়েছে, যারা দূরাত্মা তারা পলায়ন করে আত্মরক্ষা করতে পারেনা। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلٰى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক প্রত্যেকটি মানুষের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত। তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই। কোন বৃক্ষের পাতা ঝরে গেলে তা-ও তিনি জানেন। প্রাণী মাত্রেরই রিয্‌কের দায়িত্ব তাঁর উপরই। গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছুই তাঁর নিকট দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট, কিন্তু এতদসত্ত্বেও কাফেররা তাঁর সাথে শরীক করে।

قُلْ سَمُّوْهُمْ ط

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা যাদের এবাদত কর তাদের নাম বল"।

যারা দেখতে পায় না, শুনতে পায় না, যাদের কোন ক্ষমতাই নেই তাদের সম্মুখে মাথা নত করার ন্যায় নির্বুদ্ধিতা আর কিছুই হতে পারেনা। তারা কি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের সমান হতে পারে? যাদেরকে তোমরা আল্লাহর সমান বলে মনে কর তাদের নাম বলতো? এ সমস্ত অক্ষমদের অবস্থা বর্ণনা কর। সমগ্র সৃষ্টি জগতে আল্লাহ্ পাকের কোন শরীক আছে বলে আল্লাহ পাক জানেন না। যদি থাকতো তবে তিনি অবশ্যই জানতেন। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

اَمْ تُنَبِّئُوْنَهٗ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِى الْاَرْضِ اَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ط

১। তফসীরে তবরী, খন্ড-১৩, পৃঃ ১০৬
২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৪, পৃঃ ১০৫

"তবে কি তোমরা এমন কথা তাঁকে জানাতে চাও যা তিনি জানেন না"?

বিখ্যাত তত্ত্বজ্ঞানী আবু হাইয়ান এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, হে কাফেররা! তোমরা কি সে সব দেব-দেবতাকে মহান আল্লাহ্ পাকের সমান করতে চাও যারা পৃথিবীর কোন খবরই রাখেনা? অথবা তোমরা এ সম্পর্কে ভাষা ভাষা কথা বলছ। তোমাদের উক্তি অন্তসার-শূন্য, ফাঁকা বুলি মাত্র।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, পৃথিবীতে বা কিছু আছে এবং যা কিছু হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক সম্পূর্ণ অবগত। কিন্তু যার কোন অস্তিত্ব নেই তার সম্পর্কে অবগত হওয়ার কোন প্রশ্ন উত্থিত হয়না। তোমরা কি তোমাদের হাতে বানানো মূর্তিগুলোর এমন কোন গুণ বর্ণনা করতে পার যার কারণে তারা এবাদতের যোগ্য হতে পারে? অথবা তোমরা ভিত্তিহীন এবং অর্থহীন এমন কথাবার্তা বল বাস্তবে যার কোন অস্তিত্ব নেই।[১]

বস্তুতঃ যদি পৌত্তলিকরা তাদের অন্ধ বিশ্বাস পরিহার করে, প্রত্যেকেই তার বিবেক-বুদ্ধি ব্যয় করে তবে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের অন্তসার-শূন্যতা তাদের নিকটই প্রমাণিত হবে, তারাই উপলব্ধি করবে যে, তাদের বিশ্বাসের কোন ভিত্তি নেই, তাদের কথা কোন যুক্তি নেই।

بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مَكْرُهُمْ

বরং প্রকৃত অবস্থা এই যে, শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করেছে, শয়তানের প্রতারণায় তারা মুগ্ধ হয়ে আছে। এজন্যে মিথ্যা, ধোঁকা, প্রতারণায় তারা মুগ্ধ- মত্ত হয়ে আছে।

وَصُدُّوْا عَنِ السَّبِيْلِ ط

শুধু তাই নয়, বরং সঠিক পথ থেকে তথা দ্বীন ইসলামের পথ থেকে তারা দূরে সরে আছে। তাদেরকে পথভ্রষ্ট করা হয়েছে। তাই তাদের শেরক, কুফরী ও নাফরমানী, তাদের এ কুপ্রবৃত্তির প্রতারণা এবং শয়তানী চক্রান্ত ব্যতীত আর কিছুই নয়।

وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ۝

"আর আল্লাহ্ পাক যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথ-প্রদর্শক নেই"।

মূলতঃ হেদায়েত আল্লাহ্ পাকের তওফিক ব্যতীত লাভ হয়না। যারা আল্লাহর তওহীদের বিরোধী, যারা আল্লাহর সঙ্গে শত্রুতা করে, দ্বীন ইসলামের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হয় আল্লাহ্ পাক তাদেরকে হেদায়েত করেন না। তাদের জন্যে শাস্তির ঘোষণা রয়েছে পরবর্তী আয়াতে—

لَهُمْ عَذَابٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

১ তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ২৬৮

তাদের জন্যে দুনিয়ার জীবনে রয়েছে শাস্তি যেমন যুদ্ধে তারা নিহত হয় অথবা বন্দী হয় এবং অমুসলিম কর আদায় করতে বাধ্য হয়। কিন্তু তাদের প্রকৃত শাস্তি হবে আখেরাত।

وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَشَقُّ

"আর আখেরাতের আজাব অত্যন্ত কঠিন এবং চিরস্থায়ী"।

وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ○

আর আল্লাহ পাকের আজাব থেকে কেউ তাদেরকে রক্ষাকারী নেই। অতএব, তাদেরকে দুনিয়া এবং আখেরাতে তাদের কৃতকর্মের কঠিন কঠোর শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ط

পরহেযগারদের জন্যে প্রতিশ্রুত জান্নাতের অবস্থা

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের শাস্তির কথা বর্ণিত হয়েছে আর এ আয়াত থেকে ঈমানদারদের জন্যে রক্ষিত জান্নাতের বিবরণ শুরু হয়েছে। মূলতঃ জান্নাতের নেয়ামত সমূহের কথা বর্ণনাতীত এমনকি; কল্পনাতীত। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক জান্নাত সম্পর্কে তিনটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেনঃ

(১) تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

অর্থাৎ জান্নাতের তলদেশ দিয়ে স্বচ্ছ নির্ঝর-মালা প্রবাহিত হয়।

(২) اُكُلُهَا دَآئِمٌ

অর্থাৎ জান্নাতের ফলমূল হবে চিরস্থায়ী, সর্বদা পাওয়া যাবে, কখনও ফুরাবে না। দুনিয়ার কোন ফলই সর্বদা পাওয়া যায় না কিন্তু জান্নাতের ফলের ব্যাপারে এর ব্যতিক্রম হবে। সর্বদা ফলমূল পাওয়া যাবে। কখনও শেষ হবেনা।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ পর্যায়ে তেবরানীর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেনঃ হযরত সওবান (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে নিজে শুনেছি, তিনি এরশাদ করেছেনঃ জান্নাতবাসীগণের মধ্যে যে ব্যক্তি জান্নাতের কোন ফল গ্রহণ করবে তখন সঙ্গে সঙ্গে ঐ স্থলে অনুরূপ আর একটি ফল স্থান গ্রহণ করবে।[১]

(৩) وَظِلُّهَا ط

অর্থাৎ সেখানকার মনোরম ছায়াও হবে চিরস্থায়ী, কোন কিছুরই কষ্ট সেখানে থাকবে

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ২৬৯

না। পৃথিবীতে রোদ্রের কারণে ছায়া বিলীন হয়ে যায়, জান্নাতে তা হবেনা।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে তার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত হবে। পানির নহরের পাশাপাশি প্রবাহিত হবে দুধের নহর যার স্বাদে কোন পরিবর্তন ঘটবে না। এর পাশাপাশি থাকবে পবিত্র সারাবের নহর যাতে থাকবে অসাধারণ স্বাদ। আর জান্নাতে থাকবে সর্ব প্রকার ফল, আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীনের অনন্ত অসীম রহমত, নেয়ামত এবং মাগফেরাত।

বর্ণিত আছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কুসুফের নামাজ আদায় করেন। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেনঃ হে আল্লাহর রসূল! আমরা দেখেছি আপনি যেন কোন কিছু গ্রহণ করার ইচ্ছা করেছেন। এরপর দেখলাম আপনি যেন পিছু হঠছেন, তিনি এরশাদ করলেন, হ্যাঁ আমি জান্নাতকে দেখেছিলাম এবং ইচ্ছা করেছিলাম যেন কিছু ফল তুলে নেই। যদি তা করতাম তবে যতদিন দুনিয়া থাকতো ততদিন তোমরা তা ভোগ করতে। আবু ইয়ালায় রয়েছেঃ একদিন জোহরের নামাজে আমরা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। তিনি হঠাৎ একটু সম্মুখে অগ্রসর হলেন। আমরাও তা করলাম। এরপর লক্ষ্য করলাম, তিনি মনে হয় কোন জিনিস গ্রহণের ইচ্ছা করলেন, এরপর পিছু হটে এলেন, নামাজ শেষে হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! আজ আমরা আপনাকে এমন কাজ করতে দেখেছি যা ইতিপূর্বে কখনও দেখিনি। তিনি এরশাদ করলেন হ্যাঁ, আমার সম্মুখে জান্নাত পেশ করা হয় যা ছিল সজীবতায় পরিপূর্ণ। আমার ইচ্ছা হয়েছিল যে আঙ্গুরের একটি ছড়া ছিড়ে নেই কিন্তু আমার এবং তার মধ্যে আড়াল করে দেয়া হয়। যদি আমি তা নিয়ে আসতাম তবে সারা পৃথিবীবাসী তা ভোগ করতো অথচ কারো জন্যে কম হতো না। অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ জান্নাতীগণ অনেক আহার করবেন। কিন্তু থুথু আসবে না, তাদের নাকের পানি ঝরবেনা, পস্রাব-পায়খানার প্রয়োজন হবে না। কস্তুরীর ন্যায় সুগন্ধি ঘাম বের হবে, আর এভাবে খাবার হজম হবে যেভাবে মানুষের নিঃশ্বাস স্বাভাবিকভাবে আসা-যাওয়া করে। ঠিক এভাবে আল্লাহ্ পাকের নামের তসবীহ-তাহলিল স্বাভাবিকভাবে অব্যাহত থাকবে।[১]

تِلْكَ عُقْبَى الَّذِيْنَ اتَّقَوْا

এটি হলো পরিণতি তাদের যারা (এ জীবনে) পরহেযগারী অবলম্বন করেছে। আর কাফেরদের পরিণতি হলো চিরস্থায়ী দোজখ। এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঈমান এবং কুফরীর পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, যারা ঈমান আনে, পরহেযগারী অবলম্বন করে তাদের জন্যে রয়েছে চির সুখ, চির শান্তি, আর যারা অবাধ্য অকৃতজ্ঞ তথা কাফের

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু), পারা-১৩, পৃঃ ৪৮-৪৯

হবে তারা হবে চির দুঃখী। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।[১]

وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ

"আর যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি"।

এ বাক্য দ্বারা যাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে তারা হলো সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ), অথবা ইহুদী এবং ঈসায়ীদের মধ্যে সে সব লোক যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। যেমন হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে সালাম (রাঃ) এবং তাঁর সাথী। এমনিভাবে আবিসিনিয়ার কিছু খ্রীষ্টানও ইসলাম গ্রহণ করেছেন। যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তথা মুসলমানগণ, আর ইতিপূর্বে যারা কিতাব পেয়েছিল যেমন ইহুদী এবং খ্রীষ্টান তারা সকলেই হে রসূল! আপনার প্রতি আনন্দিত। পবিত্র কোরআন নাজিল হওয়ায় তারা অত্যন্ত খুশি। কেননা পবিত্র কোরআনকেই তারা দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে সাফল্যের একমাত্র উপকরণ মনে করে। এতদ্ব্যতীত তাদের নিকট অবতীর্ণ কিতাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগমনের সুসংবাদ ছিল। তারা তাঁর আগমনের মধ্যে তাদের কিতাবের ঘোষণার সত্যতা লক্ষ্য করে খুশি হয়েছে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ

"(হে রসূল!) যা আপনার নিকট নাজিল করা হয়েছে তাতে তারা অত্যন্ত খুশি"।

وَمِنَ الْاَحْزَابِ

"তাদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা এর সত্যতা স্বীকার করেনা"।

قُلْ اِنَّمَآ اُمِرْتُ

(হে রসূল!) আপনি সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিন কে খুশি হলো বা কে দুঃখী হলো তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি শুধু এক আল্লাহ্‌রই বন্দেগী করি, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করিনা। আর মানুষকে তাঁর দিকে আহবান করি কেননা, আমি আল্লাহ্‌রই রসূল আর তাঁর দিকে আহবান করার জন্যেই আমি প্রেরিত হয়েছি। আর তাঁরই নিকট আমাকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে কেননা, এ ক্ষণস্থায়ী জগতে মানুষের অবস্থান একটি সীমিত সময়ের জন্যেই হয়ে থাকে। এ সময় শেষ হলে প্রত্যেকটি মানুষকে পাড়ি জমাতে হয় পরপারে। এটিই স্রষ্টার অমোঘ বিধান। আর কেয়ামত সত্য, অবশেষে সকলকে আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযির হতে হবে।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে যাদেরকে কিতাব দেয়ার কথা এরশাদ হয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে, তাঁরা হলেন মোমেনগণ, যাঁরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছিলেন, তাদের মধ্যে আহলে

১। তফসীরে মাজেদী, খন্ড-১, পৃঃ ৫২৯

কিতাব যেমন আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ), কা'ব (রাঃ) এবং তাঁর সাথীগণ। আর নাসারাদের মধ্য থেকে ৮০ জন ইসলাম কবুল করেছিলেন। ৪০ জন নাজরানবাসী ৮ জন ইয়ামনবাসী এবং ১৩ জন আবিসিনিয়াবাসী। যেহেতু তাঁরা পবিত্র কোরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন তাই পবিত্র কোরআন নাজিল হওয়ার তারা অত্যন্ত খুশি হয়েছেন।

وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ ؕ

"আর কিছু লোক রয়েছে যারা পবিত্র কোরআনের কিছু অংশকে অস্বীকার করে"।

ইমাম রাজী (রঃ) আরো লিখেছেন, এ বাক্য দ্বারা যে সব আহলে কিতাব ঈমান আনেনি তারা সহ সমস্ত কাফেরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[১]

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ؕ

ইতিপূর্বে যেমন তওরাত, ইঞ্জিল, যবুর বিভিন্ন যুগে নাজিল করেছি ঠিক এমনিভাবে মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে হে রসূল! আপনার নিকট পবিত্র কোরআন নাজিল করেছি। ইতিপূর্বে আসমানী গ্রন্থ সমূহ আম্বিয়ায়ে কেরামের জাতীয় ভাষায় নাজিল করা হয়েছে। ঠিক এমনিভাবে হে রসূল! আপনার জাতীয় ভাষায় তথা আরবী ভাষায় পবিত্র কোরআন নাজিল করেছি। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর নিকট, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআন নাজিল করেছি। এতে রয়েছে জ্ঞান-ভান্ডার। আরবী ভাষাকে "উম্মুল আলসেনা" বলা হয় তথা ভাষার জননী আর পবিত্র কোরআন হলো "উম্মুল কেতাব" তথা কিতাব জননী। অতএব আরবী ভাষাই এ মহান গ্রন্থের জন্যে সমীচিন বিবেচিত হয়েছে।

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ

পবিত্র কোরআন সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ অতএব, আহলে কিতাবসহ সকলের এ কিতাবই মেনে চলা কর্তব্য। পবিত্র কোরআন নাজিল হওয়ার পর পূর্বের যাবতীয় বিধি-নিষেধ বাতিল। এখন সমগ্র মানব জাতির জন্যে একমাত্র হেদায়েত পবিত্র কোরআনের হেদায়েত এবং একমাত্র অনুসরণীয় আদর্শ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শ।

অতএব, পবিত্র কোরআন নাজিল হওয়ার পর কে খুশি হলো আর কে খুশি হলো না সে দিকে লক্ষ্য করার কোন প্রয়োজন নেই, আপনি পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে যে জ্ঞান লাভ করেছেন তার অনুসরণেই চলতে থাকুন। পবিত্র কোরআন আপনার নিকট থাকা সত্ত্বেও যদি এ কাফেরদের আকাংক্ষা মোতাবেক আপনি চলতে চান তবে আল্লাহ পাকের কবল থেকে কেউ আপনাকে রক্ষা করতে পারবেনা। যদিও আলোচ্য আয়াতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে, কিন্তু মূলতঃ এর

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৯, পৃঃ ৬০

দ্বারা সতর্ক করা হয়েছে মুশরেক এবং কাফেরদেরকে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, হে রসূল! আপনি আল্লাহ পাকের বিধান সমূহকে সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করুন এবং কোন অবস্থাতেই কাফেরদের কথা মেনে চলবেন না। কেননা এর পরিণতি হলো চরম বিপদ আর উম্মতের কর্তব্য হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা। কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শকে পরিহার করা মুসলিম জাতির চরম ক্ষতির কারণ হয়। তাঁর অনুসরণেই রয়েছে মুসলিম জাতি তথা সমগ্র মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ।[১]

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن
قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن
يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ
وَيُثْبِتُ ۖ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴿٣٩﴾ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي
نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ﴿٤٠﴾ أَوَ
لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا
مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤١﴾

তরজমা

(৩৮) আর (হে রসূল!) আপনার পূর্বেও অনেক রসূল প্রেরণ করেছি, তাদেরকে স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি দিয়েছি। আল্লাহ পাকের অনুমতি ব্যতীত কোন রসূলই কোন নিদর্শন পেশ করেননি। প্রত্যেকটি বিষয়ের নির্ধারিত কাল লিপিবদ্ধ রয়েছে।

(৩৯) আল্লাহ পাক যা ইচ্ছা তা নিশ্চিহ্ন করেন আর যা ইচ্ছা তা বাকি রাখেন। মূল কিতাব তাঁরই কাছে।

(৪০) তাদেরকে যে শাস্তির কথা বলি, তার কিছু যদি (হে রসূল!) আপনাকে দেখাই,

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৪, পৃঃ ১০৯

অথবা এর পূর্বে যদি আপনাকে মৃত্যুমুখে পতিত করি, আপনার কর্তব্য হলো আল্লাহর বাণী পৌছে দেয়া আর হিসাব নিকাশ তো আমার কাজ।

(৪১) তারা কি দেখেনা যে আমি তাদের দেশকে চতুর্দিক থেকে সংকুচিত করে এনেছি। আল্লাহ্ পাক আদেশ করেন, তাঁর আদেশ রদ করার কেউ নেই। এবং তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর।

তফসীরুল কোরআন

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কায় যখন দ্বীন ইসলামের প্রচার আরম্ভ করেন, তখন আরববাসী তাঁর বিরোধিতা করে, তারা তাঁর নবুওয়্যতের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করে, তারা বলেঃ এই রসূলের কি হলো যিনি খাবার গ্রহণ করেন এবং বাজারে চলাফেরা করেন।

কাফেরদের এসব সন্দেহের নিরসন-কল্পে আল্লাহ্ পাক আলোচ্য আয়াত নাজিল করেছেন।

মূলতঃ আল্লাহ পাক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নবুওয়্যত, কিতাব ও অন্যান্য নিদর্শন সমূহ দান করেছেন। এতে আশ্চর্যন্বিত হওয়ার কিছুই নেই। কেননা, ইতিপূর্বে দুনিয়াতে বহু নবী রসূল আগমন করেছেন। তাঁদের কেউ ফেরেশতা ছিলেন না। তাঁরা রক্ত-মাংসের মানুষই ছিলেন। অন্য মানুষের ন্যায় তাঁদের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার ছিল। তাঁরা অন্য মানুষের ন্যায় পানাহার করতেন। হাটে-বাজারে গমন করতেন। মানুষের ফরমায়েশ মোতাবেক মোজেযা প্রকাশ করা তাঁদের কাজ ছিলনা। তাঁরা নিজের ইচ্ছায় কোন কাজ করতেন না; বরং যেভাবে আল্লাহ্ পাক নির্দেশ প্রদান করতেন সেভাবেই কাজ করতেন। আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করার ক্ষমতা কারোরই ছিলনা। প্রত্যেক যুগের জন্যে প্রয়োজনীয় নির্দেশ আল্লাহ্ পাকের নিকট লিপিবদ্ধ রয়েছে। তাই প্রত্যেক পয়গম্বরকেই আল্লাহ্ পাকের কালামকে জনসাধারণের নিকট পৌছানোর দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। আল্লাহ পাকের নির্দেশ তাঁরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। তাঁরা কেউ নিজেদেরকে মানবীয় প্রয়োজন থেকে উর্দ্ধে বলে প্রকাশ করেননি। তাতে তাঁদের নবুওয়্যত ও রেসালতের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন উত্থিত হয়নি।

অতএব, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে এর ব্যতিক্রম কেন হবে?

অথবা তাঁর এসব প্রয়োজনের কথা কোন্ যুক্তিতে অস্বীকার করা হবে।

আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, পরিবারবর্গ থাকা, সংসার-ধর্ম করা, সন্তান-সন্ততি হওয়া-নবুওয়্যতের গুণাবলীর বিরোধী কাজ নয়। মক্কার কিছু নির্বোধ লোক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল, তারই জবাবে একথা এরশাদ হয়েছে। এতদ্ব্যতীত পৃথিবীর

ইতিহাসে এটি কোন অভিনব ঘটনা নয় এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নতুন কোন নবী নন। তাঁর পূর্বে পৃথিবীতে লক্ষাধিক আম্বিয়ায়ে কেরাম আগমন করেছেন। তিনি তাঁদেরই দলপতি। পৃথিবীর ইতিহাসে নূহ (আঃ), ইব্রাহীম (আঃ), ইসহাক (আঃ), ইয়াকুব (আঃ), মুসা (আঃ) আল্লাহ পাকের রসূল। তাঁদের সকলেরই সন্তান-সন্ততি ছিল। তাঁরা সকলেই পরিবার-পরিজন বেষ্টিত ছিলেন।

আল্লামা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী লিখেছেন, এতে শুধু যে মক্কার নির্বোধ লোকদের আপত্তিকর প্রশ্নের জবাব রয়েছে তাই নয়, বরং বোদ্ধ ধর্ম ও খ্রীষ্ট ধর্মে পরিবার-পরিজন নিয়ে সংসার ধর্ম করাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথে প্রতিবন্ধক মনে করা হয়, তারও প্রতিবাদ রয়েছে। এর পাশাপাশি এ যুগে যারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্যে দুনিয়া-ত্যাগী হওয়া, বিয়ে-শাদী বর্জন করাকে পূর্বশর্ত মনে করে, তাদের ভ্রান্ত ধারণারও নিরসন করা হয়েছে।[১]

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে জীবন-বিধান বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়েছেন, তা যেমন পরিপূর্ণ, যুক্তিসঙ্গত, তেমনি বাস্তবের অগ্নি পরীক্ষায় বারে বারে পরীক্ষিত। তিনি ঘোষণা করেছেনঃ

النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني

"বিবাহ আমার সুন্নত। যে এ সুন্নত থেকে বিমুখ হবে সে আমার উম্মতভুক্ত নয়"।

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাক এ আয়াতে ঘোষণা করেছেনঃ মক্কার যে কাফেররা এ প্রশ্ন উত্থাপন করে, "এই রসূলের কি হলো তিনি পানাহারও করেন, হাটে বাজারেও চলাফেরা করেন"। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ

(হে রসূল!) আপনি লোকদেরকে বলে দিন, আমিও তোমাদেরই ন্যায় মানুষ, তবে আল্লাহ পাকের ওহী আমার নিকট আসে, অর্থাৎ রসূল মানুষই হন; সকল রসূলই মানুষ ছিলেন। যাঁকে আল্লাহ পাক তাঁর রসূল হিসেবে নির্বাচন করেন, তাঁর নিকট আল্লাহ পাক ওহী প্রেরণ করেন।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি নফল রোজা রাখি, আর কখনো তাহাজ্জুদের নামাজ আদায় করি, কখনো নিদ্রিতও হই। আমি গোশ্ত খাই, স্ত্রীদের সঙ্গেও মেলামেশা করি, যে ব্যক্তি আমার সুন্নত থেকে বিমুখ হয়, সে আমার দলভুক্ত নয়।

মসনদের আহমদে রয়েছে, চারটি জিনিস আম্বিয়ায়ে কেরামের পন্থা (এক) খুশবু

১। তফসীরে মাজেদী, খন্ড-১, পৃঃ ৫২২

ব্যবহার করা, (দুই) বিবাহ করা (তিন) মেসওয়াক করা (চার) মেহেদী ব্যবহার করা।[১]

وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّأْتِىَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ

মক্কার কাফেররা তাদের ফরমায়েশ মোতাবেক যে মোজেযা প্রদর্শনের আবদার করেছিল, তার জবাবে এরশাদ হয়েছেঃ মোজেযা প্রদর্শন করা কোন নবীর এখতিয়ারভুক্ত নয়। আল্লাহ্ পাকের অনুমতি ব্যতীত কোন নবী মোজেযা প্রদর্শন করেন না। আল্লাহ পাকের যা মর্জি তাই তিনি করেন।

এ পর্যায়ে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, ঈমান আনয়নের জন্যে দু' একটি মোজেযা প্রদর্শনই যথেষ্ট। এরপর বাড়তি কোন মোজেযার দাবী করা হলে তা প্রদর্শন করা না করা সম্পূর্ণ আল্লাহ পাকের ইচ্ছাধীন।

لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ ○

"প্রত্যেক জিনিসের জন্যে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সময় নির্দিষ্ট"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ প্রত্যেকটি বিষয়ের শুরু ও শেষ লিপিবদ্ধ রয়েছে অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম দিন আল্লাহ্ পাক একথা লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন, অমুক ব্যক্তি অমুক সময়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং এতদিন জীবিত থাকবে, কাফের হবে অথবা মোমেন। ঠিক এভাবে পবিত্র কোরআনের কোন্ আয়াত কবে অবতীর্ণ হবে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কোন্ মোজেযা কবে প্রদর্শন করা হবে, তা-ও সুনির্দিষ্ট এবং লিপিবদ্ধ রয়েছে। অতএব, লোকেরা কোন বিষয়কে তরান্বিত করতে যত প্রয়াসীই হোক না কেন, আল্লাহ্ পাকের নির্ধারিত সময়ের পূর্বে তা হবার নয়।

يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ

"আল্লাহ পাক যা চান মিটিয়ে দেন, আর যা ইচ্ছা বাকি রাখেন। তাঁর নিকটই রয়েছে মূল কিতাব"।

শানে নজুল

কোরআনে করীমে বর্ণিত যে সব বিধি-নিষেধ তৌরাতের বিধানের খেলাফ ছিল, ইহুদীরা তা মানতো না। হয়তো তাদের এ ভুল ধারণা নিরসন-কল্পে পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ

এমতাবস্থায় এর অর্থ হলো, প্রত্যেক সময়ের জন্যে আল্লাহ পাক হুকুম নাজিল করেছেন আর নির্ধারিত সময়ের জন্যে আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাদেরকে নির্দিষ্ট আদেশ

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু), পারা-১৩, পৃঃ ৫০

দিয়েছেন। আল্লাহ্ পাক তাঁর বন্দাদের কল্যাণ সাধনের প্রেক্ষিতে দু' প্রকার বিধি-নিষেধ প্রেরণ করেছেন, আর পূর্বের নিয়ম-কানুন পরিবর্তন করেছেন। তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনিই সমগ্র বিশ্বের একমাত্র অধিপতি, তিনি যখন যা ইচ্ছা তা করেন এবং যা ইচ্ছা বাকি রাখেন এবং যা ইচ্ছা বিলুপ্ত করেন, যখন ইচ্ছা কোন জাতিকে পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং যখন চান তার স্থলাভিষিক্তও রাখেন।

আয়াতের মর্মকথা

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বর্ণনা করেছেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তত্ত্বজ্ঞানীদের মধ্যে একাধিক মত রয়েছে। সাঈদ এবনে জুবায়ের (রঃ)এবং কাতাদা (রঃ) বলেছেনঃ ফরজ বা অবশ্য কর্তব্য বিধি-নিষেধকে আল্লাহ্ পাক যখন ইচ্ছা বাতিল করে দেন। আর যে বিধান ইচ্ছা করেন, বাতিল করেন না। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো আল্লাহ পাক লওহে মাহফুজ থেকে যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন আর যা ইচ্ছা তা বাকি রাখেন। লওহে মাহফুজে যে লেখা রয়েছে আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলে তার স্থলে অন্য কিছু সৃষ্টি করেন। শুধু রিয্‌ক, বয়স এবং কোন লোকের নেককার হওয়া বা বদকার হওয়া– এসব বিষয়ের পরিবর্তন হয়না।

আল্লামা বগভী (রঃ)-এর সূত্র থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বাণী আমাদের নিকট পৌঁছেছে যে, গর্ভধারণের ৪০/৪৫ দিন পর একজন ফেরেশতা প্রবেশ করে এবং আরজ করে, হে আমার প্রতিপালক! এ (শিশু) নেককার হবে কি বদকার? তখন (যা জবাব আসে নেককার কি বদকার) তা লিপিবদ্ধ হয়। এরপর পুনরায় ফেরেশতা আরজ করে, হে পরওয়ারদেগার! পুরুষ হবে কি নারী? তখন এ বিষয়ে লিপিবদ্ধ করা হয়। এরপর তার আমল, বয়স এবং রিয্‌ক লিপিবদ্ধ করা হয়। এরপর তা বন্ধ করে দেয়া হয়। পরবর্তীকালে তাতে কোন কিছু বাড়েওনা, কমেওনা।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীস হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমাদেরকে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আর তিনি ছিলেন সত্যবাদী, আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে তাঁকে সত্যবাদী বানানো হয়েছে। মানব সৃষ্টি মাতৃ উদরে চল্লিশ দিন যাবত নোতফা (শুক্র) রূপে থাকে। এরপর জমাট রক্তে পরিণত হয়, আর এতটুকু সময় গোশ্‌তের টুকরো হয়ে

থাকে। এরপর আল্লাহ পাক তার উদ্দেশ্যে একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন, চারটি কথার জন্যে ঐ ফেরেশতা প্রেরিত হন। ফেরেশতা ঐ ব্যক্তির আমল, তার জীবন, রিযক এবং তার নেককার বা বদকার হওয়া লিপিবদ্ধ করে। এরপর ঐ দেহটির মধ্যে রূহ ফুঁকে দেয়া হয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত ওমর (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, আল্লাহ পাক নেককার এবং বদকার হওয়ার বিষয়টি মিটিয়ে দেন এবং রিযক ও বয়স সম্পর্কেও। বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রাঃ) কা'বা শরীফ তওয়াফ করার সময় ক্রন্দনরত অবস্থায় বলছিলেনঃ হে আল্লাহ! যদি তুমি আমাকে নেককার লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে থাক তবে তাতেই আমাকে কায়েম রাখ। নেককারদের তালিকা থেকে আমার নাম বাদ দিয়োনা, আর যদি আমাকে বদকার লোকদের তালিকাভুক্ত করে থাক, তাহলে তাদের তালিকা থেকে আমার নাম বাদ দিয়ে দাও এবং নেককার লোকদের তালিকাতে আমার নাম লিখে নাও, নিঃসন্দেহে তুমি যার ইচ্ছা তার নাম সংরক্ষণ কর। আর তোমারই নিকট রয়েছে আসল কিতাব।

কোন কোন হাদীসে রয়েছে, কখনও এমনও হয় কোন লোকের বয়স ত্রিশ বছর বাকী থাকে কিন্তু যখন সে আত্মীয়তার বন্ধনকে ছিন্ন করে তখন আল্লাহ পাক তার ত্রিশ বছরকে তিন দিনে রূপান্তরিত করেন। আর কোন কোন লোকের বয়স তিন দিন বাকি থাকে আর সে আত্মীয়-স্বজনের সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করে, তখন সে তিন দিনকে ত্রিশ বছরে পরিণত করা হয়। এরপর আল্লামা বগভী হযরত আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন যে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মানুষের বয়স যখন শুধু তিন ঘণ্টা থাকে তখন আল্লাহ পাক রাতের শেষ প্রহরে নাজিল হন এবং লিপিবদ্ধ গ্রন্থটি দেখেন আর আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ এ গ্রন্থটি দেখতে পারেনা। আল্লাহ পাক যা ইচ্ছা তা মিটিয়ে দেন অথবা যা ইচ্ছা তা বহাল রাখেন।[১]

যা ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করে

এবনে মরদবিয়া বর্ণনা করেন, হযরত আলী (রাঃ) এ আয়াত সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি এরশাদ করেনঃ এ আয়াতের তফসীর বর্ণনা করে আমি তোমার নয়ন মনের তৃপ্তি দেব, আমার মনে হয় আগমনকারী উম্মতদের মনেও এর দ্বারা সান্ত্বনা আসবে। সদকাহ করা, সঠিকভাবে বাপ-মায়ের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা এমন আমল যা ভাগ্যাহত লোকদের ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করে এবং বয়স বৃদ্ধির কারণ হয়।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) মাকামাতে মোজাদ্দেদীয়ায় বর্ণিত একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। হযরত মুজাদ্দেদ (রঃ)-এর দু'পুত্র হযরত মোহাম্মদ সাঈদ এবং হযরত মোহাম্মদ মাসুমের শিক্ষক ছিলেন মোল্লা তাহের লাহোরী। হযরত মোজাদ্দেদ (রঃ) কাশ্‌ফ

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ২৭৩-৭৪

দ্বারা জানতে পারলেন যে, মোল্লা তাহের লাহোরীর কপালে লিপিবদ্ধ আছে বদকার, ভাগ্যাহত। হযরত মুজাদ্দেদ (রঃ) বিষয়টি তাঁর পুত্রদেরকে বললেন। তাঁরাতো মোল্লা তাহেরের শিষ্য ছিলেন। এজন্যে তাঁরা হযরত মুজাদ্দেদ আলফেসানী (রঃ)-এর নিকট আবেদন করলেন যে, আল্লাহ্ পাক যেন তার এ অবস্থাকে পরিবর্তন করে দেন এবং তাকে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত করে দেন। হযরত মোজাদ্দেদ আলফেসানী (রহঃ) বললেন, আমি লওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ দেখেছি এটি তকদীরে মোবরাম, যার পরিবর্তন হয়না। মুজাদ্দেদ আলফেসানী (রঃ) এর পুত্রদ্বয় দোয়া করার জন্যে আবেদন করলেন। হযরত মুজাদ্দেদ (রঃ) তখন বললেন, আমার মনে পড়ছে, হযরত শাহ্ আবদুল কাদের জিলানী (রঃ) বলেছেন, আমার দোয়ায় তকদীরে মোবরাম পরিবর্তন হয়ে যায়। এজন্যে আমি দোয়া করি এবং আল্লাহ্ পাকের দরবারে আরজী পেশ করি, হে আল্লাহ্! তোমার রহমত অনন্ত অসীম, তোমার দান কখনও শেষ হয়না। আমি তোমার নিকট আশা করি এবং তোমার দানের জন্যে আরজ করি যে আমার দোয়া কবুল কর, মোল্লা তাহের লাহোরীর তকদীরে যা লিপিবদ্ধ রয়েছে তা পরিবর্তন করে দাও এবং তাকে নেককারদের অন্তর্ভুক্ত কর। যেভাবে হযরত গওসুল আজম (রঃ)-এর দোয়া কবুল করেছ, এভাবে আমার দোয়াও কবুল কর।

হযরত মুজাদ্দেদ আলফেসানী (রঃ) বর্ণনা করেন, দোয়ার পর এ দৃশ্য আমার চোখের সামনে এসেছে যে মোল্লা তাহেরের কপাল থেকে "শাকী" (বদকার) শব্দটি পরিবর্তন করে লিখে দেয়া হয় "সাঈদ" (নেককার), আর আল্লাহ্ পাকের নিকট এ কাজটি কঠিন নয়।

যাহ্যাক (রঃ) এবং কালবী (রঃ) আলোচ্য আয়াতের

(يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ)

এর এ অর্থ বর্ণনা করেছেন যে, কেরামুন কাতেবীন মানুষের সকল কর্মকান্ডের বিবরণ তাদের দফতরে লিপিবদ্ধ করেন, তন্মধ্যে এমন কিছু কথা ও কাজ থাকে যার কোন সওয়াব বা আজাব হয়না। যেমন কেউ বলে, আমি খেয়েছি, আমি পান করেছি, আমি অমুক স্থানে গিয়েছি ইত্যাদি। একথাগুলো যদি সত্যি হয় তবে এর উপর কোন সওয়াব বা আজাব হয়না। আর কিছু আমল এমনও আছে যার কারণে সওয়াব ও আজাব হয়। যে কথা বা কাজের কারণে সওয়াব বা আজাব হয়না আল্লাহ্ পাক সেগুলো কেরামুন কাতেবীনের দফতর থেকে মুছে দেন। আর যে কথা এবং কাজে সওয়াব বা আজাব হয় সেগুলো আমলনামায় রাখা হয়।

কালবী (রঃ) একথাটি সংযোজন করেছেন যে, বৃহস্পতিবার দিন এমন কথাগুলো মুছে ফেলা হয়।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আতীয়্যা (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি এভাবে দিয়েছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের বিধি-নিষেধ মেনে চলে কিন্তু পরবর্তীকালে আল্লাহর নাফরমানীতে মশগুল হয় এবং পথভ্রষ্ট অবস্থায়ই তার মৃত্যু

হয়, এমন অবস্থায় আল্লাহ পাক তার সাবেক নেক আমল সমূহ মিটিয়ে দেন। যে ব্যক্তি আমৃত্যু আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ মেনে চলে, আল্লাহ পাক তার নেকী কায়েম রাখেন"।

ইমাম মুসলিম হযরত আমর এবনুল আস (রাঃ)-এর সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ সমগ্র মানব জাতির সকল অন্তর একটি মানুষের অন্তরের ন্যায় আল্লাহ পাকের হাতের মুঠোর মধ্যে রয়েছে। তিনি যেমন ইচ্ছা, তাকে ফিরিয়ে দেন। এরপর তিনি দোয়া করেছেন, হে মনের অবস্থা পরিবর্তনকারী! আমাদের অন্তর সমূহ তোমার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দাও, অর্থাৎ তোমার আনুগত্যের উপর আমাদেরকে স্থির রাখ।

হাসান বসরী (রঃ) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেনঃ যে ব্যক্তির মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে আল্লাহ পাক তাকে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দেন আর যার মৃত্যুর সময় আসেনি তাকে কায়েম রাখেন।

সাঈদ এবনে জুবায়ের (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ এর অর্থ হলো, আল্লাহ পাক স্বীয় বন্দার যে কোন গুণাহ ইচ্ছা করলে মাফ করে দেন এবং তা মুছে দেন আর যে কোন গুণাহ তাঁর ইচ্ছা হলে বহাল রাখেন তথা মাফ করেন না।

একরামা (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো, আল্লাহ পাক স্বীয় বন্দাদের কোন গুণাহ ইচ্ছা করলে তার তওবার মাধ্যমে মাফ করে দেন, যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ

"তাদের গুণাহর বদলে নেকী লিপিবদ্ধ করে দেন"।

ইমাম মুসলিম হযরত আবুজর (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন কোন কোন লোককে আল্লাহ পাকের দরবারে পেশ করা হবে। তখন হুকুম হবে এই ব্যক্তির সম্মুখে তার সগীরা গুণাহ সমূহকে রাখ। আদেশ মোতাবেক তার সগীরা গুণাহকে সামনে আনা হবে এবং কবীরা গুণাহকে গোপন রাখা হবে এবং বলা হবে, তুমি অমুক দিন এই কাজ করেছিলে। সে ব্যক্তি স্বীকার করবে তবে কবীরা গুণাহ সম্পর্কে অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে। আল্লাহ পাক হুকুম দেবেন প্রত্যেক গুণাহর বদলে তাকে একটি নেকী দিয়ে দাও। ঐ বন্দা আরজ করবে আমারতো এতদ্ব্যতীত আরো গুণাহ ছিল তা এখানে দেখিনা। বর্ণনাকারী বলেন, একথাটি বর্ণনা করার সময় আমি দেখলাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুচকি হাসলেন।

তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, এ আয়াতের অর্থ হলো আল্লাহ পাক যা ইচ্ছা করেন, তাই হয়ে থাকে, তিনি যা ইচ্ছা করেন মিটিয়ে দেন, আর যা ইচ্ছা করেন তা রাখেন। তাই অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَمَحَوْنَآ اٰيَةَ الَّيْلِ وَجَعَلْنَآ اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً

"আমি রাতের নিদর্শন মিটিয়ে দিয়েছি এবং দিনের নিদর্শন মানুষের সম্মুখে নিয়ে এসেছি"।

রবী (রঃ) আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ আয়াতের সাথে সম্পর্ক হলো রুহের সাথে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا

"আল্লাহ পাক নিদ্রিত অবস্থায় রুহ সমূহকে কবজ করে নেন আর যাকে জীবিত রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করেন তার রুহ্ ফেরত দিয়ে দেন"।

কোন কোন তফসীরকার লিখেছেনঃ যে সব আমল রিয়াকারী এবং খ্যাতি অর্জনের জন্যে করা হয় সেগুলো কেরামুন কাতেবীনের তালিকা থেকে মিটিয়ে দেয়া হয়। আর যে আমল শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় করা হয় তাকে কায়েম রাখেন।

কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন, আল্লাহ পাক একটি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেন আর একটি জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

وَعِنْدَهٗۤ اُمُّ الْكِتٰبِ ○

"আর তাঁরই নিকট রয়েছে উম্মুল কিতাব"।

আলোচ্য আয়াতে "উম্মুল কিতাব" এর অর্থ আল্লাহ্ পাকের এলম। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) যখন হযরত কা'ব (রাঃ)-এর নিকট ام الكتٰب এর অর্থ জিজ্ঞাসা করেন তখন তিনি বলেন, এর অর্থ علم الكتٰب অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের এলম।

একরামা হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ পাকের নিকট দু'টি কিতাব রয়েছে। একটি হলো সে কিতাব, যাতে পরিবর্তন হয় কিছু বিষয় রাখা হয় আর কিছু বিষয় বাতিল করা হয়। আর দ্বিতীয় হলো ام الكتٰب যাতে কোন পরিবর্তন হয়না।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, ام الكتٰب হলো লওহে মাহফুজ, যাতে কোন পরিবর্তন হয়না।

তফসীরকার আতা (রঃ) বলেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ্ পাকের একটি লওহে মাহফুজ রয়েছে যার দৈর্ঘ্য ৫০০ বছরের পথ। যা সাদা মুক্তা দ্বারা তৈরী করা হয়েছে। আল্লাহ্ পাক তার দিকে দৈনিক ৩৩০বার দৃষ্টিপাত করেন, সেখান থেকে যা ইচ্ছা বাতিল করেন যা ইচ্ছা রেখে দেন।

وَاِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِىْ نَعِدُهُمْ

আর যদি (হে রসূল!) আপনার এন্তেকালের পূর্বে এ বিষয়ের কিছু অংশ আপনাকে

দেখিয়ে দেই যার ওয়াদা আমি করেছি অর্থাৎ মুসলমানদেরকে কাফেরদের উপর বিজয়ী করে তাদেরকে শাস্তি দেই, ঐ অবস্থা যদি আপনাকে দেখিয়ে দেয়া হয়, অথবা যদি আপনাকে মৃত্যুমুখে পতিত করি অর্থাৎ আমার ওয়াদা পূর্ণ করার পূর্বেই যদি আপনাকে মৃত্যু প্রদান করি তবে আপনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। কেননা, (فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلٰغُ) আপনার দায়িত্ব হলো আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেয়া-এছাড়া আর কিছুই নয়। আর আমার দায়িত্ব হলো হিসাব নেয়া এবং কেয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া, যখন তারা আমার নিকট আসবে আমি তাদের শাস্তি দেব।

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِى الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ط

মক্কার কাফেররা কি দেখছেনা যে আমি জমিনকে চারদিক থেকে ইসলামের প্রচার-প্রসার দ্বারা ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করছি এবং মক্কার ভূখন্ড এবং কুফরের আয়তন ধীরে ধীরে আমি সংকীর্ণ করে এনেছি।

আল্লামা বগভী (রঃ) বলেছেন, الارض (জমীন) বলতে কাফেরদের জমীন বোঝানো হয়েছে আর কাফেরদের জমীন সংকীর্ণ করার অর্থ হলো মুসলমানদের বিজয়। কেননা, মুসলমানদের বিজয়ের মাধ্যমে কাফেরদের জমীন বেদখল হয়ে যাচ্ছে। ক্রমশঃ মুসলমানদের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। ফলে কাফেরদের জমীন বেহাত হচ্ছে, কাফেরদের শিক্ষা গ্রহণের জন্যে এ দৃষ্টান্ত কি যথেষ্ট নয়?

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

কোন কোন তফসীরকার জমীন ধ্বংস হওয়ার ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো জমীন বিরাণ হওয়া তথা কাফেররা কি লক্ষ্য করেনা যে, ইসলামের অভ্যুত্থান অপ্রতিহত, তাই তাদের এ সত্য বুঝতে কি এখনও বাকী আছে যে, তাদের পরাজয় অবধারিত এবং ইসলামের বিজয় অনিবার্য। এ ব্যাখ্যা করেছেন মুজাহেদ (রঃ) এবং শা'বী (রঃ)।

وَاللّٰهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ط

আর আল্লাহ পাক তাঁর সৃষ্টির ব্যাপারে আদেশ দিয়ে থাকেন। তাঁর হুকুমকে কেউ পরিবর্তন করতে পারেনা। তাঁর সিদ্ধান্ত অটল, অপরিবর্তনীয়, তাতে কোন প্রকার পরিবর্তন অকল্পনীয়। আল্লাহ পাক ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার আদেশ দিয়েছেন, তাই ইসলামের অগ্রযাত্রা অপ্রতিরোধ্য, মুসলমানদের বিজয় সুনিশ্চিত। এ সিদ্ধান্তে এদিক-সেদিক হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

وَهُوَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

আর আল্লাহ পাক অতি সত্তর হিসাব গ্রহণে তৎপর। অর্থাৎ দুনিয়াতে অবাধ্য, কাফেরদের বন্দী করা, হত্যা করা এবং দেশত্যাগের শাস্তিই শেষ নয়; বরং কেয়ামতের দিন তাদের জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের হিসাব নেয়া হবে।

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ۖ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۗ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ﴿٤٢﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ۚ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿٤٣﴾

তরজমা

(৪২) এবং তাদের পূর্ববর্তীরাও ষড়যন্ত্র করেছে, কিন্তু সকল কৌশল মূলতঃ আল্লাহ পাকেরই হাতে। যে যা করে আল্লাহ পাক সবই জানেন, কাফেররা অতি সত্ত্বর জানতে পারবে শুভ-পরিণতি কাদের জন্যে? আর কাফেররা বলে, আপনি আল্লাহর প্রেরিত নন। (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, আমার এবং তোমাদের মধ্যে আল্লাহ পাকের স্বাক্ষ্যই যথেষ্ট এবং যাদের নিকট কিতাব রয়েছে তাদের স্বাক্ষ্যও।

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়েছেন, যেহেতু মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল, তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন যে, ইতিপূর্বেও আম্বিয়ায়ে কেরামের বিরুদ্ধে তথা সত্য ও ন্যায়ের বিরুদ্ধে চক্রান্ত হয়েছিল যেমন নমরুদ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বিরুদ্ধে এবং ফেরাউন হযরত মুসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে এবং ইহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। কাজেই কাফেরদের চক্রান্ত নতুন কিছু নয়। مكر শব্দটির অর্থ হলো গোপন কৌশল। যদি কোন গোপন কৌশল ভাল উদ্দেশ্যে হয়, তবে তা ভাল। পক্ষান্তরে, যদি মন্দ উদ্দেশ্যে গোপন কৌশল হয় তবে তা মন্দ। কিন্তু আল্লাহ পাকের হাতেই রয়েছে সকল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের চাবিকাঠি। যদি আল্লাহ পাকের মর্জি না হয়, তবে কোন ষড়যন্ত্রই কার্যকর হতে পারেনা। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا ۖ

সকল ষড়যন্ত্রের চাবিকাটি আল্লাহ পাকের হাতেই। তিনি সর্ব শক্তিমান, সর্বত্র বিদ্যমান।

يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۗ

প্রত্যেকটি মানুষ কি করে আল্লাহ্ পাক তা সবই জানেন, আল্লাহ্ পাকের নিকট কোন কিছুই গোপন নেই। তাই কাফেরদের যে কোন ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হতে বাধ্য।

وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ○

অদূর ভবিষ্যতে কাফেররা জানতে পারবে যে শুভ-পরিণতি কার জন্যে? কাফেরদের জন্যে, না মুসলমানদের জন্যে। আলহামদুলিল্লাহ্! অতি অল্প সময়ের মধ্যে পবিত্র কোরআনের এ ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হয়েছিল মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে। যখন কাফেরদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ এর অর্থ হলো আখেরাতে মোমেনগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে আর কাফেররা দোজখের কঠিন শাস্তি ভোগ করবে। তখন তারা এ সত্য উপলব্ধি করবে যে শুভ-পরিণতি কাদের জন্যে।[১]

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ط

"আর কাফেররা বলে, আপনি আল্লাহর রসূল নন"।

আলোচ্য আয়াতে كفروا শব্দ দ্বারা মক্কার কাফেরদেরকে অথবা ইহুদী সর্দারদেরকে বোঝানো হয়েছে।

অর্থাৎ হে রসূল! কাফেররা আপনার রেসালতের কথা অস্বীকার করে।

قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ

(হে রসূল!) আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন যে, তোমাদের স্বীকার বা অস্বীকার করায় আমার কিছু যায় আসে না। কেননা, আমার সত্যতা প্রমাণের জন্যে আল্লাহ্ পাকের স্বাক্ষ্যই যথেষ্ট। আর তাঁর স্বাক্ষ্য অকাট্য, জীবন্ত। আল্লাহ্ পাক কেয়ামতের দিন এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেবেন, সেদিন কাফেরদের কাছে কোন ওজর-আপত্তি থাকবেনা।

وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتٰبِ ○

আর এ পর্যায়ে তাদের স্বাক্ষ্যও যথেষ্ট, যাদের নিকট আল্লাহর কিতাবের এলম রয়েছে। অর্থাৎ যে সব আহলে কিতাব ঈমান এনেছেন, যেমন হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে সালাম (রাঃ), হযরত সালমান ফার্সী (রাঃ), হযরত কা'ব (রাঃ) প্রমুখের স্বাক্ষ্য যথেষ্ট। যারা কাফের, যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতকে অস্বীকার করেছে, তারা হিংসা, শত্রুতা এবং অর্থ-সম্পদের অদম্য লোভ-লালসা চরিতার্থ করার অসৎ উদ্দেশ্যেই তা করেছে।

হযরত হাসান এবং মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে الكتب। অর্থ লওহে

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ২৭৯

মাহফুজ। আর وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَبِ বাক্য দ্বারা আল্লাহ পাককে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ হে রসূল! আপনার নবুওয়্যতের সত্যতার স্বাক্ষ্য হিসেবে আল্লাহ পাক যথেষ্ট। যারা আল্লাহ পাকের রসূলকে মিথ্যাজ্ঞান করে, আল্লাহ পাকই তাদের শাস্তি বিধান করবেন।[১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ কাফেররা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতকে অস্বীকার করেছে, তাই আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন, কাফেরদের এ অস্বীকৃতিতে আপনার কোন ক্ষতি নেই। কেননা, স্বয়ং আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন আপনার নবুওয়্যতের স্বাক্ষী। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ পাকই আপনার নবুওয়্যতের সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে আপনাকে অনেক মোজেযা দান করেছেন যা আপনার প্রতি ঈমান আনয়নের জন্যে প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট।[২]

সন্দেহ খন্ডন

প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের ব্যাপারে কাফেরদের তরফ থেকে যে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়, আলোচ্য সূরার শেষাংশের আয়াত সমূহে আল্লাহ পাক উক্ত সন্দেহের জবাবে এরশাদ করেছেনঃ

(১) কাফেরদের একটি সন্দেহ ছিল এই যে, আল্লাহর নবীগণের ফেরেশতাদের ন্যায় স্ত্রী-পুত্র-পরিজন থেকে তথা যাবতীয় মানবিক সম্পর্ক থেকে পবিত্র থাকা উচিত। আল্লাহ পাক এ সন্দেহের জবাবে এরশাদ করেছেনঃ

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ

অর্থাৎ হে রসূল! আপনার পূর্বে যে আম্বিয়ায়ে কেরাম প্রেরিত হয়েছেন, যাদের প্রতি আহলে কেতাবদেরও আস্থা রয়েছে, যেমন হযরত ইব্রাহীম (আঃ), তাঁদের সকলেরই পরিবারবর্গ ছিল। অতএব, আপনার ব্যাপারে এমন প্রশ্ন অবান্তর। এতদ্ব্যতীত, কোন নবীর বিয়ে-শাদী বা সন্তান-সন্ততি হওয়া বা তাদের পানাহার প্রভৃতি কাজ নবুওয়্যতের শানের বরখেলাফ নয়; বরং এতে মানবতার পরিপূর্ণতা সাধিত হয়। ইসলাম জীবন বিমুখ নয়; ইসলাম নির্লিপ্ত জীবনের শিক্ষা দেয়না। আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ) দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিক থেকেই কামেল বা পরিপূর্ণ হয়ে থাকেন, ফলে নবুওয়্যতের মহান দায়িত্ব পালনে তাঁদের পরিবারবর্গ কোন প্রকার বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

(২) কাফেরদের দ্বিতীয় সন্দেহ ছিল এই, ইনি কেমন নবী, যিনি আমাদের আকাংক্ষা মোতাবেক মোজেযা প্রদর্শন করেন না, এর জবাবে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِىَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ২৭৯-৮০
২। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৯, পৃঃ ৬৯

অর্থাৎ- মোযেজা প্রদর্শন নবীর কর্তৃত্বাধীন নয়; বরং তা আল্লাহ পাকের এখতিয়ারভুক্ত। আল্লাহ পাকের অনুমতি ব্যতীত কোন নবী মোজেযা প্রদর্শন করতে পারেন না, মোজেযা প্রদর্শিত হয় আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এবং মর্জিতে, আর তা হয় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং হেকমতপূর্ণ, কারো আকাংক্ষা পূরণের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

(৩) কাফেরদের তৃতীয় সন্দেহ ছিল এই, আমরা আল্লাহর নবীকে অবিশ্বাস করলে যে আজাবের ভয় দেখানো হয়, তা আমাদের প্রতি কেন আপতিত হয় না। এর জবাবে এরশাদ হয়েছেঃ

لِكُلِّ اَجَلٍ كِتَابٌ

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের দরবারে সব কিছুর জন্যে সময় নির্দিষ্ট হয়ে আছে যা ইতিপূর্বে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

ঐ সময় না হওয়া পর্যন্ত সে কাজ হবেনা। প্রত্যেকটি কাজের জন্যে সময়, স্থান, কাল সুনির্দিষ্ট রয়েছে যা অত্যন্ত হেকমতপূর্ণ এবং সময়োপযোগী। সে সময় না হওয়া পর্যন্ত উক্ত কাজটি হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। যখন ঐ সময় আসে তখন নির্দিষ্ট কাজটি হয়ে থাকে, আল্লাহ পাকের এ বিধান কার্যকর হয়ে থাকে।

(৪) কাফেরদের আরো একটি সন্দেহ ছিল এই যে, ইনি কেমন নবী, যিনি তওরাত, ইঞ্জিলের বিধান সমূহকে এমনকি, নিজের শরীয়তের বিধানকে রহিত করে থাকেন এবং বিভিন্ন সময় বিধান সমূহকে পরিবর্তন করে থাকেন। তাদের এ প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ

মূলতঃ আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনিই মালিক মোখতার, সব কিছু তাঁর ইচ্ছাধীন এবং কর্তৃত্বাধীন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সব কিছুই লিপিবদ্ধ রয়েছে তবে তা আক্ষরিকভাবে মেনে চলা আল্লাহ পাকের জন্যে জরুরী নয়। বরং আল্লাহ পাকের ইচ্ছা এবং মর্জি সর্বত্র কার্যকর হয়। তিনি যখন ইচ্ছা এবং যেভাবে ইচ্ছা পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেন। এ ইচ্ছা এবং মর্জি একান্ত তাঁরই। কোন কিছুকে তিনি রহিত করেন অথবা বহাল রাখেন।

وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ

যাদেরকে আমি আসমানী গ্রন্থ দিয়েছি তথা তওরাত, ইঞ্জিল তারা এ দানকে কবুল করেছে এবং এর দ্বারা উপকৃত হয়েছে, আর এজন্যে তারা আনন্দিত। কেননা, তারা তাদের বিবেক-বুদ্ধির নূর দ্বারা আল্লাহ পাকের মা'রেফাত হাসিল করতে পারে। যেমন, আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) এবং নাজরান ও ইয়ামনের খ্রীষ্টানগণ। তারা পবিত্র কোরআনকে বিশ্বাস করে তার দ্বারা উপকৃত হয়েছে। কাফেরদের মধ্যে কিছু লোক কোরআনে করীমের কোন কোন বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনা। এর কারণ হচ্ছে

তাদের জাগতিক স্বার্থ। তাদের এ স্বার্থ-চিন্তাই তাদের হেদায়েত গ্রহণের পথে বাধা স্বরূপ। হে রসূল! আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন যে, তোমরা নিজেদের ব্যাপারে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পার কিন্তু আমার উপর আদেশ হয়েছে যেন আমি এক আল্লাহ্ পাকের এবাদত করি, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক না করি। আল্লাহ্ পাকের দিকেই আমি মানুষকে ডাকি।

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ৩রা রজব ১৪১২ হিজরী মোতাবেক ৯ই জানুয়ারী ১৯৯২, ২৫শে পৌষ ১৩৯৮ রোজ বৃহস্পতিবার সকালে সূরায়ে রা'দ এর তফসীর সমাপ্ত হ'লো। (হে আল্লাহ!) কবুল কর এবং এ মহান তফসীর গ্রন্থকে সম্পূর্ণ করার তওফিক দান কর, অধমের এই সাধনাকে চির নাজাত ও চির শান্তি লাভের উসিলা হিসেবে গ্রহণ কর, আমীন।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৪, পৃঃ ১০৮-০৯

بسم الله الرحمٰن الرحيم

সূরা ইব্রাহীম

سُوْرَةُ اِبْرٰهِيْمَ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ اثْنَتَانِ وَّخَمْسُوْنَ اٰيَةً وَّسَبْعُ رُكُوْعَاتٍ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
الٓرٰ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ
بِاِذْنِ رَبِّهِمْ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ (১) اللّٰهِ الَّذِيْ لَهٗ مَا فِي
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِ (২)
الَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ (৩) وَمَآ
اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّٰهُ
مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (৪) وَلَقَدْ
اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ
وَذَكِّرْهُمْ بِاَيّٰىمِ اللّٰهِ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ (৫)

পরম করুণাময় অসীম দয়াময় আল্লাহ পাকের নামে

তরজমা

(১) এই কিতাব (হে রসূল!) আপনার নিকট নাজিল করেছি যাতে করে আপনি মানব জাতিকে গোমরাহীর অন্ধকার থেকে বের করে, হেদায়েতের আলোর দিকে নিয়ে আসেন তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে, যিনি পরাক্রমশালী, গুণময়।

(২) সেই আল্লাহর পথে-যিনি আসমান ও জমীনে যা কিছু আছে, তার একচ্ছত্র

মালিক। আর কাফেরদের জন্যে আছে কঠিন শাস্তির বিপদ।

(৩) যারা এ জীবনকে পরজীবনের উপর প্রাধান্য দেয় এবং মানুষকে আল্লাহর পথে বাধা দেয় এবং যারা আল্লাহর পথে বক্রতার অনুসন্ধান করে তারা বিভ্রান্তিতে অনেক দূরে সরে পড়েছে।

(৪) আর আমি প্রত্যেক রসূলকেই তার নিজের জাতির ভাষা-ভাষী করে প্রেরণ করেছি যেন তিনি তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন। এরপর আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে পথ ভুলিয়ে দেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে পথ দেখিয়ে থাকেন। আর তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(৫) আর আমি মুসাকে নিদর্শন সমূহ সহ প্রেরণ করি। তাঁকে নির্দেশ প্রদান করি, তোমার জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনয়ন কর এবং তাদেরকে আল্লাহ পাকের দিনগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দাও। নিশ্চয় এতে রয়েছে অনেক নিদর্শন তাদের জন্যে, যারা অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও পরম কৃতজ্ঞ।

সূরা ইব্রাহীম প্রসঙ্গ

এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। এতে ৫২ আয়াত এবং ৭টি রুকু রয়েছে।

নামকরণ

যেহেতু এ সূরায় কা'বা শরীফ এবং হজ্জ সম্পর্কে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়ার উল্লেখ রয়েছে, তাই হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর নামে এর নামকরণ করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দোয়া বাস্তবায়িত হয়েছে হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের মাধ্যমে এবং ইসলামের চতুর্থ রোকন হজ্জ ফরজ হয়েছে, এসবই হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ফজিলত এবং মর্যাদার প্রমাণ। এমনিভাবে হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের দলীল।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্কে

পূর্ববর্তী সূরায় তওহীদ, রেসালত এবং কেয়ামতের আলোচনা ছিল। আর আলোচ্য সূরায়ও অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি এ বিষয় সমূহের প্রতিও আলোকপাত করা হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত, পূর্ববর্তী সূরার শুরুতে পবিত্র কোরআন নাজিল হওয়ার ঘোষণা ছিল, আর এ সূরার শুরুতে কোরআনে করীম নাজিল করার তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে। আর তা হলো, মানুষকে গোমরাহীর অন্ধকার থেকে হেদায়েতের আলোর দিকে নিয়ে আসা।

এমনিভাবে বিগত সূরার ন্যায় এ সূরায়ও ইসলামের বিরুদ্ধে কাফেরদের চক্রান্তের উল্লেখ রয়েছে।

তফসীরুল কোরআন

আলিফ-লাম-রা-। এগুলোকে "হরফে মুকাত্তাআত" বলা হয়। এর অর্থ আল্লাহ পাকই

জানেন।[১]

পূর্ববর্তী সূরার ন্যায় এ সূরার প্রারম্ভেও পবিত্র কোরআনের মাহাত্ম এবং শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে।

كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ

এই কিতাব (হে রসূল!) আপনার নিকট নাজিল করেছি। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআন, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর পৃথিবীর সর্বোত্তম স্থান মক্কায়ে মোয়াজ্জমায়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ

(যেন আপনি মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোকের দিকে নিয়ে আসেন।)

পবিত্র কোরআন নাজিল করার উদ্দেশ্য

আলোচ্য আয়াতাংশে পবিত্র কোরআন নাজিল করার উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে, আর তা হলো, পথভ্রষ্ট মানুষকে সঠিক পথে নিয়ে আসা। যারা গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, যারা পথহারা দিশেহারা তাদেরকে সরল-সঠিক পথ প্রদর্শনই পবিত্র কোরআন নাজিলের উদ্দেশ্য।

আলোচ্য আয়াতে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, এ আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ এই কিতাব পবিত্র কোরআন আমি নাজিল করেছি (হে রসূল!) আপনার নিকট। এর দ্বারা আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের নিকট থেকে অবতীর্ণ মহান আসমানী গ্রন্থ।

দ্বিতীয়তঃ একথাও ঘোষণা করা হয়েছে, যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের রসূল, তাই তাঁর নিকট পবিত্র কোরআন নাজিল করা হয়েছে।

لِتُخْرِجَ النَّاسَ

আলোচ্য বাক্যে সম্বোধন করা হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এবং এরশাদ হয়েছে, (হে রসূল!) মানুষকে গোমরাহীর অন্ধকার থেকে হেদায়েতের আলোর দিকে নিয়ে আসা আপনার দায়িত্ব। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, যদি কেউ পবিত্র কোরআনের শিক্ষা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয়, কিন্তু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসালামের মহান আদর্শের অনুসরণ না করে তবে সে হেদায়েত পাবেনা। এজন্যেই কাদিয়ানীদের মত যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সর্বশেষ নবী মানেনা, তারা মুসলমান নয়।

১। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা তফসীরে নূরুল কোরআনের ১ম খন্ডে স্থান পেয়েছে।

তৃতীয়তঃ আলোচ্য আয়াতে النَّاس শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন বিশেষ দেশ বা জাতির জন্যে নয়; বরং সমগ্র মানব জাতির জন্যে প্রেরিত হয়েছেন। তাই তিনি বিশ্বনবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)। আর পবিত্র কোরআন সমগ্র মানব জাতির হেদায়েতের লক্ষ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই পবিত্র কোরআন হলো বিশ্বগ্রন্থ। অতএব, একথা প্রমাণিত হয় যে, বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের তরফ থেকে বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বগ্রন্থ পবিত্র কোরআন বিশ্ব মানবের হেদায়েতের লক্ষ্যে নাজিল হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত, একথাও প্রণিধানযোগ্য যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হেদায়েত এবং পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষাকে নূর বা হেদায়েত বলা হয়েছে। পবিত্র কোরআন ব্যতীত আর যা কিছু আছে সবই জুলমত বা অন্ধকার।

بِاِذْنِ رَبِّهِمْ

(তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে)

অর্থাৎ- (হে রসূল!) আপনার দায়িত্ব হলো পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার মাধ্যমে মানুষকে হেদায়েত করা। তবে তার জন্যে আল্লাহ পাকের অনুমতি পূর্বশর্ত। যাকে আল্লাহ পাক হেদায়েত করতে ইচ্ছা করেন তাকে হেদায়েত করেন, আর যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত থেকে মাহরুম করেন। অর্থাৎ হেদায়েতের জন্যে আল্লাহ পাকের তওফিক জরুরী। যারা গোমরাহীর অন্ধকার থেকে বের হয়ে আসতে চায়না, তাদেরকে হেদায়েত করা সম্ভব হয়না।

اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝

(হে রসূল!) আল্লাহর অনুমতিক্রমে সমগ্র মানব জাতিকে অন্ধকার থেকে বের করে নূর বা আলোর দিকে-তথা পরাক্রমশালী, গুণময় আল্লাহ পাকের পথের দিকে নিয়ে আসা আপনার কর্তব্য।

اَللّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط

সেই আল্লাহ পাক, যিনি আসমান জমীনের তথা সব কিছুর একচ্ছত্র মালিক।

অতএব, পবিত্র কোরআন নির্দেশিত পথই হলো সকলের জন্যে সাফল্যের পথ। বিশ্ব মানবের মুক্তির মহাসনদ হলো পবিত্র কোরআন। যেভাবে বর্তমান যুগে পৃথিবীর কোন কোন দেশ থেকে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি আসে, আর তার সঙ্গে আসে দক্ষ পরিচালক, যারা যন্ত্রপাতি পরিচালনায় প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। ঠিক এমনিভাবে মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি, মানব জীবন আল্লাহর দান, এ দানের ব্যবহার-বিধি নিয়ে মহান আল্লাহ পাকের মহান বাণী পবিত্র কোরআন আমাদের নিকট নাজিল হয়েছে। তাঁর সঙ্গে আগমন করেছেন প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। যাতে করে তিনি পবিত্র কোরআনের প্রতি

আমল করা হাতে-কলমে বুঝিয়ে দেন। এজন্যেই উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চরিত্র-মাধুর্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি তার প্রতি- উত্তরে বলেছিলেনঃ

كان خلقه القران

"তাঁর চরিত্র মাধুর্য হলো পবিত্র কোরআন"।

অর্থাৎ তিনি ছিলেন জীবন্ত কোরআন যা কোরআনে রয়েছে তারই বাস্তবায়ন পরিলক্ষিত হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পূতঃপবিত্র জীবনে।

অতএব, পবিত্র কোরআনের সঠিক অনুশীলনের জন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ একান্ত জরুরী। কিন্তু যারা পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, তথা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণে অপ্রস্তুত হয়েছে, তাদের জন্যে রয়েছে পররর্তী বাক্যে কঠোর সতর্কবাণী।

وَوَيْلٌ لِّلْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ ○

কঠিন শাস্তি কাফেরদের জন্যে

আলোচ্য আয়াতে ويل শব্দটির অর্থ ধ্বংস, শাস্তি। আর কাফের শব্দ দ্বারা তাদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা সর্বশেষ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআনকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, যারা গোমরাহীর অন্ধকার থেকে হেদায়েতের আলোর দিকে আসতে রাজী হয়নি। কেননা, তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করে। তাই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

اَلَّذِيْنَ يَسْتَحِبُّوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ

যারা দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকে আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের উপর প্রাধান্য দেয়, তারা দুনিয়াকেই সব কিছু মনে করে। আখেরাতের ব্যাপারে তাদের কোন চিন্তাই থাকেনা, দুনিয়ার মায়ায় মোহে তারা এত মুগ্ধ-মত্ত থাকে এবং অন্যকেও মত্ত রাখতে সচেষ্ট থাকে যে, আখেরাতের ব্যাপারে তারা আদৌ চিন্তিত হয়না। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, গোমরাহী এবং পথভ্রষ্টতার মূল ভিত্তিই হলো আখেরাতকে ভুলে যাওয়া এবং দুনিয়া নিয়ে মেতে থাকা। যাদের এ অবস্থা তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে সচেষ্ট হয়না; দুনিয়ার সম্পদ সংগ্রহে থাকে ব্যস্ত, শুধু তাই নয়; বরং তাদের আরেকটি অবস্থা হলো-

وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

"আর যারা আল্লাহর পথে বাধা দেয়"।

অর্থাৎ যারা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করা থেকে মানুষকে বাধা দিত, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথ থেকে মানুষকে বঞ্চিত রাখতে সচেষ্ট

থাকত,

وَيَبْغُوْنَهَا عِوَجًا ؕ

আর যারা আল্লাহর দ্বীনে দোষ-ক্রটি, কলংক খুঁজে বেড়াত, অথবা এর অর্থ হলো দ্বীনে হক্ব পরিহার করে মন্দ পথে অগ্রসর হতো, অথবা এর অর্থ হলো আল্লাহর পথ থেকে বিমুখ হয়ে দুনিয়ার পথ অবলম্বন করত-তথা হারাম বা অবৈধ পন্থায় অর্থ-সম্পদ আহরণে মত্ত থাকত।[১]

اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ۝

তারা সে সব লোক, যারা পথভ্রষ্টতায় অনেক দূরে সরে পড়েছে। অর্থাৎ পথভ্রষ্ট হয়ে এত দূরে সরে পড়েছে যে, সৎপথে ফিরে আসার তাদের আর কোন সম্ভাবনা নেই। যারা দুনিয়াকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেয়, যারা আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিরত রাখার অপচেষ্টা করে, আল্লাহর রসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) অনুসরণ করা থেকে মানুষকে বাধা দেয় এবং আল্লাহ পাকের সরল-সঠিক পথেও খুঁত, কলংক, বক্রতা খুঁজে বেড়ায়, তারা পথভ্রষ্টতায় এত দূরে সরে পড়ে যে, সত্যকে গ্রহণের কোন যোগ্যতা তাদের মধ্যে থাকেনা। এমন পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় যখন আল্লাহর গজবে পতিত হয় তখনই তাদের চেতনা ফিরে আসে, তাদের বন্ধ চোখ উন্মুক্ত হয়, কিন্তু তাদের জন্যে তা তখন আর উপকারী হয়না।

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ

"আর আমি প্রত্যেক পয়গম্বরকেই তার জাতীয় ভাষায় প্রেরণ করেছি যাতে করে তিনি তাদেরকে বুঝিয়ে দেন"।

কাফেরদের একটি সন্দেহ ও তার জবাব

কাফেরদের তরফ থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট পবিত্র কোরআন সম্পর্কে এই সন্দেহ প্রকাশ করা হয় যে, যেহেতু কোরআনে করীম আপনার ভাষায় নাজিল হয়েছে, তাই এতে এ সন্দেহ রয়েছে যে, হয়তো এ গ্রন্থ আপনারই রচিত। যদি আরবী ভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় কোরআন নাজিল হতো তবে আমরা বিশ্বাস করতাম যে, কোরআন আপনার প্রতি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নাজিল হয়েছে।

কাফেরদের এ সন্দেহের জবাবেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ

"আর আমি প্রত্যেক নবীকেই তাঁর জাতীয় ভাষায় প্রেরণ করেছি"।

অর্থাৎ এটি কোন নতুন ঘটনা নয়; বরং যে সম্প্রদায়ের নিকট যে নবীকে প্রেরণ করা

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ২৮২

হয়েছে তিনি সে সম্প্রদায়ের ভাষাতেই কথা বলেছেন।

মূলতঃ মানুষের হেদায়েতের উদ্দেশ্যেই নবী রসূলগণ প্রেরিত হয়েছেন এবং তিনি তাঁর জাতি বা সম্প্রদায়ের ভাষাতেই কথা বলেছেন। এটিই চিরাচরিত নিয়ম, এর ব্যতিক্রম কোন দিনও হয়নি। কেননা নবীর কাজ হলো যাদের নিকট তিনি প্রেরিত হন তাদেরকে বুঝিয়ে দেয়া এবং তাদের নিকট সত্যকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা। তাই তাঁদের জাতীয় ভাষায় ওহী অবতরণ যুক্তিসঙ্গত-এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, অন্যান্য নবীগণ কোন জাতি বিশেষের নিকট প্রেরিত হয়েছেন কিন্তু প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হয়েছে সমগ্র বিশ্ব মানবের উদ্দেশ্যে।

দ্বিতীয়তঃ ইতিপূর্বে যাঁরা নবী ছিলেন তাঁদের জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের নবুওয়্যতও শেষ হয়েছে কিন্তু প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ব্যাপার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণের পরও তাঁর নবুওয়্যত আছে, তাঁর নবুওয়্যত থাকবে।

এখানে উল্লেখ্য, যেহেতু আরববাসী পবিত্র কোরআনের প্রথম শ্রোতা, প্রথম পাঠক। সর্বপ্রথম তাদেরকেই পবিত্র কোরআনের দ্বারা সম্বোধন করা হয়েছে তাই পবিত্র কোরআন আরবী ভাষায় অবতরণ করাও সার্থক হয়েছে। আরবদের তাদের জাতীয় ভাষায় পবিত্র কোরআন সম্পূর্ণ ভাবে বুঝতে কোন অসুবিধা হয়নি; বরং তারা পবিত্র কোরআনের আলো সমগ্র বিশ্বে বিকীরণ করেন এবং বিশ্ববাসীকে পবিত্র কোরআনের মর্মবাণী উপলব্ধি করতে উদ্বুদ্ধ করেন। কি প্রাচ্য, কি প্রতীচ্য- সর্বত্র পবিত্র কোরআনের আলো ছড়িয়ে পড়ে। একটি হিসাব মোতাবেক এ পর্যন্ত পৃথিবীর ৪০০ ভাষায় পবিত্র কোরআনের অনুবাদ হয়েছে। এভাবে আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের আলো বিতরণের তওফিক দান করেছেন। আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এটি আল্লাহ পাকের বিশেষ দয়া এবং মেহেরবানী যে তিনি প্রত্যেক নবীকে তাঁর নিজের জাতীয় ভাষায় প্রেরণ করেছেন, যাতে করে সত্যকে বুঝিয়ে দেয়া তাঁদের পক্ষে সহজ হয়।

মসনদে আহমদে সংকলিত একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রত্যেক নবীকেই আল্লাহ পাক তাঁর জাতীয় ভাষায় প্রেরণ করেছেন যাতে করে সত্য তাদের নিকট সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

মূলতঃ হেদায়েত এবং গোমরাহী আল্লাহ পাকের তরফ থেকে, গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট তারাই হয় যারা এর যোগ্য, আর হেদায়েত তারাই লাভ করে যারা এর যোগ্য।[১]

এখানে এ-ও উল্লেখ্য, প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সমগ্র বিশ্ব মানবের হেদায়েতের জন্যেই প্রেরিত হয়েছেন, কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁকে তাঁর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সত্যের দাওয়াত পৌঁছানোর আদেশ দেয়া হয়েছে। যেমন

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু), পারা-১৩, পৃঃ ৫৫

এরশাদ হয়েছেঃ

وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ

"(হে রসূল!) আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে ভয় প্রদর্শন করুন"।

এরপর এরশাদ হয়েছেঃ

لِتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى

"(হে রসূল!) আপনি যেন মক্কাবাসী ও তার চারিপার্শ্বের লোকদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন"।

তৃতীয় পর্যায়ে এরশাদ হয়েছেঃ

لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اُنْذِرَ اٰبَاءُهُمْ

"যেন আপনি এমন সম্প্রদায়কে ভয় প্রদর্শন করেন যাদের পূর্ব পুরুষকে ভয় প্রদর্শন করা হয়নি"।

এমনি ধারাবাহিকভাবে সমগ্র বিশ্বকে সত্যের প্রতি আহবানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আরববাসী পবিত্র কোরআনের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে তার প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। এজন্যেই প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মানুষ ভাল এবং মন্দের ব্যাপারে কোরায়েশের অনুসারী। (আহমদ ও মুসলিম)

এ হাদীসের মর্ম এই, কোরায়েশের কাফেররাই সর্ব প্রথম অবিশ্বাস করে, এজন্যে কোরায়েশ ব্যতীত অন্যরা তাদের অনুসরণ করে।

কুফরী ও নাফরমানীর ব্যাপারে কোরায়েশরা নেতৃত্ব দেয়। এমনিভাবে কোরায়েশদের মধ্যে যারা ঈমান আনে, তাঁরা অন্যদের পূর্বে ঈমান আনে, অন্যেরা তাঁদের পরে ঈমান আনে, তাই ঈমান আনয়নের ব্যাপারেও তাঁরাই নেতৃত্ব দেয়। তাই ভাল ও মন্দ উভয় অবস্থায়ই কোরায়েশের নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত।

হযরত যরীর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম পন্থা প্রবর্তন করে, তাকে সে পথে চলার এবং সে পথ কায়েম করার সওয়াব প্রদান করা হবে। আর সে পথে যত লোক চলবে (তথা যারা তার অনুসরণ করবে) তাদের সমান সওয়াবও তাকে দেয়া হবে এবং অনুসারীদের সওয়াবে কম করা হবে না। পক্ষান্তরে, যে ইসলামে কোন মন্দ পথ অবলম্বন করবে তার গুণাহ হবে, যারা সে মন্দ পথে চলবে তাদের গুণাহও এ ব্যক্তির হবে। আর তার অনুসারীদের গুণাহ বা শাস্তিও কম হবে না। (মুসলিম শরীফ)

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আলেমগণ আম্বিয়াগণের উত্তরাধিকারী। (আহমদ, তিরমিজী, আবু দাউদ, এবনে মাজা)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু), পারা-১৩, পৃঃ ৫৫

আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ অন্য লোকেরা তোমাদের অনুসারী। মানুষ তোমাদের নিকট বিভিন্ন এলাকা থেকে দ্বীন শিখতে আসে, তোমরা তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করো, তাদেরকে কল্যাণকর উপদেশ দিও।

এবনে মরদবিয়া, কালবীর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, জিব্রাঈল (আঃ)-কে আরবী ভাষায় ওহী প্রদান করা হতো। এরপর জীব্রাঈল (আঃ) প্রত্যেক নবীর নিকট তাঁর জাতীয় ভাষায় ওহী পৌঁছাতেন।

এবনুল মনুজের এবনে আবি হাতেম হযরত সুফিয়ান সওরী (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রতি ওহী শুধু আরবী ভাষায়ই নাজিল হয়েছে। এরপর প্রত্যেক নবী ওহীকে তাঁর জাতীয় ভাষায় অনুবাদ করেছেন। সুফিয়ান সওরী (রঃ) একথাও বলেছেন, কেয়ামতের দিনের ভাষা হবে হিব্রু। আর জান্নাতে যারা যাবেন তাঁরা আবরী ভাষায় কথা বলবেন।

فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ ط

অতঃপর আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে পথভ্রষ্ট করেন, অর্থাৎ ঈমানের তওফিক দেননা। আর যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত করেন তথা ঈমান আনয়নের তওফিক প্রদান করেন এবং সত্যের প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা অন্তরে সৃষ্টি করে দেন।

وَهُوَ الْعَزِيْزُ

তিনিই পরাক্রমশালী, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ কিছু করতে পারেনা, যাকে তিনি হেদায়েত করেন, কেউ তাকে গোমরাহ করতে পারেনা। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন কেউ তাকে হেদায়েত করতে পারেনা।

الْحَكِيْمُ ○

তিনি বিজ্ঞানময়। তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্ত হেকমতপূর্ণ, তাৎপর্যবহ। সে হেকমতের ভিত্তিতেই তিনি কাউকে হেদায়েত করেন এবং যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত থেকে বঞ্চিতও করেন।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا

আর আমি মুসাকে আমার নির্দশন সমূহ দিয়ে প্রেরণ করেছি। আর এ বাণী প্রেরণ করেছি যে, স্বজাতিকে গোমরাহীর অন্ধকার থেকে হেদায়েতের আলোর দিকে নিয়ে আস এবং তাদেরকে আল্লাহর পাকের নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দাও।

بِاَيّٰمِ اللّٰهِ ط

হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ), মুজাহেদ (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ)-এর মতে, এ বাক্যটির অর্থ হলো আল্লাহর নেয়ামত সমূহ। আর মুকাতেল

(রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো সেই ঘটনাবলী যা পূর্বকালের জাতি সমূহের তথা আদ, সামুদ, নূহ প্রভৃতির জীবনে ঘটেছিল। এ মর্মে আয়াতের অর্থ হবে নিজের সম্প্রদায়কে সে সব ঘটনাবলী স্মরণ করিয়ে দাও যা আল্লাহ্ পাক ইতিপূর্বে প্রকাশ করেছেন নেয়ামত হোক বা মসিবত।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

নিশ্চয় এ ঘটনাবলীতে আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের, তাঁর বিস্ময়কর কুদরত হেকমতের বহু নিদর্শন রয়েছে। আল্লাহ পাকের এ নির্দশন তারাই উপলব্ধি করতে পারে যারা বিপদে সবর অবলম্বন করে এবং নেয়ামত পেয়ে শোকর আদায় করে।

صَبَّارٍ

অর্থাৎ সে ব্যক্তি যে বিপদাপদে সবর অবলম্বন করে, এমনিভাবে আল্লাহ্ পাকের বিধি-নিষেধ পালনে এবং পাপাচার থেকে আত্মরক্ষায় সবর অবলম্বন করে।

شَكُورٍ

অর্থাৎ যে আল্লাহ্ পাকের নেয়ামতের জন্যে তাঁর কৃতজ্ঞ হয়। এর দ্বারা ইঙ্গিত রয়েছে এ বিষয়ের উপর যে মোমেন মাত্রেরই সবর এবং শোকর-এ দুটি গুণ অবশ্যই অর্জন করা উচিত।

বায়হাকী শোয়াবুল ঈমানে এবং এবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, সবর হলো অর্ধেক ঈমান, আর একীন হলো পূর্ণ ঈমান। একথাটি যখন আলা এবনে বদরের সম্মুখে আলোচিত হয় তখন তিনি বলেন এ কথাটি কি কোরআনে করীমে নেই? এরপর তিনি আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন এবং বলেন, এটি মোমেন মাত্রেরই বৈশিষ্ট্য যে, তার মধ্যে সবর এবং শোকরের গুণ থাকে।

বায়হাকী হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এই হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ ঈমান দু'টি ভাগের সমষ্টি, একভাগ সবর, অন্য ভাগ শোকর।

তেবরানী মকারেমুল আখলাকে এবং আবু ঈয়ালা একথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, ঈমান হলো সবর এবং ত্যাগের নাম। ইমাম মুসলিম এবং ইমাম আহমদ (রঃ) হযরত সোহায়েবের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মোমেনের বিষয় অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। তার প্রত্যেকটি কাজেই রয়েছে কল্যাণ, মোমেন ব্যতীত আর কারো জন্যে এ সৌভাগ্য নেই। যদি সে সুখ-শান্তি লাভ করে তবে সে শোকর করে আর তা হয় তার জন্যে কল্যাণকর। পক্ষান্তরে, যদি মোমেনের নিকট দুঃখ আসে তবে সে সবর অবলম্বন করে, আর তা-ও হয় তার জন্যে কল্যাণকর।

বায়হাকী হযরত সাদ এবনে আবি ওয়াক্কাসের (রাঃ) সূত্রে আলোচ্য হাদীস এভাবে

বর্ণনা করেছেন, "মোমেনের অবস্থা বিস্ময়কর, যদি তার উপর কোন বিপদ আপতিত হয় তবে সে সওয়াবের আশা করে এবং সবর অবলম্বন করে। আর যদি তার নিকট কোন কল্যাণ পৌঁছে তবে সে আল্লাহ্ পাকের হামদ বর্ণনা করে এবং তাঁর নিকট শোকর আদায় করে"।

মূলতঃ মোমেনকে প্রত্যেক বিষয়েই সওয়াব দান করা হয়। এমনকি যে লোকমা উঠিয়ে সে তার মুখে পুরে দেয় (তার জন্যে) সে সওয়াব পায়। হযরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি নিজে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ হে ঈসা! আমি তোমার পরে এমন এক উম্মত সৃষ্টি করবো, যখন তাদের পছন্দনীয় বস্তু অর্জিত হবে তখন তারা আল্লাহ্ পাকের প্রশংসা করবে, আর যখন তাদের অপছন্দনীয় কোন কিছু হবে তখন তারা সওয়াবের আশা করবে এবং সবর অবলম্বন করবে। অথচ তাদের মধ্যে সহ্য করার শক্তি হবেনা এবং বুদ্ধিও থাকবেনা, তখন হযরত ঈসা (আঃ) আরজ করলেনঃ হে আমার প্রতিপালক! এ গুণ তারা কিভাবে অর্জন করবে? যখন তাদের মধ্যে সহ্য করার শক্তিও থাকবে না এবং বিবেক-বুদ্ধিও থাকবে না।

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ আমি তাদেরকে জ্ঞান বুদ্ধি এবং এলম দান করবো।[১]

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم
مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَ
يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ ۚ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿٦﴾ وَإِذْ
تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي
لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٨﴾

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ২৮৪-৮৬

তরজমা

(৬) আর স্মরণ কর সে সময়কে যখন মুসা তাঁর জাতিকে বলেছিলেন, তোমরা সে নেয়ামতকে স্মরণ কর যা আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে দান করেছেন। যখন তিনি তোমাদেরকে ফেরাউন সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা করেছেন, যারা তোমাদেরকে অত্যন্ত মর্মান্তিক শাস্তি দিত। তোমাদের ছেলেদেরকে হত্যা করতো এবং মেয়েদেরকে জীবিত রাখতো। এতে ছিল তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এক মহা পরীক্ষা।

(৭) আর স্মরণ কর তোমাদের প্রতিপালককে যখন তিনি ঘোষণা করেন যে, যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর তবে তোমাদের নেয়ামত বৃদ্ধি করে দেব। আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও তবে (জেনে রেখো যে) আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।

(৮) আর যখন মুসা বলেন, তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেই যদি কুফরী ও নাফরমানী কর তবু আল্লাহ্ পাকের কোন পরওয়া নেই, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক অভাবমুক্ত এবং চির প্রশংসনীয়।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে ঘোষণা করা হয়েছে যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এজন্যে প্রেরণ করা হয়েছে, যেন তিনি মানব জাতিকে গোমরাহীর অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন। এরপর আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামতের উল্লেখ রয়েছে। এমনিভাবে আলোচ্য আয়াত সমূহে একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, অন্যান্য নবীগণকেও এই একই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়েছে এবং অন্য নবীগণের উম্মত তাদের নবীদের সঙ্গে যে অন্যায় আচরণ করেছে এবং তাঁরা কিভাবে সবর করেছেন তার বিবরণও এতে স্থান পেয়েছে।

এ পর্যায়ে আলোচ্য আয়াত সমূহে হযরত মূসা (আঃ)-এর উল্লেখ রয়েছে।[১]

وَاِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهٖ

আর যখন মুসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন, আল্লাহ্ পাক তোমাদের প্রতি যে সব নেয়ামত দান করেছেন সেগুলোর কথা স্মরণ কর তথা ঐ নেয়ামত সমূহের জন্যে আল্লাহ্ পাকের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ মোতাবেক হযরত মুসা (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত সমূহ স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে ফেরাউনের অকথ্য জুলুম থেকে রক্ষা করেছেন, সে তোমাদেরকে ছেলেদের হত্যা করতো, শুধু মেয়েদেরকে জীবিত রাখতো। আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৯, পৃঃ ৮৩

এমন জুলুম থেকে নাজাত দিয়েছেন, এটি এত বড় নেয়ামত যে তোমরা শোকর আদায় করতেও সক্ষম নও।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে "আজাব" শব্দ দ্বারা বণী ইসরাঈলকে গোলাম বানানোর কথা উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, ফেরাউন বণী ইসরাঈলকে গোলাম বানিয়ে তাদেরকে বেগার খাটাতো, তাদের ছেলেদেরকে হত্যা করতো এবং মেয়েদেরকে জীবিত রাখত। আল্লাহ পাক দয়া করে বণী ইসরাঈলকে এমন কঠিন বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন এবং ফেরাউনকে লোহিত সাগরে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ

আর যখন তোমাদের প্রতিপালক এ ঘোষণা করলেন যে, যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামতের জন্যে শোকরগুজার হও তবে আমি অবশ্যই নেয়ামত বৃদ্ধি করে দেব। কিন্তু যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, তবে নিশ্চয় আমার আজাব অত্যন্ত কঠিন। আলোচ্য বাক্যের বক্তব্যও হযরত মুসা (আঃ)-এর কথার অংশ।

আলোচ্য আয়াতে শোকরগুজারীর তাৎপর্য হলো আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়ন করা এবং আল্লাহর নবীর নির্দেশ মেনে চলা। আল্লাহর নেয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে আল্লাহ পাক নেয়ামত বৃদ্ধি করে দেন।

অতএব, শোকরগুজারী হলো নেয়ামত বৃদ্ধির কারণ, অর্থাৎ যদি নেয়ামতের শোকর আদায় করা হয় তবে লব্ধ নেয়ামত তো থাকেই, তদুপরি নূতন নেয়ামতও লাভ হয়। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ "যাকে শোকর আদায়ের তওফিক দেয়া হয়েছে সে নেয়ামত বৃদ্ধি থেকে মাহরুম হবে না" (এবনে মরদবিয়া, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের সূত্রে)।

কোন কোন তফসীরকার লিখেছেনঃ আয়াতের অর্থ হলো, যদি আল্লাহ পাকের আনুগত্যের মাধ্যমে তোমরা শোকর আদায় কর তবে আমি তোমাদের সওয়াব বৃদ্ধি করে দেব।

وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِىْ لَشَدِيْدٌ ○

"আর যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও, তবে জেনে রেখ, আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর, কঠিন"।

আর সেই কঠিন শাস্তিই তোমাদেরকে দেয়া হবে। দুনিয়াতে আমার নেয়ামত থেকে তোমাদেরকে বঞ্চিত করব এবং আখেরাতে তোমরা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াত সম্পর্কে লিখেছেনঃ নেয়ামতের শোকর আদায় করা হলে নেয়ামত বৃদ্ধি করার ঘোষণা রয়েছে সুস্পষ্ট ভাষায়। আর নেয়ামতের জন্যে শোকর আদায় না করা হলে কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

এ শাস্তি প্রদান করা বা না করা সম্পূর্ণ আল্লাহ পাকের ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা করলে তিনি শাস্তি দিতে পারেন, ইচ্ছা করলে তিনি মাফও করতে পারেন।

অতএব, কথা এবং কাজে, আচার-আচরণে আল্লাহ পাকের নেয়ামতের শোকর আদায় করা একান্ত কর্তব্য। কেননা, এটিই নিশ্চিতভাবে নেয়ামত বৃদ্ধির কারণ হয়।

পক্ষান্তরে, যদি অকৃতজ্ঞতা এবং নিমকহারামী পরিলক্ষিত হয়, তবে প্রাপ্ত নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়ার এবং আখেরাতে কঠিন শাস্তি দেয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত মুসা (আঃ) তাঁর জাতিকে একথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, যদি তোমরা আল্লাহ পাকের শোকর আদায় কর, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাক, তবে আল্লাহ পাক তোমাদের জন্যে তাঁর নেয়ামত বৃদ্ধি করে দেবেন। দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে তোমরা উপকৃত হবে। আর যদি তোমরা আল্লাহ পাকের দরবারে শোকরগুজার না হও, তবে তার ভয়াবহ পরিণতি তোমাদেরকে ভোগ করতে হবে, আর তা হবে অত্যন্ত কঠিন শাস্তি।

মসনদে আহমদে সংকলিত একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ)। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে একজন সাহায্য-প্রার্থী হাযির হয়। তিনি তাকে একটি খেজুর দান করলেন। কিন্তু সে রাগ করলো এবং তা গ্রহণ করলো না। এরপর আর একজন সাহায্য-প্রার্থী হাযির হলো, তিনি তাকে ঐ খেজুরটি দান করলেন, সে অত্যন্ত খুশী হয়ে খেজুরটি গ্রহণ করে বললোঃ "আল্লাহর রসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) দান"। তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে ২০ দেরহাম প্রদানের আদেশ দিলেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বাঁদীকে বললেনঃ "এই লোকটিকে নিয়ে যাও, আর উম্মে সালমার নিকট ৪০ দেরহাম রয়েছে তা তাকে দিয়ে দাও"।

وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

অর্থাৎ মুসা (আঃ) তাঁর জাতিকে একথা বললেনঃ যদি তোমরা এবং সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একত্রিত হয়ে আল্লাহর নাফরমানী কর, তাঁর কিছুই ক্ষতি হওয়ার নেই। তোমাদের অকৃতজ্ঞতার শোচনীয় পরিণাম নির্মমভাবে তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে। তিনি যেমন আছেন তেমনই থাকবেন।

فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

কেননা, নিশ্চয় আল্লাহ পাক কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি স্বয়ং প্রশংসিত, তাঁর হামদ চিরস্থায়ী।

মুসলিম শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ হে আমার বন্দাগণ! তোমরা মানব দানব মিলে যদি অনুগত হও তবুও তাতে কিছু বৃদ্ধি পাবেনা, আর যদি নাফরমানী কর তাতেও তাঁর কোন ক্ষতি হবে না।[১]

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু), পারা-১৩, পৃঃ ৫৭

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ مِن
قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ۛ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ ۛ لَا يَعْلَمُهُمْ
إِلَّا اللَّهُ ۚ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ
وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا
إِلَيْهِ مُرِيبٍ (৯) قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَ
الْأَرْضِ ۖ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ
أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن
تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ (১০)

তরজমা

(৯) তোমাদের পূর্ববর্তী নূহের জাতি, আদ, সামুদ এবং তার পূর্ববর্তী জাতিগুলোর খবর কি তোমাদের নিকট আসেনি? তাদের বিষয় আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কেউ জানেনা, তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন সমূহ নিয়ে তাদের রসূলগণ এসেছিলেন। কিন্তু তারা তাদের হাত মুখে স্থাপন করে বলতো, তোমরা যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছ আমরা তা মানিনা। তোমরা যে পথে আমাদেরকে আহবান করছো তাতে আমাদের সন্দেহ রয়েছে।

(১০) তাদের রসূলগণ বলেছিলেন, আল্লাহ পাক সম্পর্কে কি তোমাদের কোন সন্দেহ আছে? যিনি আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন, যিনি তোমাদেরকে আহবান করেন তোমাদের গুনাহ মাফ করার জন্যে এবং একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তোমাদেরকে অবকাশ দেয়ার জন্যে। তারা বলতো, তোমরাতো আমাদেরই ন্যায় মানুষ, আমাদের পূর্ব পুরুষ যাদের এবাদত করতো তোমরা তাদের এবাদত থেকে আমাদেরকে বিরত রাখতে চাও। অতএব, তোমরা আমাদের নিকট কোন অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত কর।

তফসীরুল কোরআন

হযরত মুসা (আঃ) তাঁর জাতিকে আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, তোমরা পূর্ববর্তী জাতিগুলোর অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। নূহ (আঃ)-এর জাতি, আদ, সামুদ জাতি সহ কত জাতি কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। তোমরা কি তার খবর রাখনা? তাদের বিস্তারিত বৃত্তান্ত আল্লাহ পাক ব্যতীত কেউ জানেনা। তাই এরশাদ

হয়েছেঃ

لَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا اللّٰهُ

"কত জাতি তাদের অপকর্মের পরিণাম স্বরূপ পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তা শুধু আল্লাহ পাকই জানেন, আর কেউ নয়"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাউসদ (রাঃ) এ আয়াত তেলাওয়াত করে বলেছেনঃ বংশধারা বর্ণনাকারীরা মিথ্যাবাদী।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং আদনানের মধ্যে তিন হাজার বছর অতিবাহিত হয়েছে যার সম্পর্কে আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কেউ জানেনা।

হযরত ইমাম মালেক (রঃ) এ বিষয় পছন্দ করতেন না তথা বৈধ মনে করতেন না যে, কোন ব্যক্তি তার বংশধারা বর্ণনা করে আদম (আঃ) পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

যাহোক, আলোচ্য আয়াতে হযরত মুসা (আঃ) তাঁর জাতিকে আল্লাহ পাকের নাফরমানীর ব্যাপারে সতর্ক করে বলেছেন, তোমরা কি তাদের খবর রাখনা যারা তাদের অন্যায়-অনাচারের কারণে মর্মান্তিকভাবে চিরতরে ধ্বংস হয়ে গেছে?

جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ

অথচ তাদের নিকট সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ তথা মোজেযা নিয়ে নবী রসূলগণ আগমন করেছিলেন কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা আল্লাহর নবী রসূলগণের আহবান প্রত্যাখান করেছে।

فَرَدُّوْا اَيْدِيَهُمْ فِىْ اَفْوَاهِهِمْ

তারা তাদের হাতকে নিজেদের মুখে স্থাপন করে।

এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, নবী রসূলগণের আহবানে তারা রাগান্বিত হয়ে নিজেদের হাত নিজেদের দাঁত দ্বারা কর্তন করতে থাকে। যেমন অন্য আয়াতে এ মর্মটি লক্ষ্য করা যায়ঃ

عَضُّوْا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ

এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ যখন তারা আল্লাহর কিতাব শ্রবণ করলো তখন আশ্চর্যন্বিত হলো। তাই আশ্চর্য অথবা বিদ্রুপ করে নিজেদের হাত মুখে রেখে দিল। যেমন, কোন কোন লোক অট্টহাসি চেপে রাখার জন্যে মুখে হাত রেখে দেয়।

কালবী (রঃ) বলেছেন, এ বাক্যটির অর্থ হলো তারা মুখের উপর নিজের হাত রেখে নবী রসূলগণকে ইঙ্গিত করেছে যে আপনারা রসনা বন্ধ রাখুন, এসব কথা বলবেন না।

মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, তারা নবী রসূলগণকে নীরব করার জন্যে নিজেদের হাত তাদের মুখের উপর স্থাপন করে এবং তাদেরকে নীরব করে রাখে। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীর মতে, ايدى শব্দটির অর্থ হলো নেয়ামত সমূহ অর্থাৎ নবী রসূলগণের নসিহত সমূহ, শরীয়তের বিধান সমূহ এবং ওহী অর্থাৎ তারা নবী রসূলগণের বিধি-নিষেধ এবং তাঁদের শরীয়তকে তাঁদের মুখের উপর ফিরিয়ে দিয়েছে তথা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে। মুজাহেদ এবং কাতাদা (রঃ) এ অর্থ বর্ণনা করেছেন। প্রবাদ বাক্য আছে যে, "আমি তার কথা তার মুখের উপর ফেরত দিয়েছি", অর্থাৎ তাকে মিথ্যাজ্ঞান করেছি। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, তারা নিজেদের ভাষায় আম্বিয়ায়ে কেরামের বিধি-নিষেধকে অস্বীকার করেছে এবং নবী রসূলগণের নসিহত সমূহকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।[১]

আলোচ্য বাক্য দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, নবী রসূলগণের বক্তব্য শ্রবণ করে কাফেররা অত্যন্ত উত্তেজনায় নিজেদের মুখেই নিজের হাত কাটতে থাকে। আল্লাহর নবীর কথায় উত্তেজিত হয়ে নবী রসূলগণের মুখ বন্ধ করার জন্যে মুখের কাছে হাত নিয়ে তারা নীরব থাকতে সংকেত দেয়।

وَقَالُوْا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهٖ

"আর তারা বলে তোমরা যে বিধান নিয়ে প্রেরিত হয়েছ আমরা তা মানিনা"।

ভাগ্যাহত লোকেরা পয়গম্বরগণের আহবানে সাড়া দেয়াতো দূরের কথা; বরং তারা সে আহবানকে উপেক্ষা করে এবং তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়, আল্লাহর নেয়ামতকে প্রত্যাখ্যান করে তারা বলে,

وَاِنَّا لَفِىْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ ○

অর্থাৎ তোমরা যে বিষয়ের প্রতি আমাদেরকে আহবান কর সে সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ রয়েছে, তারই জবাবে আল্লাহ রসূলগণ বলেছেনঃ

قَالَتْ رُسُلُهُمْ اَفِى اللّٰهِ شَكٌّ

তোমরা কি আল্লাহ পাকের ব্যাপারে সন্দেহ করছো? অথচ আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব এবং একত্ববাদে কোন সন্দেহ হতেই পারেনা। কোন সুস্থ বুদ্ধি-সম্পন্ন মানুষ এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ করতে পারেনা। সমগ্র সৃষ্টি জগৎ তথা নিখিল বিশ্বের প্রতিটি অনু-পরমাণু তার স্রষ্টার অস্তিত্বের ও একত্ববাদের জীবন্ত সাক্ষী।

فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط

আসমান জমিনের তিনিই স্রষ্টা, আকাশ-পাতালের সকল নিয়ম-শৃংখলা এবং যাবতীয় সুব্যবস্থার তিনিই প্রবর্তক। আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ,

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ২৮৭-৮৮

পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী এক কথায় সমগ্র বিশ্ব জগতের তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা, তিনিই রিয্ক দাতা, তিনিই ভাগ্য-নিয়ন্তা, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি বিজ্ঞানময়, তাঁর অদৃশ্য মহাশক্তিই সর্বত্র বিদ্যমান, সর্বত্র কার্যকর, তিনি সর্বশক্তিমান, সর্ব গুণাকর। অতএব, তাঁর প্রতিই বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

يَدْعُوكُمْ

তিনি আমাদেরকে প্রেরণ করে তোমাদেরকে আহ্বান করছেন যেন তোমরা এক আল্লাহর পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন কর। তিনি পরম করুণাময়, তিনি অনন্ত অসীম দয়াময়। তোমরা তাঁর তওহীদ বা একত্ববাদে বিশ্বাস কর, তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন কর, তিনি এজন্যে তোমাদেরকে সাদর আহ্বান জানাচ্ছেন। ইতিপূর্বে যা কিছু হয়েছে যা কিছু তোমরা করেছ, এখনও যদি সেসব অন্যায়-অনাচার পরিত্যাগ করে তাঁর দরবারে হাযির হও -

لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ

তিনি তোমাদের যাবতীয় গুণাহ মাফ করে দেবেন তথা তিনি তোমাদেরকে মাফফেরাতের দিকে ডাকেন। অথবা এর অর্থ হলো, তিনি তোমাদের যাবতীয় গুণাহ মাফ করার জন্যে ডাকেন।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ ইসলাম সে সমস্ত গুনাহকে দূরীভূত করে যা মুসলমান হওয়ার পূর্বে কারো দ্বারা হয়ে থাকে। (মুসলিম শরীফ)

مِنْ ذُنُوبِكُمْ

(তোমাদের গুণাহ সমূহ থেকে)

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর অর্থ হলো ইসলাম গ্রহণের কারণে সে গুণাহ মাফ হয়ে যায় যা আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্কীয় তথা হক্কুল্লাহ কিন্তু হক্কুল এবাদ বা বন্দার হক্ব মাফ হয়না।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী একথাও বলেছেন, কাফেরদেরকে মাগফেরাতের যে কথা বলা হয়েছে তা হলো ঈমানের শর্ত-সাপেক্ষ তথা যদি ঈমান আনয়ন করে তবে পূর্বকৃত গুণাহ মাফ হয়ে যাবে।

وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ط

আর তোমাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আল্লাহ পাক অবকাশ দিয়ে থাকেন, ঐ সময় আসা পর্যন্ত তোমাদের প্রতি আজাবকে তরান্বিত করেন না।

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, অতীতে যে সব জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে তা তাদের কুফরী ও নাফরমানীর কারণেই করা হয়েছে। যদি তারা ঈমান আনতো তবে তাদের বয়স সুদীর্ঘ হতো এবং বয়স শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে মৃত্যুমুখে পতিত করা

হতো না।

قَالُوٓا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ط

কাফেররা নবী রসূলগণকে বলেছিল, তোমরা আমাদের ন্যায় মানুষই, তোমরা আসমানের ফেরেশতা নও, মানব জাতির উর্ধ্বে কিছু নও, বরং তোমরা আমাদের ন্যায় রক্ত-মাংসের মানুষই, সৃষ্টিগত দিক থেকে, আকৃতিতে তোমরা আমাদেরই ন্যায়। এমন অবস্থায় আমরা কিভাবে তোমাদের প্রতি বিশ্বাস করি? তোমাদের কি বৈশিষ্ট্য রয়েছে? যদি আল্লাহ পাক কোন নবী রসূল প্রেরণ করার সিদ্ধান্তই করে থাকেন তবে এমন কাউকে প্রেরণ করতেন যে মানুষের চেয়ে উত্তম হতো।

تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا

মূলতঃ তোমাদের উদ্দেশ্য হলো তোমরা আমাদেরকে আমাদের পিতামহের সনাতন ধর্ম থেকে বিরত রাখতে চাও। আমাদের পূর্ব পুরুষরা যাদের পূজা করেছে তোমরা আমাদেরকে তা থেকে বিরত রাখতে চাও। তোমরা তোমাদের দল বড় করতে চাও। যদি তবু তোমরা নিজেদেরকে আল্লাহর প্রেরিত নবী বলে দাবী কর তবে-

فَأْتُونَا بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ○

এমন কোন প্রকাশ্য দলিল প্রমাণ ও প্রামাণ্য সনদ পেশ কর, যার দ্বারা তোমাদের নবুওয়্যতের দাবী সত্য প্রমাণিত হয়, যাতে আমরা তোমাদেরকে আল্লাহর রসূল বলে বিশ্বাস করতে বাধ্য হই। কাফেররা নবীগণের সুস্পষ্ট মোজেযাকে অস্বীকার করে শুধু কলহ-দ্বন্দ্ব এবং জেদের বশবর্তী হয়ে ফরমায়েশী মোজেযা দাবী করে।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ২৮৯

قَالَتْ
لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَّأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ
اللَّهِ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى
اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ۚ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ
فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١٢﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ
مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۖ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ
الظَّالِمِينَ ﴿١٣﴾ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ ذَٰلِكَ
لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿١٤﴾

তরজমা

(১১) তাদের রসূলগণ তাদেরকে বলেন, আমরা তোমাদেরই ন্যায় মানুষ বটে, কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁর বন্দাগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করে থাকেন। আল্লাহ পাকের অনুমতি ব্যতীত তোমাদের নিকট কোন দলিল-প্রমাণ উপস্থিত করার শক্তি আমাদের নেই। আর মোমেনগণের একমাত্র আল্লাহ পাকের উপরই ভরসা করা উচিত।

(১২) আর আমরা আল্লাহ পাকের উপর কেন ভরষা করবোনা? তিনিইতো আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন, তোমরা আমাদেরকে যে কষ্ট দিচ্ছ, তাতে আমরা অবশ্যই সবর করব। আর ভরষাকারীগণের আল্লাহ পাকের উপরই ভরসা করা উচিত।

(১৩) আর কাফেররা তাদের রসূলগণকে বলে, আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে অবশ্যই বের করে দেব, অথবা তোমাদেরকে আমাদের ধর্মে অবশ্যই ফিরে আসতে হবে। অতঃপর রসূলগণের নিকট তাদের প্রতিপালক ওহী প্রেরণ করলেন, আমি জালেমদেরকে অবশ্যই বিনাশ করবো।

(১৪) এবং তাদের পরে আমি তোমাদেরকে দেশে প্রতিষ্ঠিত করবো। এ সৌভাগ্য তারাই লাভ করবে, যারা আমার সম্মুখে দাঁড়াতে ভয় পায় এবং যারা আমার আজাবের কথাকে ভয় করে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে আম্বিয়ায়ে কেরামের নবুওয়্যতের ব্যাপারে কাফেরদের সন্দেহের উল্লেখ ছিল। তারা বলেছিলঃ

إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا

অর্থাৎ আপনারাতো আমাদেরই ন্যায় মানুষ তাহলে আপনারা নবী হলেন কি করে?

আলোচ্য আয়াতে এ প্রশ্নেরই জবাব দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ

অর্থাৎ রসূলগণ কাফেরদেরকে বললেঃ এতে কোন সন্দেহ নেই, আমরা তোমাদের ন্যায় মানুষই। আর নবুওয়্যতের পদ মানুষই লাভ করে। আল্লাহ পাক যাকে অনুগ্রহ-ধন্য করেন, তাঁরাই এ পদ লাভ করেন। এটি নিতান্ত আল্লাহ পাকের দয়া এবং মেহেরবানীর ব্যাপার, তিনি যাকে এ উচ্চ মর্যাদা দানের জন্যে পছন্দ করেন, মানুষের মধ্যে সে-ই এ দানে ধন্য হয়।

কাফেরদের দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, যদি আপনারা সত্য নবী হন তাহলে আমাদের ফরমায়েশ মোতাবেক মোজেযা কেন প্রদর্শন করেন না?

এর জবাবে আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

অর্থাৎ নবুওয়্যতের দলীল হিসেবে যেসব মোজেযা ইতিপূর্বে প্রদর্শন করা হয়েছে, ঈমান আনয়নের জন্যে তা যথেষ্ট। আর তোমরা যে মোজেযা প্রদর্শনের দাবী করেছ, তা নিতান্ত বাড়তি বিষয়।

এখানে উল্লেখ্য, আল্লাহ পাকের অনুমতি ব্যতীত কোন নবীর পক্ষে মোজেযা প্রকাশ করা সম্ভব নয়, আর এটি তাঁদের কাজও নয়। কোন মোজেযা আল্লাহ পাকের আদেশ ব্যতীত প্রদর্শন করা হয়না। এটি সম্পূর্ণ আল্লাহর পাকের মর্জির ব্যাপারে। যখন আম্বিয়ায়ে কেরাম কাফেরদের সন্দেহের জবাব দিয়েছেন, তখন তারা নিরুত্তর হয়ে আম্বিয়ায়ে কেরামকে ক্ষতিসাধনের ভয় দেখাতে লাগল। তারই জবাবে পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝

অর্থাৎ মোমেনদের আল্লাহ পাকের উপরই ভরসা করা উচিত।

অর্থাৎ তোমাদের ভয় প্রদর্শনে আমরা ভীত হইনা। আমরা ভরসা করি সর্বশক্তিমান

আল্লাহ পাকের প্রতি।

অতএব, আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ ভরসা রাখাই হলো মোমেনের কর্তব্য এবং বৈশিষ্ট্য। নবীগণের একথার মাধ্যমে দুনিয়ার সকল মোমেনের জন্যে পথ-নির্দেশ রয়েছে যে, কাফেরদের মোকাবেলায় তোমাদের এক আল্লাহ পাকের প্রতিই ভরসা করা উচিত এবং আল্লাহর প্রতি ভরসার একথা সকলকে জানিয়ে দেয়া উচিত।

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করা মূলতঃ ঈমানের দাবী। কেননা, একথা সর্বজনবিদিত যে, ভাল-মন্দ কোন কিছুই আল্লাহ পাকের হুকুম ব্যতীত হয় না। এজন্যে সব বিষয়ে আল্লাহ পাকের হুকুমের জন্যে সবর করা মোমেনের বৈশিষ্ট্য।

وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ط

আর আমরা আল্লাহ পাকের প্রতি কেনইবা নির্ভর করবো না, আমরা যে তাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামত অহরহ ভোগ করে চলেছি। তিনিই তো আমাদেরকে শান্তি, মুক্তি ও কল্যাণের পথ দেখিয়েছেন, তিনিই তো আমাদেরকে হেদায়েত করেছেন। তিনিই তো আমাদেরকে তওহীদের প্রতি ঈমান আনয়নের তওফিক দান করেছেন। তাঁর দয়ার ধন্য হয়েই আমরা অবগত হয়েছি যে, সবকিছু আল্লাহ পাকের হাতেই রয়েছে। এতদসত্ত্বেও কি আমরা আল্লাহর পাকের প্রতি ভরসা করবো না? অতএব, তোমরা যা কিছুই কর না কেন এবং তোমরা আমাদেরকে যত কষ্টই দাওনা কেন, আমরা এবং আমাদের মোমেন সাথীগণ এক আল্লাহ পাকের প্রতিই ভরসা করবো এবং তোমাদের অন্যায় আচরণের উপর সবর করবো।

সবর ও তাওয়াক্কুল

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র কোরআন সত্য-সাধকদের জন্যে এ আয়াতে দু'টি কর্মসূচী পেশ করেছেঃ

(১) যত দুঃখ-কষ্টই আসুক না কেন আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ ভরসা রাখতে হবে। সর্ব শক্তিমান আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসাই মর্দে মোমেনের মনে শান্তি এবং সান্ত্বনা আনে।

(২) শত দুঃখ-কষ্টের মাঝেও বিচলিত হওয়া বা ধৈর্য্যহারা হওয়া মোমেনের পক্ষে শোভনীয় নয়; বরং একমাত্র পথ হলো সবর অবলম্বন করা, আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখা।

কেননা, ধৈর্য ধারণের মাধ্যমেই সাফল্য অর্জন করা যায়। পরবর্তী আয়াতে পুনরায় আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করার তাগিদ করে এরশাদ হয়েছেঃ

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ○

অতএব, ভরসাকারীদের এক আল্লাহ পাকের প্রতিই ভরসা করা কর্তব্য।

আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, বন্দার বন্দেগীর পরিপূর্ণতা অর্জিত হয় আল্লাহ্ পাকের প্রতি ভরসা ও আল্লাহ্ পাকের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণের মাধ্যমে, আর কারো প্রতি নয় এমনকি, নিজের তদবিরের উপরও নয়।

তাওয়াক্কুলের তাৎপর্য

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে তাওয়াক্কুল করার অর্থ চেষ্টা-তদবির পরিহার করা নয়। নবী রসূলগণ আল্লাহ্ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ ভরসা রেখেও চেষ্টা-তদবির পরিহার করেননি। অবশ্য চেষ্টা-তদবিরকে কখনও সাফল্যের কারণ মনে করেননি, পরিণাম আল্লাহ্ পাকের হাতে, সাফল্য আল্লাহ্ পাকের দান। তাই এ দান লাভের আশায় তাঁরা আশান্বিত থাকতেন এবং সত্য-সাধনা অব্যাহত রাখতেন।[১]

যেমন প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনা মোনাওয়ারায় ১০ বছর অবস্থান করেন, আর এ সময়ের মধ্যে তাঁকে ৮০টি যুদ্ধ করতে হয়েছে, ২৭টি যুদ্ধে তিনি স্বয়ং সেনাপতি ছিলেন, অবশিষ্ট ৫৩টি যুদ্ধে তিনি সাহাবায়ে কেরামকে (রাঃ) প্রেরণ করেন।

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَا

"আর কাফেররা তাদের রসূলগণকে বলে, আমরা তোমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে অবশ্যই বের করে দেব, অথবা তোমাদেরকে আমাদের ধর্মে অবশ্যই ফিরে আসতে হবে"।

যখন কোন সম্প্রদায় কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দাড়িয়ে যায় এবং বিরোধীদের কাছে শক্তি-সামর্থ্য থাকে, এমন অবস্থায় দুশমনের হুমকি-ধমকিতে প্রভাবান্বিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। এজন্যে পরবর্তী বাক্যে নবী রসূলগণকে আল্লাহ্ পাক যে সান্ত্বনা প্রদান করেছেন, তার উল্লেখ রয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তাঁর রসূলগণের নিকট ওহী প্রেরণ করে জানিয়ে দিলেনঃ

لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ ○

নিশ্চয় আমি জালেমদেরকে ধ্বংস করে দেব, এটি আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে নবী রসূলগণকে সান্ত্বনা যে, তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, তারা কোন দিনও তোমাদেরকে বহিস্কার করতে পারবে না; বরং তারাই দুনিয়া থেকে বহিস্কৃত হবে।

وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ

১। তফসীরে মাজেদী, খন্ড-১, পৃঃ ৫২৬

আর কাফেরদেরকে ধ্বংস করার পর আল্লাহর দুনিয়া শূণ্য থাকবে না; বরং তোমাদেরকে তথা মোমেনদেরকে সেখানে আবাদ করা হবে। মূলতঃ যারা শুধু আল্লাহকে ভয় করে চলে, আল্লাহ্ পাকের দরবারে জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের হিসাব দিতে হবে-একথা বিশ্বাস করে, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে কাফেরদের ধ্বংস করার পর সেখান আবাদ করবেন।

ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ○

আর আমার এ রহমত ও দান সে ব্যক্তির জন্যে যে আখেরাতে বিশ্বাস করে এবং যে আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযিরীকে ভয় করে। অর্থাৎ কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাকের দরবারে দণ্ডায়মান হওয়ার ব্যাপারকে যারা ভয় করে অথবা আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে উচ্চারিত সতর্কবাণীকে ভয় করে।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ যখন কাফেরদের কোন দলিল অবশিষ্ট রইলনা তখন তারা নবীগণকে দেশ থেকে বহিস্কার করার হুমকি দিতে লাগলো। যেমন হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর জাতি বলেছিল যে শহর থেকে তোমাদেরকে বের করে দেব। আর মক্কার পৌত্তলিকরাও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে এ কু-পরিকল্পনাই গ্রহণ করেছিল। কিন্তু আল্লাহ্ পাক তাঁর নবীকে নিরাপদে রেখেছেন আর দুশমনদের সকল চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিয়েছেন, নবী রসূলগণের সম্মুখেই আল্লাহ্ পাক তাদের দুশমনদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন এবং মহা সাফল্য মোমেনদেরকেই দান করেছেন।

وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ
جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿١٥﴾ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ ﴿١٦﴾
يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَ
مَا هُوَ بِمَيِّتٍ ۖ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ﴿١٧﴾ مَّثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا
بِرَبِّهِمْ ۖ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ۖ
لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿١٨﴾
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ
وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿١٩﴾ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿٢٠﴾

তরজমা

(১৫) আর তারা (পয়গম্বরগণ) বিজয় কামনা করলেন এবং প্রত্যেক উদ্ধত অহংকারী ব্যর্থ মনোরথ হলো।

(১৬) তাদের প্রত্যেকের জন্যে পরিণামে দোজখ রয়েছে এবং প্রত্যেককে গলিত পূঁজ পান করানো হবে।

(১৭) যা সে অত্যন্ত কষ্টে গলাধঃকরণ করবে, অথচ তা গলাধঃকরণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। চতুর্দিক থেকে তার নিকট মৃত্যু-যন্ত্রণা আসবে কিন্তু তার মৃত্যু ঘটবে না। আর তার পশ্চাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(১৮) যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের দৃষ্টান্ত হলো ঐ ছাই ভস্মের ন্যায়, যার উপর ঝড়ের দিনে ঝঞ্জা বায়ু প্রবাহিত হয়। তাদের উপার্জনের কিছুই তাদের হাতে থাকবে না। একেই বলে পথ হারিয়ে দূরে গিয়ে পড়া।

(১৯) তুমি কি লক্ষ্য করোনি যে, আল্লাহ্ পাক যেমন ইচ্ছা আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন। তিনি যদি ইচ্ছা করেন তবে তোমাদের অস্তিত্ব বিলোপ করে নতুন কোন সৃষ্টি নিয়ে আসতে পারেন।

(২০) আল্লাহ্ পাকের পক্ষে তা আদৌ কঠিন নয়।

তফসীরুল কোরআন

সত্য-অসত্যের সংঘাত যখন তুঙ্গে, নবী রসূলগণ যখন তাঁদের জাতির ঈমান আনয়নের ব্যাপারে নিরাশ হলেন তখন তাঁরা আল্লাহর পাকের মহান দরবারে কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয় কামনা করে আরজী পেশ করলেন। যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ

"হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদের মধ্যে ও আমাদের জাতির মধ্যে মীমাংসা করে দিন"।

হযরত নূহ (আঃ) বলেছিলেনঃ

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا

"হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফেরদের মধ্য থেকে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিওনা"।

হযরত লুত (আঃ) বলেনঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার পরিবারবর্গকে তাদের কীর্তিকলাপ থেকে রক্ষা করুন"।

আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যা করেছেন এবনে জরীর, এবনুল মুনজের, এবনে আবি

হাতেম। ইমাম কাতাদা (রঃ) একথাই বলেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং মোকাতেল (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ استفتحوا শব্দটির সর্বনাম দ্বারা কাফেরদের প্রতি ঈঙ্গিত করা হয়েছে অর্থাৎ কাফেররা নবী রসূলগণের বিরুদ্ধে বিজয় কামনা করেছে যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ

"হে আল্লাহ! যদি তোমার তরফ থেকে তা সত্য হয় তবে আমাদের প্রতি আসমান থেকে পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ কর"।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের واستفتحوا শব্দটির সর্বনাম দ্বারা সত্য-পন্থী ও বাতিল-পন্থী উভয় দলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তারা উভয়ে দোয়া করেছে, যে সত্যের উপর আছে তাকে বিজয় দান করা হোক। আর বাতিলপন্থীদেরকে ধ্বংস করা হোক।[১]

এদিকে কাফেররা তাদের প্রতি আজাব নাজিল হওয়ার ব্যাপারে বিলম্ব দেখে এ ধারণা করলো যে, আজাবের কথা হয়তো শুধু কথাই, বাস্তব কিছু নয়। তাই তারা আজাবের দাবী করে বলেঃ

فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً

"আমাদের প্রতি পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করা হোক"।

এটি ছিল তাদের চরম ধৃষ্টতা। তারা মীমাংসার জন্যে তাড়াহুড়া করতে থাকে। আল্লাহ পাক উভয় পক্ষের দরখাস্ত মঞ্জুর করে শেষ ফায়সালা দিয়ে দেন। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ○

উদ্ধত অহংকারী মাত্রই ব্যর্থ-মনোরথ হয়েছে অর্থাৎ মোমেনগণ সফলকাম হয়েছে এবং কাফেররা ধ্বংস হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের "জব্বার" শব্দটির অর্থ হলো বিদ্রোহী, অহংকারী। "জব্বার" এমন ব্যক্তিকে বলা হয় যার অন্তরে নামমাত্র দয়াও নেই, আর যে অন্যায়ভাবে খুন-খারাবী করে। অথবা "জব্বার" এমন ব্যক্তিকে বলা হয় যে অত্যন্ত অহংকারের কারণে তার উপর কারো হক্ব আছে বলে মানে না এবং সর্ব প্রকারের দায়িত্ব থেকে সে নিজেকে উর্দ্ধে মনে করে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, "জব্বার" সে ব্যক্তিকে বলা হয় যে নিজেকে সর্বোচ্চ

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ২৯২

স্থানে আসীন মনে করে এবং অন্য কাউকে তার উপর স্থান দেয়না।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, "জব্বার" সে ব্যক্তিকে বলা হয় যে মানুষকে তার হুকুম পালনের জন্যে বাধ্য করে।

আলোচ্য আয়াতের عنيد শব্দটির অর্থ হলো যে সত্যের সঙ্গে শত্রুতা রাখে, যে সত্যের উপর অসন্তুষ্ট বা যে সত্যের বিরোধিতা করে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। আর মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, عنيد বলা হয় অহংকারী ব্যক্তিকে।

কাতাদা (রঃ) বলেছেন, عنيد সে ব্যক্তি যে তওহীদকে অস্বীকার করে।

مِنْ وَّرَآئِهٖ جَهَنَّمُ

তার পশ্চাতে তথা তার মৃত্যুর পরই জাহান্নাম রয়েছে। মোকাতেল (রঃ) এ তরজমাই করেছেন। অথবা এর অর্থ হলো, জাহান্নামের তার সম্মুখেই রয়েছে। দুনিয়াতে যেন সে জাহান্নামের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, জাহান্নাম তার সম্মুখেই রয়েছে, আখেরাতে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

আবু ওবায়দা (রঃ) বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতের وراء শব্দটির অর্থ হলো আড়াল। এ শব্দটি অগ্র ও পশ্চাত উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) আলোচ্য আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এ আদেশ জারী হবে যে, প্রত্যেক বিদ্রোহী, কল্যাণে বাধা দানকারী কাফেরকে দোজখে নিক্ষেপ কর, যে আল্লাহর সাথে অন্য কিছুকে পূজা করতো তাকে কঠিন শাস্তি দাও।

হাদীস শরীফে আছে, কেয়ামতের দিন জাহান্নামকে হাযির করানো হবে। জাহান্নাম চিৎকার দিয়ে বলবে, আমি প্রত্যেক বিদ্রোহী, সত্যের দুশমনের জন্যে নিযুক্ত আছি। যখন আল্লাহর নবী রসূলগণ পর্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবেন সে অবস্থায় এ অবাধ্য কাফেরদের পরিণাম কত ভয়াবহ হবে!

আলোচ্য আয়াতের وراء শব্দটির অর্থ হলো সম্মুখে, অর্থাৎ দোজখ তার সম্মুখেই রয়েছে।[২]

এ আয়াত দ্বারা একথা ঘোষণা করা হলো যে, যারা সত্যের দুশমন, যারা অহংকারী, কাফের তাদের শাস্তি শুধু যে দুনিয়াতেই হবে তাই নয়; বরং তাদের আসল শাস্তি আখেরাতে হবে। দোজখের অনল-কুন্ড তাদের অপেক্ষায় রয়েছে। তারা যখন সেখানে চরম পিপাসায় কাতর থাকবে তখন তাদেরকে দেয়া হবে অন্য দোজখীদের দেহের জখম থেকে নিঃসৃত পূঁজ। স্বেচ্ছায় ঐ পূঁজ পান করতে কে চাইবে? তাই মাথায় ডান্ডা মেরে ঐ

১। তফসীরে মজেদী, খন্ড-১, পৃঃ ৫২৮
২। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু), পারা-১৩, পৃঃ ৬১

পুঁজ পান করতে তাদেরকে বাধ্য করা হবে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّآءٍ صَدِيدٍ○

"আর পূঁজের পানি তাদেরকে পান করানো হবে যা অন্য দোজখীদের শরীরের জখম থেকে বের হবে"।

মোহাম্মদ এবনে কা'ব (রঃ) বলেছেন, ব্যাভিচারীদের বিশেষ অঙ্গ থেকে যে পূঁজ বের হবে কাফেরদেরকে সে পূঁজই পান করানো হবে।

ইমাম আহমদ, তিরমিজী, নেসায়ী, এবনে জরীর, এবনে আবি হাতেম, এবনুল মুনজের, বায়হাকী এবং আল্লামা বগভী ও এবনে আবিদ্দুনিয়া এবং হাকেম সঠিক সনদ সহ হযরত ওমর (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ আয়াত সম্পর্কে এরশাদ করেছেনঃ আলোচ্য আয়াতের صديد কে দোজখী ব্যক্তির কাছে আনা হবে। কিন্তু সে তাকে বরদাস্ত করতে পারবে না। দোজখীকে আরো কাছে আনা হবে, তখন পূজের পানি পান করতে বাধ্য করানো হবে। ঐ পূঁজ যখন তার মুখের কাছে আনা হবে তখন সঙ্গে সঙ্গে ঐ তাপে দোজখীর মগজের ছাল উপড়ে নীচের দিকে ঝুলতে থাকবে। শুধু তাই নয়; বরং তার চেহারাটাকে দগ্ধ করা হবে এবং মাথার চামড়া উপড়ে ফেলা হবে। তখন ঐ পূঁজ সে পান করবে।

يَتَجَرَّعُهُ

সে অত্যন্ত কষ্ট করে ঢোক ঢোক করে গলাধঃকরণ করবে। কিন্তু পেটে পৌঁছা মাত্র নাড়ী-ভূঁড়ি কেটে বের করে দেবে।

وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ

সে তা পান করতে চাইবে কিন্তু গলাধঃকরণ করতে সক্ষম হবে না।

وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ

বিভিন্ন প্রকার আজাবের কারণে তাদের মৃত্যুর বিভীষিকা সম্মুখে এসে হাযির হবে, চরম আজাবের কারণে জর্জরিত হয়ে মৃত্যু কামনা করবে কিন্তু মৃত্যু তাদের হবে না।

এবনে জোরায়েজ বলেছেন, নিঃশ্বাস গলায় আটকে থাকবে, মুখ থেকে বের হবে না এবং ভেতরের দিকেও যাবে না।

এবনুল মুনজের ফোজায়েল এবনে ইয়াজের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ বাক্যটির অর্থ হলো গলায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে থাকবে।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ পর্যায়ে মসনদে আহমদে সংকলিত একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, যখন পূঁজ দোজখীর কাছে আনা হবে তখন সে চরম কষ্ট পাবে, তার

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ২৯৮

মুখের কাছে পূঁজ আসার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখমন্ডল জ্বলে যাবে এবং মুখের অভ্যন্তরে যখন পূজ প্রবেশ করবে তখন তার নাড়ি-ভুঁড়ি কেটে যাবে এবং মলদ্বার দিয়ে বের হয়ে আসবে। ফেরেশতাগণ লোহার ডান্ডা দিয়ে দোজখীদেরকে আঘাত করতে থাকবে। মৃত্যু-যন্ত্রণা শুরু হবে কিন্তু মৃত্যু আসবে না।[১]

وَمِنْ وَّرَائِهٖ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ○

এ আজাবের পরও আরো কঠিন আজাব হবে। তত্ত্বজ্ঞানীগণ লিখেছেন, এর অর্থ হলো চিরদিন দোজখে থাকার ব্যবস্থা করা হবে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ আয়াতের সাথে পূর্বের আয়াতের কোন সম্পর্ক নেই, বরং এ আয়াতখানি মক্কাবাসী সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। মক্কাবাসী যখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বদদোয়ার কারণে দুর্ভিক্ষের শিকার হয় তখন তারা আল্লাহর পাকের নিকট বৃষ্টির জন্যে দোয়া করেছিল, কিন্তু আল্লাহ পাক তাদের দোয়া কবুল করেননি; বরং পানির বদলে দোজখীদের পূঁজ পান করাবার হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন।

مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ

যারা তাদের প্রতিপালকের নাফরমান হয় তাদের দৃষ্টান্ত হলো এরূপ যেমন ভস্ম। ঝড়ের দিনের বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। ঠিক এমনিভাবে আখেরাতের বাতাসেও তাদের আমলের ছাই ভস্ম উড়ে যাবে। তাই তাদের কোন সৎকাজ আর থাকবে না।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, তারা যেমন গরীব-দুঃখীকে সাহায্য করেছে, গোলামের মুক্তিপণ আদায় করেছে কিন্তু এসব সৎ কাজের উদ্দেশ্য যেহেতু আল্লাহর সন্তুষ্টি ছিলনা, তাই এর যে শুভ-পরিণতি বা সওয়াব তা তারা পাবে না। অথবা যেহেতু তারা তাদের দেব-দেবীর নামে সৎ কাজ করতো আর তাদের স্বহস্তে নির্মিত মূর্তিগুলো নিজেই অসহায় নিরুপায়, তারা পূজারীদেরকে কিছুই দিতে পারে না, তাই তাদের সৎ কাজগুলোকে আল্লাহ পাক ছাই ভস্মের সাথে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, যাকে বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায়। অতএব, কাফেরদের সৎকাজের কোন মূল্যই পরকালে তারা পাবেনা। কেননা, ঈমান ব্যতীত নেক আমল প্রাণহীন। তাই কোন অবস্থাতেই তা আল্লাহ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। তারা কেয়ামতের দিন হবে নিঃস্ব, হৃতসর্বস্ব, এমনকি সর্বস্বান্ত। এজন্যেই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

لَا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ

পৃথিবীতে তারা যা কিছুই করেছে কেয়ামতের দিন তার বিনিময়ে তারা কিছুই পাবে না তথা কোন আমলেরই শুভ-পরিণতি তারা পাবে না, কোন নেক আমলের চিহ্নও তারা সেদিন দেখতে পাবে না।

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু), পারা-১৩, পৃঃ ৬১

ذٰلِكَ

কোন কাজকে সৎকাজ মনে করে করা এবং পরে তা ধ্বংস হয়ে যাওয়া, মূলতঃ তাহলো

هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ ○

সত্য থেকে অনেক দূরে সরে পড়া।

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ

"(হে রসূল!) আপনি কি দেখেননি যে আল্লাহ্ পাক যেমন ইচ্ছা আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন"।

মূলতঃ কাফেরদের ধারণা ছিল আমরা মাটির সঙ্গে মিশে যাব। আবার জীবন কোথায়? আযাব সওয়াব সবই কথার কথা। এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক কাফেরদের এসব ভিত্তিহীন কথা-বার্তার জবাব দিয়েছেন। আল্লাহ্ পাক নিজের ইচ্ছায়, নিজের শক্তিতে নিজের পছন্দমত আসমান জমিনের ন্যায় বিশাল-বিস্তৃত বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির সেরা মানুষকেও তিনিই সৃষ্টি করেছেন। অতএব, কোন মৃত ব্যক্তিকে পুনর্জীবন দান করা বা কেয়ামতের দিন তাকে হাযির করা এবং তার ভাল-মন্দ নিয়ে বিচার করা আল্লাহ্ পাকের পক্ষে আদৌ কঠিন নয়, এমনকি এর পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ

যদি আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করেন তবে তোমাদেরকে পৃথিবী থেকে বিদায় করতে পারেন এবং তোমাদের স্থলে নতুন জাতি সৃষ্টি করতে পারেন। যিনি আসমান জমিন সৃষ্টি করেছেন, তিনি যেমন তোমাদেরকে বিদায় করে নতুন মখলুক আনতে পারেন তেমনি তিনি তোমাদেরকে কেয়ামতের ময়দানে হাযির করতে পারেন।

وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ

আর এ কাজ আল্লাহ্ পাকের জন্যে আদৌ কঠিন নয়। তিনি সর্বশক্তিমান, সার্বভৌম ক্ষমতা শুধু তাঁরই হাতে। তিনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন।

অতএব, শুধু এক আল্লাহ্ পাকেরই বন্দেগী করা উচিত এবং তাঁর প্রতিই পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করা, তার নিকটই সওয়াবের আশা করা এবং তাঁর অসন্তুষ্টিকে ভয় করা উচিত।

وَبَرَزُوا
لِلّٰهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ
تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ قَالُوا لَوْ
هَدٰىنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ ۖ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ
مَّحِيصٍ ﴿٢١﴾ وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ
الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ۖ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ إِلَّآ
أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي ۖ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوٓا أَنْفُسَكُمْ ۖ مَّآ أَنَا
بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ۖ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ ۗ
إِنَّ الظّٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢٢﴾

তরজমা

(২১) আর সকলেই আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হবে, দুর্বলেরা তখন অহংকারীদেরকে বলবে, নিশ্চয় আমরাতো তোমাদেরই তাবেদার ছিলাম। অতএব, এখন কি তোমরা আমাদেরকে আল্লাহ পাকের শাস্তি থেকে কিছু মাত্রও রক্ষা করতে পারবে? তারা বলবে, আল্লাহ যদি আমাদেরকে হেদায়েত করতেন তবে আমরাও তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালনা করতাম। এখন আমাদের জন্যে ধৈর্যহারা হওয়া অথবা ধৈর্যধারণ করা উভয়ই সমান কথা, আমাদের কোন নিস্কৃতি নেই।

(২২) যখন সব বিষয়ের মীমাংসা হয়ে যাবে তখন শয়তান বলবে, নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা ছিল সত্য প্রতিশ্রুতি এবং আমি তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা ছিল মিথ্যা। তোমাদের উপরতো আমার কোন কর্তৃত্ব ছিল না, আমিতো শুধু তোমাদেরকে আহবান করেছিলাম এবং তোমরা আমার আহবানে সাড়া দিয়েছিলে। অতএব, তোমরা আমার প্রতি দোষারোপ করোনা, তোমরা নিজেদের প্রতিই দোষারোপ কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্য করতে সক্ষম নই। আর তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্য করতে অক্ষম। তোমরা ইতিপূর্বে যে আমাকে আল্লাহর শরীক করেছিলে তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। নিশ্চয় জালেমদের জন্যে অত্যন্ত মর্মন্তুদ

শাস্তি রয়েছে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে পয়গম্বরগণকে অস্বীকার করার শাস্তির উল্লেখ ছিল। আর আলোচ্য আয়াতে কেয়ামতের দিন আল্লাহর ভয়াবহ আজাব দেখার পর কাফেরদের পরস্পরের মাঝে যে কথা-বার্তা হবে তার উল্লেখ রয়েছে।

কেয়ামদের দিন কাফেরদের কথা-বার্তা

কেয়ামদের দিন কাফেররা তাদের প্রধান নেতাদেরকে বলবে, পৃথিবীতে তোমরাই নেতৃত্ব দিয়েছ। আমরা তোমাদের নিকট হাযির হয়েছি, তোমরা যেভাবে বলেছ আমরা সেভাবেই কাজ করেছি, তাই আজকের এ সংকটাপন্ন মুহূর্তে তোমরা আমাদের কি কোন সাহায্য করতে পারবেনা? তখন কাফেরদের নেতারা বলবে, আমরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট ছিলাম, যদি আল্লাহ পাক আমাদেরকে হেদায়েত করতেন তবে আমরাও তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করতাম। আমাদের ব্যাপারে আল্লাহর কথা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। আমরা আজাবের যোগ্য বিবেচিত হয়েছি। এখন ধৈর্যহারা হলে কোন লাভ হবে না। সবর অবলম্বন করলেও আজাব থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না। অতএব, আজ ধৈর্যহারা হওয়া বা ধৈর্যধারণ করা একই কথা।

এ পর্যায়ে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুর রহমান এবনে জায়েদ বর্ণনা করেন, দোজখীরা সেদিন বলবে, দেখ! মুসলমানগণ আল্লাহ পাকের সম্মুখে দুনিয়াতে কান্নাকাটি করতো। এজন্যে তারা জান্নাতবাসী হয়েছে। চল আমরাও আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করি। তখন তারা চিৎকার করে আহাজারী করবে কিন্তু তাদের আহাজারী কোন কাজে আসবেনা। তখন তারা বলবে জান্নাতবাসীদের জান্নাতে গমনের একটি কারণ হলো সবর অবলম্বন। তাই আমরাও সবর অবলম্বন করি এবং নীরবতা পালন করি। তখন তারা এমন সবর অবলম্বন করবে যা কখনও দেখা যায়নি। কিন্তু এ সবরও তাদের জন্যে উপকারী হবেনা। তখন আক্ষেপ করে তারা বলবে, হায়! সবরও কোন কাজে আসলোনা! আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) একথাও বলেছেনঃ নেতা এবং অনুসারীদের এসব কথা জাহান্নামে প্রবেশের পরে হবে।

যেমন অন্য আয়াতেও এরশাদ হয়েছেঃ

وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ

অর্থাৎ-যখন জাহান্নামে তারা পরস্পর কলহ করবে, তখন দুর্বল লোকেরা অহংকারী নেতাদেরকে বলবে, আমরা তো ছিলাম তোমাদের তাবেদার। যা কিছু করেছি সব তোমাদের নির্দেশেই করেছি। এখন কি তোমরা দোজখের অগ্নি থেকে আমাদেরকে

কিছুমাত্র রক্ষা করতে পারবে? তখন অহংকারী লোকেরা বলবে, আমরা সকলেই এখন দোজখে আছি, বন্দাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাকের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। এরপর তারা আল্লাহ পাকের দরবারে একথা বলে ফরিয়াদ করবে, হে পরওয়ারদেগার! এরাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে, অতএব তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন।

তখন জবাব দেয়া হবে, প্রত্যেককেই দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া হচ্ছে, তোমরা তা জাননা।[১]

قَالُوا لَوْ هَدٰنَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ

অহংকারী নেতারা তাদের অনুসারীদেরকে একথা বলে জবাব দেবে, যদি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আমাদের ঈমান নছীব হ'ত তবে আমরাও তোমাদেরকে হেদায়েতের পথে আহবান করতাম। কিন্তু যেহেতু আমরা নিজেরাই পথভ্রষ্ট ছিলাম, তাই তোমাদেরকেও পথভ্রষ্ট করেছি। নিজের জন্যে যা আমাদের পছন্দনীয় ছিল তোমাদের জন্যেও আমরা তাই পছন্দ করেছি।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ এ আয়াতের আরো একটি অর্থ হতে পারে-আমরা তোমাদেরকে দোজখের পাড়ে নিয়ে এসেছি, এখন যদি আল্লাহ পাক আমাদেরকে আত্মরক্ষার কোন পথ বাতলে দিতেন তবে আমরাও তোমাদেরকে সে পথের সন্ধান দিতাম, কিন্তু নাজাতের পথ আমাদের জন্যে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।[২]

سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيْصٍ ○

যখন আমাদের ব্যাপারে আজাবের সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, এমন অবস্থায় আমরা অস্থির, ব্যাকুল এবং ধৈর্যহারা হই, অথবা সবর অবলম্বন করি-উভয় অবস্থাই সমান, কোন পন্থাই এখন আর উপকারী হবেনা, পলায়নের বা আত্মরক্ষার কোন পথই নেই।

এ বাক্যটি কাফের সর্দারদের অথবা উভয়ের।

মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, কাফেররা দোজখে ৫০০ বছর ধরে নাজাতের জন্যে ফরিয়াদ করবে, কিন্তু কোন কিছুই উপকারী হবেনা। এরপর তারা ৫০০ বছর সবর করবে কিন্তু তাতেও কোন কাজ হবেনা, তখন তারা আলোচ্য বাক্যটি উচ্চারণ করবে।

سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا -

(আমরা অস্থির হই অথবা সবর করি, আমাদের নাজাতের কোন পথ নেই)

এবনে আবি হাতেম, তেবরানী এবং এবনে মরদবিয়া হযরত কা'ব এবনে মালেক (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। দোজখীরা বলবে আস, আমরা সবর করি। (হয়তো আল্লাহ পাক রহম করবেন) তাই তারা ৫০০ বছর ধরে সবর করবে। যখন এ

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু), পারা-১৩, পৃঃ ৬৬
২। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ২৯৫

পন্থায় কোন ফল দেখবেনা তখন তারা আলোচ্য বাক্যটি উচ্চারণ করবে।

মোহাম্মদ এবনে কা'ব কারজী বর্ণনা করেন, আমার নিকট এ বর্ণনা পৌঁছেছে যে, দোজখীরা দোজখের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ফেরেশতাদের বলবে, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

ادْعُوا رَبَّكُمْ ......

"আপন প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্যে ফরিয়াদ কর যেন অন্ততঃ একটি দিন আমাদের শাস্তি লাঘব করেন"।

ফেরেশতাগণ জবাব দেবেন, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَٰتِ

"তোমাদের নিকট কি তোমাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ নিয়ে আগমন করেননি? তখন দোজখীরা বলবে, "অবশ্যই এসেছিলেন"।

তখন ফেরেশতাগণ বলবেনঃ

فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَٰلٍ -

"তোমরা নিজেরাই আল্লাহ্ পাকের দরবারে ফরিয়াদ কর। আর কাফেরদের ফরিয়াদ ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই বয়ে আনবেনা"।

যখন তারা নিরাশ হয়ে যাবে তখন বলবে-

يَا مَٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ

হে মালেক! (দোজখের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ফেরেশতার নাম) তোমার প্রতিপালক যেন আমাদেরকে মৃত্যু দিয়ে দেন, যেন আমরা এ আজাব থেকে পরিত্রাণ পাই। মালেক আশি বছর পর্যন্ত তাদের কোন জবাব দেবেনা। আশি বছরের প্রত্যেক বছরই ৩৬০ দিনের হবে। আর প্রত্যেক দিন দুনিয়ার হাজার বছরের সমান হবে। এমনি আশি বছর পর তাদেরকে জবাব দেয়া হবে, "তোমাদেরকে এখানেই থাকবে হবে"।

তখন তারা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যাবে, তারা একে অন্যকে বলবে, তোমাদের উপর যে বিপদ আসন্ন ছিল তা এসে গেছে, এখন হাহাকার আর্তনাদ করা নিরর্থক, আমাদের ধৈর্য ধারণ করা উচিত। হয়তো এর দ্বারা কোন উপকার হতেও পারে। যেভাবে দুনিয়াতে আনুগত্য প্রকাশের ব্যাপারে যারা সবর করেছিল এবং সকল দুঃখ- কষ্ট ভোগ করেছিল, আজ তারা তার শুভ-পরিণতি লাভ করছে।

যাহোক, এভাবে সকলেই বাধ্য হয়ে সবরের পথ অবলম্বন করবে কিন্তু তাতে কোন ফলোদয় হবেনা। এরপর হাহাকার আর্তনাদ করতে থাকবে, কিন্তু তাতেও কোন উপকার হবেনা। তখন তারা আলোচ্য বাক্য উচ্চারণ করবেঃ

سَوَاءٌ عَلَيْنَا

অর্থাৎ আমরা অধৈর্য হই, অথবা সবর অবলম্বন করি, উভয় অবস্থাই আমাদের জন্যে সমান। আমাদের আত্মরক্ষার কোন পথ নেই। এরপর শয়তান দাঁড়িয়ে কথা বলবে,

وَقَالَ الشَّيْطٰنُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُّكُمْ فَاَخْلَفْتُكُمْ

(যখন সকল বিষয়ের ফয়সালা হয়ে যাবে তখন শয়তান বলবে, তোমাদের সঙ্গে আল্লাহ পাক যে অঙ্গীকার করেছেন তা ছিল সত্য, আর আমি যে অঙ্গীকার করেছিলাম তা ছিল মিথ্যা। এতদ্ব্যতীত, তোমাদের উপর আমারতো কোন কর্তৃত্ব ছিলনা, আমি শুধু তোমাদেরকে (মন্দ কাজের দিকে) আহবান করেছি, তোমরা আমার আহবানে সাড়া দিয়েছ। অতএব, আমাকে তিরস্কার করোনা, তোমরা নিজেদেরকেই তিরস্কার কর।)

অর্থাৎ কেয়ামতের দিন যখন সব বিষয়ের ফয়সালা হয়ে যাবে তথা বেহেশতবাসীরা বেহেশতে এবং দোজখীরা দোজখে প্রবেশ করবে, তখন দোজখবাসীরা ইবলিস শয়তানকে বলবে, তোর কারণেই আজকে আমাদের এ বিপদ, তোর অনুসরণ করেই আজ আমাদের এ সর্বনাশ হয়েছে। অতএব, যদি সম্ভব হয় তবে কোন ব্যবস্থা কর, যাতে করে আমরা এ বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারি। তখন শয়তান বলবে, তোমরা আমাকে অযথাই দোষারোপ করছো, আল্লাহ পাক পৃথিবীতে তোমাদের নিকট বিভিন্ন সময়ে নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন, তাঁদের মাধ্যমে ঈমান ও নেক আমলের শুভ-পরিণতি তথা চিরশান্তি লাভের কথা ঘোষণা করেছেন। এমনিভাবে কুফরী ও নাফরমানীর শাস্তির ব্যাপারেও নবী রসূলগণের মাধ্যমে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। আল্লাহ পাক যা কিছু ঘোষণা করেছিলেন, সবই ছিল সত্য, আর এ সত্যতার প্রমাণ আজ তোমরা স্বচক্ষে দেখছ।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আমিও আমার ভূমিকা পালন করতে ত্রুটি করিনি, মন্দ কাজের দিকে তোমাদেরকে আহবান করেছি, আমার আহবানের সত্যতার কোন প্রমাণও আমার কাছে ছিলনা। তোমরা একটু চিন্তা করলেই আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারতে। কিন্তু তোমরা তা করোনি; বরং আমার কথায় তোমরা যাবতীয় অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হয়েছ, আমি তোমাদেরকে কোনদিনও কুফরী ও নাফরমানীতে বাধ্য করি নাই এবং তেমন ক্ষমতাও আমার ছিল না। তাই তোমরা যা কিছু করেছ, তা স্ব-ইচ্ছায়, স্বজ্ঞানে, স্ব-শক্তিতেই করেছ। আমি একথা স্বীকার করতে দ্বিধা করবনা যে, অন্যায়ের পথে তথা সর্বনাশের পথে তোমাদেরকে আমি আহবান করেছি, তোমরা আমার আহবানে সাড়া দিয়েছ, অনুরক্তের ন্যায় তোমরা আমার অনুসরণ করেছ। তোমরা যদি ভেবে দেখতে তবে আমার তাবেদার হতে না। তোমাদের কুফরী ও নাফরমানীর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।[১]

১। তফসীরে তবরী, খন্ড-১৩, পৃঃ১৩৩

ইবলিসের এসব কথা শুনে দোজখীদের মনে নিজেদের উপরই ঘৃণা সৃষ্টি হবে, তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ঘোষণা করা হবে, আজ তোমাদের নিজেদের প্রতি যে ঘৃণা রয়েছে, তার চেয়ে বেশী ঘৃণা তোমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের ছিল, তোমাদেরকে ঈমান আনয়নের জন্যে আহবান করা হচ্ছিল, তখন তোমরা সে আহবানে সাড়া দাওনি, বরং ঈমান আনয়নে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলে।

এ ঘোষণা শুনে দোজখীরা চিৎকার করে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার কথার সত্যতা আমরা উপলব্ধি করেছি, এখন যদি আমাদেরকে দুনিয়াতে পুনরায় ফেরত পাঠাও, আমরা সৎ কাজ করব। আমাদের বিশ্বাস পরিপূর্ণ হয়েছে। আল্লাহ পাক তাদের উক্তির প্রতিবাদে এরশাদ করবেনঃ

وَلَوْ شِئْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدٰهَا

"যদি আমি ইচ্ছা করতাম তবে তোমাদের প্রত্যেককে হেদায়াত করতাম"।

দোজখীরা পুনরায় ফরিয়াদ করবে, আমরা বিধি-নিষেধ মেনে চলবো, নবী রসূলগণকে মেনে চলবো, আমাদেরকে সামান্য অবকাশ দান করুন।

পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

رَبَّنَآ اَخِّرْنَآ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ

"হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে অল্প সময়ের জন্যে অবকাশ দিন"।

আল্লাহ পাক জবাবে এরশাদ করবেনঃ

اَوَلَمْ تَكُوْنُوْٓا اَقْسَمْتُمْ مِّنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِّنْ زَوَالٍ

"তোমরা কি ইতিপূর্বে শপথ করে বলোনি? যে আমাদের বিনাশ নেই"।

এরপর পুনরায় তারা ফরিয়াদ করবেঃ

رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِىْ كُنَّا نَعْمَلُ

(সূরা ফাতের)

(হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এখান থেকে বের হওয়ার ব্যবস্থা করে দিন। আমরা ইতিপূর্বে যে কাজ করেছি, তেমনি কাজ করবো না, বরং অন্য প্রকার কাজ করবো।)

আল্লাহ পাক প্রতি-উত্তরে এরশাদ করবেনঃ

اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ النَّذِيْرُ

"তোমাদেরকে কি আমি এমন জীবন দান করিনি যাতে কোন উপদেশ গ্রহণকারী

উপদেশ গ্রহণ করতে পারত। আর তোমাদের নিকট কি কোন ভয় প্রদর্শক পৌছেনি"?

কিছুক্ষণ পর আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

اَلَمْ تَكُنْ اٰيٰتِىْ تُتْلٰى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ

(সূরা মুমেনুন)

"আমার বিধান সমূহ কি তোমাদেরকে পাঠ করে শোনানো হয়নি? যা তোমরা মিথ্যাজ্ঞান করতে"।

একথা শ্রবণ করে দোজখীরা বলবে, আমাদের প্রতিপালক কি আমাদের প্রতি আর কখনো দয়া করবেন না?

এরপর চিৎকার করে বলবে, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّيْنَ

(সূরা মুমেনুন)

"হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদের উপর আমাদের দুর্ভাগ্য প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছিল, আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম। হে আমাদের পরওয়ারদেগার! এবার আমাদেরকে এখান থেকে বের করে দিন, যদি আমরা দ্বিতীয়বারও মন্দ কাজ করি তবে নিশ্চয় আমরা জালেম বলে বিবেচিত হবো"।

اخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ

"তোরা হীন অবস্থায় এখানেই থাক, আমার সাথে কথা বলিসনা"।

তখন দোজখীরা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়বে এবং ফরিয়াদ করার এ ব্যবস্থাও শেষ হয়ে যাবে। পরস্পর তারা কাঁদতে থাকবে এবং দোজখের ফটক বন্ধ করে দেয়া হবে।[১]

এবনে জরীর, এবনে আবি হাতেম, এবনে মরদবিয়া, বগভী, তেবরানী, এবনুল মোবারক (রঃ) হযরত আকাবা এবনে আমের (রাঃ)-এর সূত্রে লিখেছেনঃ হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন আগের পরের সকলকে একত্রিত করে তাদের মধ্যে সিদ্ধান্ত করবেন তখন ঈমানদারগণ বলবেন, আমাদের প্রতিপালক আমাদের মধ্যে ফয়সালা করে দিয়েছেন, এখন এমন কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ পাকের দরবারে সুপারিশ করতেন, তখন লোকেরা বলবে, এ কাজ আদম (আঃ) করতে পারবেন, কেননা আল্লাহ পাক স্ব-হস্তে তাঁকে তৈরী করেছেন, তাঁর সাথে কথা বলেছেন, লোকেরা তখন আদম (আঃ)-এর কাছে হাযির হয়ে সুপারিশের জন্যে তাঁকে অনুরোধ করবে। হযরত আদম (আঃ) বলবেন, তোমরা নূহ (আঃ)-এর নিকট যাও, লোকেরা তাঁর নিকট যাবে কিন্তু নূহ (আঃ) বলবেন, তোমরা ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ২৯৬-৯৭

যাও। যখন লোকেরা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট যাবে তখন তিনি বললেন, মুসা (আঃ)-এর নিকট যাও, আর মুসা (আঃ) বলবেন, ঈসা (আঃ)-এর নিকট যাও আর ঈসা (আঃ)-এর নিকট যখন লোকেরা হাযির হবে, তখন তিনি বলবেন, আমি তোমাদেরকে ঠিকানা দিচ্ছি। তোমরা উম্মী আরবী নবী তথা সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট যাও, তিনি সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। অবশেষে লোকেরা আমার নিকট হাযির হবে এবং আল্লাহ্ পাক আমাকে দন্ডায়মান হয়ে সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন। এরপর আমার মজলিশ অসাধারণ সুগন্ধি দ্বারা মোহিত করা হবে যা ইতিপূর্বে কোন দিন কেউ পায়নি। এরপর আমি আমার প্রতিপালকের দরবারে হাযির হয়ে সুপারিশ করবো, আল্লাহ্ পাক আমার সুপারিশ কবুল করবেন এবং আমার মাথার চুল থেকে নিয়ে পায়ের আঙ্গুলের নখ পর্যন্ত নূর দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেবেন।

এ অবস্থা দেখে কাফেররা বলবে, মুসলমানগণ সুপারিশকারী পেয়ে গেছেন, আমাদের জন্যে কে সুপারিশ করবে। তখন নিজেরাই বলবে, এখনতো ইবলিসই রয়েছে যে আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। তখন তারা ইবলিসের নিকট গিয়ে বলবে, মোমেনদের জন্যে তো সুপারিশকারী রয়েছে, এখন তুমি আমাদের জন্যে সুপারিশ কর, কেননা তুমিই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলে। যখন ইবলিস দাড়াবে তখন এমন দূর্গন্ধ ছড়াবে যা ইতিপূর্বে কেউ কোনদিন পায়নি। তখন ইবলিস তাদেরকে দোজখের দিকে নিয়ে যাবে।

মূলতঃ সে সময়ের কথাটিই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ ইবলিস তখন কাফেরদেরকে সম্বোধন করে বলবে, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

إِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ...

"নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা ছিল সত্য আর আমি তোমাদের সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছিলাম তা ছিল মিথ্যা। আর তোমাদের উপর আমার তেমন কোন ক্ষমতাও ছিলনা। আমি শুধু তোমাদেরকে মন্দ কাজের দিকে আহবান করেছিলাম, তোমরা আমার আহবানে সাড়া দিয়েছিলে, অতএব, তোমরা আমাকে তিরস্কার করোনা, বরং নিজেদেরকেই তিরস্কার কর"।

مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ ط

"এখন আমি তোমাদের পক্ষে সুপারিশ করে তোমাদেরকে আজাব থেকে রক্ষা করতে পারব না, আর তোমরাও আমার পক্ষে সুপারিশ করে আমাকে রক্ষা করতে পারবেনা"।

إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ ط

"এতদ্ব্যতীত, ইতিপূর্বে তোমরা যে আমাকে আল্লাহর শরীক করতে, আমি তাতে আমার অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছি। তোমাদের এ অপকর্মে আমি সম্পূর্ণ অসন্তুষ্ট"।

إِنَّ الظَّٰلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

"নিশ্চয় জালেমদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি"।

যে কথা কেয়ামতের দিন হবে তার উল্লেখ করার মাধ্যমে পবিত্র কোরআন পরিণামদর্শী হওয়ার এবং ভবিষ্যতের জন্যে তথা পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে সম্বল সংগ্রহের তাগিদ করেছে। যারা দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকে সব কিছু মনে করেছে, ঈমান এবং নেক আমলের মাধ্যমে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সম্বল সংগ্রহ করছেনা, তাদের জন্যে এ আয়াতে রয়েছে বিশেষ সতর্কবাণী।

وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّٰلِحَٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ
رَبِّهِمْ ۖ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَٰمٌ ﴿٢٣﴾ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً
طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ﴿٢٤﴾ تُؤْتِي
أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ
مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ ﴿٢٦﴾

তরজমা

(২৩) আর যারা ঈমান এনেছিল এবং নেক আমল করেছিল তাদেরকে এমন বেহেশতে প্রবেশ করানো হবে যার পাদদেশে নির্ঝর-মালা প্রবাহিত, আল্লাহ পাকের হুকুমে তারা চিরদিনই তাতে থাকবে, সেখানে তাদের অভিবাদন হবে সালাম।

(২৪) (হে রসূল!) আপনি কি লক্ষ্য করেননি? আল্লাহ পাক কিভাবে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন, সৎ বাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ, যার শেকড় সুদৃঢ় এবং শাখা-প্রশাখা আকাশের মাঝে বিস্তৃত।

(২৫) তার প্রতিপালকের আদেশক্রমে সব সময়ই ফল দান করে, মূলতঃ লোকেরা দেখে এজন্যে আল্লাহ পাক মানুষের জন্যে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে থাকেন।

(২৬) আর ঘৃণ্য কথা ঘৃণিত বৃক্ষের ন্যায়ই, মাটি থেকে উৎপাটিত, যা টিকে থাকবার নয়।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের তথা ভাগ্যাহত লোকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, যারা ধরাকে সরা জ্ঞান করে, বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের প্রতি ঈমান আনে না তাদের অবস্থা এবং ভয়াবহ পরিণতির কথা বর্ণিত হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে যারা ভাগ্যবান, যারা মুসলমান, যারা ঈমান ও নেক আমলের মহামূল্যবান সম্পদ নিয়ে দুনিয়া থেকে যায়, তাদের শুভ-পরিণতি বর্ণিত হয়েছে।

পবিত্র কোরআনের বর্ণনা-শৈলীর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, যেখানে নেককারদের পুরস্কারের ঘোষণা থাকে সেখানে পাশাপাশি বদকারের শাস্তির ঘোষণাও করা হয়, যাতে করে মানুষ ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। পূর্ববর্তী আয়াতে বদকারদের শাস্তির বিবরণ স্থান পেয়েছে, আর আলোচ্য আয়াতে নেককারদের পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।[১]

وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

আর যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমলও করেছে তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে যার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত, তারা আল্লাহ পাকের হুকুমে জান্নাতে চিরদিন থাকবে, কোন দিন জান্নাতের নেয়ামত কমও করা হবেনা, তারা কোন সময়ই চিন্তিত হবেনা। জান্নাতের অনন্ত অসীম নেয়ামত তারা আল্লাহ্ পাকের অনুমতি ক্রমেই লাভ করবে।

দ্বিতীয়ত, জান্নাতের আনন্দের আসরে তারা পরস্পরের সাক্ষাতের সময় একে অপরকে সালাম বলে অভিবাদন করবে।

অথবা এর অর্থ হলো, জান্নাতের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা তাদেরকে সালাম দিয়ে মোবারকবাদ জানাবে। অন্য একখানি আয়াতে এরশাদ হয়েছে, প্রত্যেক দ্বার দিয়ে ফেরেশতাগণ প্রবেশ করবে এবং বেহেশতবাসীগণকে মোবারকবাদ জানাবে। যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُم

এ পর্যায়ে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, السلم (আস্‌সালাম) শব্দটি সালামত থেকে নিষ্পন্ন, অর্থ হলো তারা বালা-মসিবত থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে।

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৯, পৃঃ ১১৫

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে মোমেন ও কাফেরদের আখেরাতের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, আর আলোচ্য আয়াতে কালেমায়ে তৈয়্যেবা এবং কুফরী কথার দৃষ্টান্ত পেশ করা হয়েছে এবং আলমে বরজখ বা মধ্যলোকে তাদের কি অবস্থা হবে তারও বিবরণ রয়েছে। আলোচ্য আয়াতে কালেমায়ে তৈয়্যেবা বলতে কালেমায়ে তৈয়্যেবা লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'কে বোঝানো হয়েছে।

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ......

(হে রসূল!) আপনি কি জানেন না যে, আল্লাহ্ পাক কেমন দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। মানুষ যেন ভাল-মন্দ, হক্ব ও বাতিল, সত্য ও অসত্যের মধ্যকার পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারে-এজন্যে আল্লাহ্ পাক বিভিন্ন প্রকার দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। যদি কেউ স্থির মস্তিস্কে এসব দৃষ্টান্ত সর্ম্পকে চিন্তা করে তবে সত্য-মিথ্যার সঠিক পরিচয় লাভ করতে বিলম্ব হয়না, সত্যের সঠিক পরিচয় সহজেই লাভ করতে পারে।

কালেমায়ে তৈয়্যেবার দৃষ্টান্ত

কালেমায়ে তৈয়্যেবা বা কালেমায়ে তওহীদ তথা আল্লাহ্ পাকের পরিচয় এবং আল্লাহ্ পাকের মা'রেফাতের যাবতীয় বিষয়ের দৃষ্টান্ত একটি বৃক্ষের ন্যায়, যার বুনিয়াদ অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং মজবুত এবং শাখা-প্রশাখা আকাশের দিকে সম্প্রসারিত। হাদীস শরীফে আছে, এখানে যে পবিত্র বৃক্ষের কথা বলা হয়েছে তা হলো খেজুর বৃক্ষ কেননা খেজুর বৃক্ষের শেকড় অতি গভীরে থাকে। সাধারণ ঝড়-তুফান তাকে উপড়ে ফেলতে পারে না।

تُؤْتِىٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ بِاِذْنِ رَبِّهَا ؕ

"এ বৃক্ষ তার স্রষ্টার নির্দেশ মোতাবেক সব সময়ই ফল দান করে"।

মূলতঃ কালেমায়ে তৈয়্যেবার দৃষ্টান্ত অনুরূপই। কেননা, মোমেনের অন্তরের গভীরতম প্রকোষ্ঠে তা সুদৃঢ় রয়েছে। যখন এই কালেমা মোমেনের অন্তর থেকে বের হয় তখন আল্লাহ্ পাকের আরশ পর্যন্ত পৌছতে কোন প্রকার বাধাপ্রাপ্ত হয় না। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ

(আল্লাহ্ পাকের নিকটই পবিত্র কালেমা পৌছে।)

তিরমিজী শরীফে হযরত আমর এবনুল আস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "সুবহানাল্লাহ " পাঠ করা (কেয়ামতের দিন) নেক আমলের পাল্লার আধা অংশ জুড়ে নেবে, আর আলহামদুলিল্লাহ পাঠ করা

পাল্লাকে পরিপূর্ণ করে দেবে, আর "লাইলাহা ইল্লাল্লাহ" আল্লাহ পাকের দরবারে পৌঁছতে কোন প্রকার বাধাপ্রাপ্ত হয় না।

তিরমিজী শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যখন কোন বন্দা আন্তরিকতার সঙ্গে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলে তখন অবশ্যই আসমানের দ্বার উন্মুক্ত করা হয় এবং ঐ কালেমা আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অবশ্য শর্ত হলো যে ব্যক্তি এ কালেমা পাঠ করবে সে যেন কবীরা গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করে।

তিরমিজী, নেসায়ী, এবনে হাব্বান এবং হাকেম হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন এ মর্মে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ পবিত্র বৃক্ষ হলো খেজুর বৃক্ষ।

আলোচ্য আয়াতে حين শব্দটির অর্থ হলো সময়। একরামা (রঃ) বলেছেন, এ স্থলে শব্দটির ব্যাখ্যা হবে এক বছর। কেননা খেজুর বৃক্ষে সারা বছরই ফল আসে।

সাঈদ এবনে জোবায়ের, কাতাদা এবং হাসান বসরী (রঃ)-এর মতে, এ শব্দটির অর্থ ৬ মাস সময়।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ মতই পোষণ করতেন।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞনী বলেছেন, ফল বের হওয়ার সময় থেকে পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত চার মাস সময় প্রয়োজন হয়। তাই আলোচ্য শব্দটি দ্বারা ৪ মাসই বোঝানো হয়েছে।

সাঈদ এবনে মোসাইয়েব (রঃ) বলেছেন, এ শব্দটি দ্বারা দু' মাস উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা, দু' মাসে খেজুর খাওয়ার যোগ্য হয়ে যায়। রবি এবনে আনাস (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো প্রত্যেক সকাল-সন্ধ্যা কেননা, প্রত্যেক সকাল-সন্ধ্যায় তথা সকল অবস্থায় খেজুর খাওয়া হয়। শীত-গ্রীষ্ম, সকাল বা সন্ধ্যা এর জন্যে কোন শর্ত নয়। ঠিক এমনিভাবে মোমেনের আমলেরও অনুরূপ অবস্থা, সকাল-সন্ধ্যা, দিন-রাত সকল সময়ই মোমেন নেক আমল করে এবং সর্বক্ষণ নেক আমল উপরে যেতে থাকে। ঈমানের বরকত কখনও বন্ধ হয়না।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ বৃক্ষগুলোর মধ্যে একটি বৃক্ষ এমন আছে যার পাতা কখনও ঝরে পড়েনা আর তা মুসলমানের ন্যায়, তোমরা বল তা কোন্ বৃক্ষ?

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বলেন, লোকেরা মনে করলো এটি হবে মরুভূমির কোন বৃক্ষ, অথচ আমার মনে এসেছিল এটি হবে খেজুর বৃক্ষ। কিন্তু যেহেতু আমি বয়সে ছোট ছিলাম এজন্যে কিছু বলতে সাহস করিনি। অবশেষে উপস্থিত লোকেরা আরজ করলো ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আপনিই বলুন, তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ তা হলো খেজুর বৃক্ষ।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, বৃক্ষের তিনটি অংশঃ

১. শেকড় যা মাটির ভেতরে থাকে, ২. বৃক্ষের যে অংশ মাটির উপরে থাকে, ৩. শাখা-প্রশাখা যা ছড়িয়ে পড়ে।

ঠিক এমনিভাবে ঈমানও পরিপূর্ণ হয় তিনটি জিনিস দ্বারাঃ

১. অন্তরের বিশ্বাস, ২. রসনা দ্বারা স্বীকার করা, ৩. অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আমল।

আবু জেরিয়ান হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, পবিত্র বৃক্ষ হলো জান্নাতের একটি বৃক্ষ।

হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি (আন্তরিকতার সঙ্গে) "সোবহানাল্লাহিল আযিম ওয়া বিহামদিহি" বলবে তার জন্যে জান্নাতে একটি খেজুর বৃক্ষ লাগানো হয়। (তিরমিজী শরীফ)

এ পর্যায়ে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এক ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করলো, ধন-সম্পদশালী লোকেরা অনেক অগ্রসর হয়েছে, তখন তিনি এরশাদ করলেন, মনে রেখো, যদি পৃথিবীর সমস্ত বস্তু তুমি একত্রিত কর তবুও তা আসমান পর্যন্ত পৌছবেনা, আমি তোমাকে এমন আমল বলব, যার মূল অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং যার শাখা-প্রশাখা আসমানে ছড়িয়ে আছে। সে জিজ্ঞাসা করলো, এ আমলটি কি? তিনি এরশাদ করলেনঃ

لا اله الا الله الله اكبر وسبحان الله والحمدلله

এ বাক্যগুলো প্রত্যেক নামাজের পর দশবার পাঠ কর, এর মূল অত্যন্ত মজবুত, সুদৃঢ় আর এর শাখা-প্রশাখা আকাশ ছোঁয়া।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, কালেমায়ে তৈয়্যেবা হলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আর উত্তম বৃক্ষ হলো খেজুর বৃক্ষ। এর শেকড় অতি গভীরে থাকে। প্রবল ঝড়-তুফানেও তাকে উপড়ে ফেলতে পারেনা। বার মাসই এ বৃক্ষে ফল ধরে। শীত-গ্রীষ্ম সর্বদাই তা পাওয়া যায়।

আলোচ্য আয়াতের حين শব্দটির ব্যাখ্যায় হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হলো ছয় মাস। এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট এসে বললো, আমি শপথ করেছি যে ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলবো না। এ শপথে আমি حين শব্দটি ব্যবহার করেছি, এখন এজন্যে কত সময় অপেক্ষা করতে হবে। তিনি বললেন, ছয় মাস।

এ শব্দটির ব্যাখ্যায় মুজাহেদ এবং এবনে জায়েদ বলেছেন, এক বছর। সাঈদ এবনুল

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু), পারা-১৩, পৃঃ ৬৬

মুসায়্যেব (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো দু' মাস।

وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ○

আর আল্লাহ পাক মানুষের জন্যে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন যেন মানুষ বুঝতে পারে, সত্য অনুধাবন করতে পারে এবং উপদেশ গ্রহণ করতে পারে। যেমন আলোচ্য আয়াত সমূহে কালেমায়ে তৈয়্যেবার দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে এবং পরবর্তী আয়াতে অপবিত্র কথা, কুফর ও শেরকের কথা এবং মিথ্যা কথার দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيْثَةٍ

আর ঘৃণ্য কথার দৃষ্টান্ত হলো ঘৃণ্য বৃক্ষেরই ন্যায়, যা মাটি থেকে উৎপাটিত, যা আদৌ টিকে থাকার নয়। কেননা, তার শেকড় ভাসা ভাসা, একটু নাড়া দিলেই উপড়ে যায়।

আয়াতের মর্মকথা

যে কথা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্যে না হয়, যা কুফরী ও নাফরমানীর কথা হয়, যা মিথ্যা ধোকার কথা হয়, তার কোন ভিত্তি নেই তথা শেকড় নেই। অসার এবং মিথ্যা কথা প্রকাশ এবং প্রমাণের জন্যে যত চেষ্টাই করা হোক না কেন তা বেশীক্ষণ টিকে থাকেনা, টিকতে পারেনা, সত্য-সন্ধানী মানুষের মনে দোলা দেয়না, কল্যাণকামী মানুষ যখন বাস্তবতার নিরীখে সত্য উপলব্ধি করতে চায়, তখন শেরকের অসারতা নগ্ন হয়ে দেখা দেয়। এ সত্য পরিলক্ষিত হয়েছে ইসলামের ইতিহাসের সূচনাকালে। মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় পৌত্তলিকরা ইসলামকে বাধা দিয়েছে সর্বশক্তি দিয়ে, অকথ্য নির্যাতন করেছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) প্রতি, নবুওয়্যতের সূর্য যখন মদীনা মোনাওয়ারার পূর্বাকাশে উদিত হয়, তখন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পৌত্তলিকতার বৃক্ষ শেকড়সহ উৎপাটিত হয়। কেননা, এর কোন ভিত্তি ছিলনা।

পক্ষান্তরে, তওহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রতি ঈমান মানুষের অন্তরে সুদৃঢ় হয়, তার শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভের বরকতে ঈমান এত মজবুত হয় যে, মুসলমান প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়, ঈমান দিতে নয়।

কিন্তু কুফর ও শেরক মিথ্যা, ধোকা। এককথায় আল্লাহ পাকের নাফরমানীর যাবতীয় কাজ সবই কালেমায়ে "খাবীছাহ" তথা ঘৃণ্য কথার অর্ন্তভুক্ত। তার অবস্থা হলোঃ

مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ○

"তার কোন স্থায়িত্ব নেই",

অতএব, ঈমান ও তওহীদ বিরোধী যত মত, পথ ও দর্শন থাকুক না কেন, আর তার যত সুন্দর নামকরণই করা হোক না কেন, সবই অবশেষে বাতিল এবং ক্ষতিকর প্রমাণিত

হতে বাধ্য। পবিত্র কোরআন শুধু এ সত্য ঘোষণা করেছে যে, তওহীদ বিরোধী যাবতীয় মতবাদ টিকবেনা, টিকবার নয়। একথাটি যে ধ্রুব সত্য তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় সমাজতন্ত্রের অপমানজনক পতনের মধ্য দিয়ে। ১৯১৭ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত সমাজতন্ত্রের কালো ধোয়া শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নকেই (অধুনালুপ্ত) অন্ধকারাচ্ছন্ন রাখেনি, বরং সারা বিশ্বকে গ্রাস করার জন্যে লক্ষ লক্ষ সৈন্য এবং অগণিত পারমানবিক অস্ত্র তৈরী করেছিল। কিন্তু এটি ছিল সময়ের ব্যাপার। আজ সমাজতন্ত্রের কালো আঁধার কেটে গেছে, বাতিল বিদায় নিয়েছে। পবিত্র কোরআনের আলোচ্য আয়াতের ঘোষণা বাস্তব ঘটনায় পরিণত হয়েছে।

ঈমান ও কুফরের দৃষ্টান্ত

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে ঈমানের দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে উত্তম বৃক্ষের সঙ্গে আর কুফর ও শেরকের দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে ঘৃণ্য বৃক্ষের সঙ্গে। উত্তম বৃক্ষের চারটি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে।

(১) পবিত্র, সুগন্ধি এবং তার ফল হলো মিষ্ট এবং সুস্বাদু।

(২) তার মূল ভিত্তি হয় অত্যন্ত মজবুত, সুরক্ষিত, ঝড়-তুফানও উপড়ে ফেলতে পারেনা।

(৩) শাখা-প্রশাখা হয় আকাশ ছোঁয়া, অতি উঁচু, বৃক্ষ যত লম্বা হবে তার ফল তত সুস্বাদু হবে। ধূলা-বালু ও ময়লা থেকে থাকবে সুরক্ষিত।

(৪) ঐ বৃক্ষে সর্বদা ফল থাকবে, ফলের জন্যে কোন বিশেষ মওসুম বা সময় নির্দিষ্ট থাকবে না, সর্বক্ষণ ফল পাওয়া যাবে। যে বৃক্ষ এমনি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হবে তা স্বাভাবিক ভাবেই অতি উত্তম হবে। আর বুদ্ধিমান মাত্রই এমন ফল লাভ করতে সচেষ্ট হবে।

মূলতঃ ঈমান বা ইসলাম বৃক্ষের একটি দৃষ্টান্ত যা দেখা-শোনায় অতি পবিত্র। আর এই বৃক্ষের মূল ভিত্তি অত্যন্ত সুদৃঢ়। মানুষ এর বৈশিষ্ট্য সমূহ দেখে বিস্মিত হয়। যেহেতু আল্লাহ পাকের মা'রেফাত, মহব্বত এবং ইসলামী বিধান যুক্তি-তর্কের নিরীখে সুপ্রতিষ্ঠিত, এজন্যে ইসলামের মহব্বত মানুষের মনের গভীরে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আর ঈমানের ভিত্তিতে যে নেক আমল করা হয় তা আল্লাহ পাকের দরবারে পৌঁছে যায়। আর মোমেন পবিত্র বৃক্ষের বরকতময় ফল এবং বরকত সমূহ সর্বদা লাভ করতে থাকে। ঈমান বৃক্ষের ফল সর্বদা পাওয়া যায়। কখনও বন্ধ হয়না। এজন্যে বাস্তববাদী পরিণামদর্শী মানুষের কর্তব্য হলো এমন ফল লাভে সচেষ্ট থাকা। আর আল্লাহ পাকের মর্জির উপরই নির্ভর করে এমন ফল লাভ করা।

পরবর্তী আয়াত সমূহে কুফর ও শেরকের দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে মন্দ বৃক্ষের সাথে যার তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছেঃ

(১) ঐ বৃক্ষের মূল সুদৃঢ় নয়, ভাসা ভাসা এবং কুৎসিত, দুর্গন্ধময় এবং স্বাদ বলতে কিছুই নেই।

(২) মন্দ, বাসী, দুর্গন্ধময়, দেহ এবং আত্মার জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

(৩) যেহেতু মূল ভিত্তির নীচে মাটি নেই তাই সামান্য বাতাসেও উপড়ে পড়ে যায়। এটিই হলো দৃষ্টান্ত কুফর ও শেরকের কেননা এর কোন ভিত্তি নেই। এজন্যে সামান্য বাতাসেও এমন বৃক্ষ উৎপাটিত হয়। ঠিক এমনিভাবে কুফর ও শেরকের কোন ভিত্তি নেই এবং কাফেরদের নিকট কুফর ও শেরকের কোন দলিল নেই। কুফর ও শেরকের কোন শাখা-প্রশাখাও নেই। পক্ষান্তরে, ঈমানের শাখা রয়েছে ৭০- এর উপরে। যেমন হাদীস শরীফে আছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ ঈমানের ৭০ এর অধিক শাখা রয়েছে। প্রকৃত মোমেন তার ঈমানের ফল সর্বক্ষণ লাভ করতে থাকে।[১]

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَيُضِلُّ اللّٰهُ
الظّٰلِمِيْنَ ۙ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ﴿٢٧﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ
كُفْرًا وَّاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ﴿٢٨﴾ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۗ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٢٩﴾
وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ ۗ قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ
اِلَى النَّارِ ﴿٣٠﴾ قُلْ لِّعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا
رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا
خِلٰلٌ ﴿٣١﴾

তরজমা

(২৭) যারা শাশ্বত বাণীতে ঈমান রাখে, আল্লাহ পাক তাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন। আর যারা সীমালংঘনকারী, তাদেরকে আল্লাহ পাক বিভ্রান্তিতে রাখবেন, তিনি যা ইচ্ছা তাই করে থাকেন।

(২৮) (হে রসূল!) আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, যারা আল্লাহ পাকের নেয়ামতকে না-শোকরী ও অকৃতজ্ঞতায় পরিবর্তন করেছে। আর নিজের জাতিকে নামিয়ে এনেছে

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৪, পৃঃ ১৩৫

সর্বনাশের গৃহে।

(২৯) যার নাম দোজখ, তা অতি জঘন্য আবাসস্থল।

(৩০) তারা (মানুষকে) আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড় করায়। (হে রসূল!) আপনি বলুন, ভোগ করে লও, নিশ্চয় তোমাদেরকে অবশেষে অগ্নিতেই ফিরে যেতে হবে।

(৩১) (হে রসূল!) আপনি আমার ঈমানদার বন্দাদেরকে বলুন, যেন তারা (যথা নিয়মে) নামাজ কায়েম করে এবং আমি যে রিয্ক তাদেরকে দান করেছি তা যেন গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে। যেদিন কোন প্রকার ক্রয়-বিক্রয় হবেনা, কোন বন্ধুত্ব কাজে আসবেনা, সেদিন আসার পূর্বে।

তফসীরুল কোরআন

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ

পূর্ববর্তী আয়াতে "কালেমায়ে তৈয়্যেবা" এবং "কালেমায়ে খবীসার" বিবরণ ছিল। আর আলোচ্য আয়াতে কালেমায়ে তৈয়্যেবার সুফল এবং কালেমায়ে খবীসার কুফল বর্ণিত হয়েছে। যারা কালেমায়ে তৈয়্যেবায় বিশ্বাস করে তথা যারা আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদে বা তওহীদে ঈমান আনে, ঈমানের বরকতে আল্লাহ পাক তাদেরকে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন; জ্বীন, ইনসান, শয়তান থেকে রক্ষা করেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, যারা আন্তরিকতার সঙ্গে কালেমায়ে তওহীদে বিশ্বাস করে তথা আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের প্রতি যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, তারা যত সমস্যারই সম্মুখীন হোক না কেন এবং যত কষ্টদায়ক পরিস্থিতির উদ্ভবই হোক না কেন তাদের ঈমান এতটুকু কমেনা। যেমন হযরত জাকারিয়া (আঃ), হযরত জিরজিস (আঃ), হযরত সামউন এবং যাঁদেরকে ইয়ামনের রাজা অগ্নিতে নিক্ষেপ করেছিল তাঁরা চরম নির্যাতন সহ্য করেও ঈমানের হেফাজত করেছেন, এভাবে হযরত খোবায়েব (রাঃ) এবং তাঁর সঙ্গীগণ শাহাদত বরণ করেছেন কিন্তু ঈমান রক্ষা করেছেন, শেষ পর্যন্ত তওহীদের উপর ছিলেন তাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত।

মধ্যলোকের অবস্থা

হযরত বরা এবনে আজেব (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ মুসলমানকে যখন কবরে প্রশ্ন করা হয়, তোমার প্রতিপালক কে? তখন সে স্বাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, আর হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে কবরের আজাব সম্পর্কে যখন মৃত ব্যক্তিকে

(জীবিত করে) জিজ্ঞাসা করা হয় তোমার প্রতিপালক কে? সে জবাব দেবে আল্লাহ্ পাক আমার প্রতিপালক, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল।

আবু দাউদ এবং ইমাম আহমদ (রঃ)-এর বর্ণনায় এই হাদীস এভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছেঃ মৃত ব্যক্তির নিকট দু'জন ফেরেশতা আসেন এবং মৃত ব্যক্তিকে বসিয়ে দেন এবং ঐ কথা বলেন, তোমার প্রতিপালক কে? সে জবাব দেয় আল্লাহ্ পাক। ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করে, তোমার দ্বীন কি? সে জবাব দেয় ইসলাম। এরপর ফেরেশতা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দিকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞাসা করে, ইনি কে?

তখন সে জবাব দেয়, ইনি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)। ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করে তুমি কি জান? ঐ ব্যক্তি বলে, আমি আল্লাহর কিতাব পাঠ করেছি এবং তা মেনে নিয়েছি এবং তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি (বস্তুতঃ আলোচ্য আয়াতের এটিই অর্থ)।

এরপর আসমান থেকে এক ঘোষক ঘোষণা করে, আমার বন্দা ঠিক বলেছে। তার জন্যে জান্নাতের বিছানার ব্যবস্থা কর। আর তাকে জান্নাতী পোষাক পরিধান করাও। তার জন্যে জান্নাতের দিকে দুয়ার খুলে দাও।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ এরপর তার নিকট জান্নাতের সুগন্ধি এবং বাতাস আসতে থাকে। আর যতদূর তার দৃষ্টি যায় ততদূর তার কবরের সীমা সম্প্রসারিত করা হয়।

কাফেরের মৃত্যুর উল্লেখ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তার দেহে রুহ প্রত্যাবর্তন করা হয়। দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে বসিয়ে দেয়। আর জিজ্ঞাসা করে তোমার প্রতিপালক কে? সে বলে, হায়! আমি জানিনা। ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করে তোমার দ্বীন কি?

সে বলে, হায়! আমি জানি না। ফেরেশতা বলে, যে ব্যক্তি তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন তার অবস্থা কি? সে বলে, হায়! আমি জানিনা, তখন আসমান থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করে সে মিথ্যা বলেছে। তার জন্যে অগ্নির বিছানা তৈরী করে দাও। এরপর দোজখের তাপ এবং উত্তপ্ত বাতাস তার প্রতি আসতে থাকে। আর তার কবর এত সংকীর্ণ হয় যে, তার একদিকের হাড় অন্যদিকে চলে যায়। এরপর তাকে শাস্তি দেয়ার জন্যে একজন অন্ধ বধির ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়, যার হাতে এমন একটি লৌহদন্ড থাকে যদ্বারা যদি পাহাড়ে আঘাত করা হয় তবে পাহাড় পর্যন্ত ভূমিস্মাত হয়ে যায়। উক্ত ফেরেশতা ঐ লৌহদণ্ড দ্বারা কাফেরকে প্রহার করতে থাকে, যার চিৎকার মানুষ এবং জ্বীন ব্যতীত প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যে সব কিছুই শ্রবণ করে। ঐ ফেরেশতার প্রহারের কারণে কাফের ধ্বংস হয়ে যায়, পুনরায় তার দেহে প্রাণ সঞ্চার করানো হয়।

হযরত ওসমান (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাম আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন মৃত ব্যক্তিকে দাফন করানোর পর অপেক্ষা করতেন এবং এরশাদ করতেনঃ তোমরা তোমাদের ভাইয়ের মাগফেরাতের জন্যে দোয়া করতে থাক, সে যেন সুদৃঢ় থাকে এজন্যে আল্লাহ

পাকের দরবারে আরজী পেশ করতে থাক। এখন তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে। (আবু দাউদ শরীফ)

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন কোন বন্দাকে কবরে রাখা হয় এবং তার সাথীরা সে স্থান থেকে বিদায় হতে থাকে, তখন মৃত ব্যক্তি তাদের চলার শব্দ শ্রবণ করে, (কেননা) ঐ মুহূর্তেই তাকে দু'জন ফেরেশতা এসে বসিয়ে দেয় এবং বলে, তুমি এ ব্যক্তি সম্পর্কে তথা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কি বল?

মোমেন ব্যক্তি এ জবাব দেয় যে, আমি স্বাক্ষ্য দেই তিনি আল্লাহর বন্দা এবং রসূল। এরপর তাকে বলা হয় তুমি তোমার দোজখের ঠিকানা দেখ। এর স্থলে আল্লাহ পাক তোমাকে জান্নাতে আবাস-স্থল দান করেছেন। মোমেন ব্যক্তি জান্নাত এবং দোজখ উভয় স্থানের ঠিকানা দেখে।

মুনাফেক এবং কাফেরকেও জিজ্ঞাসা করা হয়, এই ব্যক্তি সম্পর্কে কি বল?

সে বলে, আমি কিছুই জানিনা। যে কথা অন্য লোকেরা বলতো আমিও তাই বলতাম, ফেরেশতা তাকে বলে তুমি নিজেও জানতে না এবং পবিত্র কোরআনও পাঠ করতে না। এরপর তাকে লৌহদণ্ড দিয়ে প্রহার করা হয়। সে চিৎকার করতে থাকে। মানুষ এবং জ্বীন ব্যতীত সব সৃষ্টিই তার চিৎকার শ্রবণ করে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যখন কোন মৃত ব্যক্তিকে কবরে দাফন করা হয়, তখন তার নিকট দু'জন কৃষ্ণ বর্ণের নীল চক্ষু বিশিষ্ট ফেরেশতা আসে, তাদের একজনের নাম মুনকির, আরেকজনের নাম নকির। উভয় ফেরেশতাই জিজ্ঞাসা করেন, এই ব্যক্তি সম্পর্কে (হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দেখিয়ে) তুমি কি বল, তখন সে বলে, তিনি আল্লাহর বন্দা এবং রসূল। আমি স্বাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বন্দা ও রসূল। ফেরেশতারা তখন বলে, আমরা জানতাম যে, তুমি এ জবাবই দেবে।

এরপর তার কবর চতুর্দিকে সত্তর হাত করে সম্প্রসারিত করা হয়, আলোকিত করা হয় এবং তাকে বলা হয় যে, তুমি ঘুমিয়ে থাক। সে ঘুমিয়ে পড়ে। পরে সে একথা বলে, আমি নিজ বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন করে আমার পরিবারবর্গকে আমার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবগত করি? ফেরেশতাগণ বলেন, তুমি সে দুলহানের ন্যায় ঘুমিয়ে থাক, যাকে শুধু তার প্রিয় ব্যক্তিই জাগ্রত করে। এরপর সে ঘুমিয়ে পড়বে এবং যতদিন আল্লাহ পাক জাগ্রত না করেন, সে ঐ অবস্থায়ই থাকবে।

পক্ষান্তরে, যদি মৃত ব্যক্তি মুনাফেক হয়, তবে তাকে অনুরূপ প্রশ্ন করা হলে সে বলবে, আমি অন্যদেরকে যে কথা বলতে শুনেছি নিজেও তাই বলছি, আমি কিছুই জানিনা

(তিনি রসূল ছিলেন, কি ছিলেন না)।

ফেরেশতারা বলেন, আমরা জানতাম তুমি এ জবাবই দেবে। এরপর জমীনকে হুকুম দেয়া হয় যেন দু'দিক থেকে একত্রিত হয়ে যায়। তখন মুনাফেকের দেহের উপর এমন চাপ সৃষ্টি হয় যে, তার একদিকের হাড় অন্যদিকে চলে যায়। এভাবে তার উপর সর্বদা আজাব হতে থাকবে। যতদিন না আল্লাহ্ পাক তাকে সেখান থেকে ওঠাবেন। (তিরমিজী শরীফ)

وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ۝

"আর আল্লাহ্ পাক যা ইচ্ছা তা করেন"।

কোন লোককে তিনি ঈমান আনয়নের তওফিক দান করেন আর কোন লোককে এ তওফিক থেকে বঞ্চিত করেন। কোন লোককে তিনি ঈমানের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখেন আর কাউকে রাখেন না। এটি সম্পূর্ণ তাঁর মর্জির ব্যাপার। এর উপর কোন প্রশ্ন করা যায় না।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ্ পাক আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর তাঁর ডান বাজুতে দস্তে মোবারক রেখেছেন, ফলে তাঁর গৌরবর্ণের বংশধরগণ বের হয়ে এসেছে। আর তাদের অবস্থা তখন ছিল ক্ষুদ্র পিপীলিকার ন্যায়। এরপর হযরত আদম (আঃ)-এর বাম বাজুর উপর হাত রাখলে তাঁর কৃষ্ণবর্ণের বংশধরগণ বের হয়ে আসে। তারা ছিল কয়লার মত কালো। যারা ডান বাজু থেকে বের হয়ে আসে, তাদের সম্পর্কে এরশাদ হয়ঃ তারা জান্নাতের দিকে যাবে। আর যারা বাম বাজু থেকে বের হয়েছে, তাদের সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়, তারা দোজখের দিকে যাবে।

হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি আসমান জমীনের সকল অধিবাসীকে আল্লাহ্ পাক আজাব দেন তবে দিতে পারেন। তিনি এ অবস্থায় জালেম হবেন না। আর যদি তিনি সকলের প্রতি দয়া করেন, তবে তাঁর রহমত তাদের আমলের চেয়ে অনেক উত্তম। যদি ওহোদ পাহাড়ের সমান স্বর্ণও আল্লাহর রাহে তুমি দান কর, তবুও তকদীরে তোমার ঈমান না থাকলে আল্লাহ্ পাক তা কবুল করবেন না। আর একথা জেনে রাখ. যা কিছু তোমার নিকট পৌঁছবার নয় তা কখনো তোমার নিকট পৌঁছবেনা।

এ আকীদার বরখেলাফ যদি কিছু বিশ্বাস কর, আর যদি ঐ অবস্থায়ই হয় তোমার মৃত্যু, তবে তুমি দোজখে যাবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত হোজায়ফা এবনুল ইয়ামান (রাঃ) এবং হযরত জায়েদ এবনুস সাবেত (রাঃ) থেকেও এমনি হাদীস বর্ণিত আছে। (আহমদ, এবনে মাজা)

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হলো, কবরের আজাব সত্য, কবরে তথা

মধ্যলোকে মোমেন কাফের সকলের নিকট তিনটি প্রশ্ন করা হবে। কাফের এবং ফাসেকদের শাস্তি হবে। ইহলোক এবং পরলোকের মধ্যেই রয়েছে আলমে বরজখ তথা মধ্যলোক, তার প্রতি ঈমান আনয়ন ওয়াজিব। পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সূচনা হয় কবর থেকে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ার এ জীবনে সর্বদা কালেমা শাহাদাৎ পাঠ করতে থাকবে আল্লাহ পাক তাকে কবরে কালেমা শাহাদাতের কথা মনে করিয়ে দেবেন।[১]

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّأَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ○

শানে নজুল

এ আয়াত নাজিল হয়েছে মক্কার কাফের প্রধানদের সম্পর্কে। বোখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে যে, তিনি বলেছেনঃ আল্লাহর শপথ! এ আয়াত নাজিল হয়েছে কোরায়েশদের দলপতিদের সম্পর্কে। আরবদের নেতৃত্বে এবং কর্তৃত্ব তখন তাদের হাতেই ছিল। আল্লাহ পাক তাদের হেদায়েতের জন্যে, তাদের উন্নতি-অগ্রগতির জন্যে, তাদের এ জীবন ও পরজীবনের সার্বিক কল্যাণের জন্যে অনেক ব্যবস্থা করেছেন, যেমন সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআন নাজিল করেছেন, সারা আরবের নেতৃত্ব আল্লাহ পাক তাদেরকে দান করেছেন। তাদের কর্তব্য ছিল আল্লাহ পাকের এ নেয়ামত সমূহের জন্যে শোকরগুজর হওয়া তথা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পন্থা হলো আল্লাহ পাকের প্রতি, তাঁর রসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) প্রতি এবং আল্লাহ পাকের প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআনের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা। আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা, তাঁর বসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) পরিপূর্ণ অনুসরণ করা, পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষাকে গ্রহণ করা।

কিন্তু হতভাগা কাফের প্রধানরা আল্লাহ পাকের এ সমস্ত নেয়ামতের জন্যে শোকর গুজারীর স্থলে তাঁর অকৃতজ্ঞ ও অবাধ্য হয় এবং আল্লাহর রসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বিরোধিতা করে, আল্লাহর কোরআনকে অবিশ্বাস করে, তাই আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا

"(হে রসূল!) আপনি কি দেখেননি? যারা আল্লাহ পাকের নেয়ামতকে পরিবর্তন করেছে না-শোকরী ও নাফরমানী দ্বারা"।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৪, পৃঃ ১৩৮
তফসীরে কবীর, খন্ড-১৯, পৃঃ ১২২

অর্থাৎ আল্লাহর নেয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞতার স্থলে তারা অকৃতজ্ঞ হয়েছে। অথবা এর অর্থ হলো আল্লাহর নেয়ামতকে অকৃতজ্ঞতার দ্বারা পরিবর্তন করেছে অর্থাৎ তাদের অকৃতজ্ঞতার কারণে আল্লাহ পাক তাদের থেকে তাঁর নেয়ামত ছিনিয়ে নিয়েছেন। তারা যেন নেয়ামতের স্থলে না-শোকরী ও অকৃতজ্ঞতাকে পছন্দ করেছে। হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর নেয়ামত যাকে বলা হয়েছে তিনি হলেন স্বয়ং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

এবনে জরীর আতা এবনে ইয়াসারের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, বদরের যুদ্ধে মক্কার যে সব কোরায়েশ সর্দার নিহত হয়েছে, আলোচ্য আয়াতে তাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে কেননা, আল্লাহ পাক তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, পবিত্র মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় অবস্থানের তওফিক দিয়েছেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে সেখানে খাদ্য-দ্রব্য, ফলমূল এবং অন্যান্য জিনিসপত্র তাদেরকে দান করেছেন, তারা নিশ্চিন্ত মনে মক্কায় জীবন যাপন করছিলো। যখন আবরাহা বাদশাহ তার হস্তী বাহিনী নিয়ে মক্কা আক্রমণে উদ্যত হয়েছিলো, তখন আল্লাহ পাক তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন। মক্কাবাসীর রিয্কের দ্বার তিনি খুলে দিয়েছিলেন। সিরিয়া এবং ইয়ামনে শীত এবং গ্রীষ্মে সফর করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, যাতে করে তারা তাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করতে পারে, আল্লাহ পাক হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছেন এবং তাদের হেদায়েতের জন্যে আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআন নাযিল করেছেন। কিন্তু তারা এ সমস্ত নেয়ামতের শোকর আদায় করার স্থলে আল্লাহ পাকের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে এবং আল্লাহর রসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) চরম দুশমন হয়ে গেছে। অবশেষে তারা সাত বছরের দীর্ঘ দুর্ভিক্ষে পতিত হয় এবং বদরের দিন বন্দী হয়, নিহত হয়, অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়, আমৃত্যু আল্লাহর নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়।[১]

ইমাম রাজী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেনঃ

(১) কাফেররা আল্লাহর নেয়ামতের শোকরকে না-শোকরীতে পরিবর্তন করেছে। কেননা, আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামতের কারণে তাদের একান্ত কর্তব্য ছিল আল্লাহ পাকের শোকরগুজার হওয়া, কিন্তু তারা অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, নাফরমান হয়েছে, তাই তারা শোকরকে নাফরমানীতে পরিবর্তন করেছে।

দ্বিতীয়তঃ তারা আল্লাহ পাকের নেয়ামতকে কুফরী ও নাফরমানীতে পরিবর্তন করেছে। কেননা, তারা যখন কুফরী করেছে, তার অব্যশম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ তাদের থেকে আল্লাহ পাক নেয়ামত ছিনিয়ে নিয়েছেন, তাদের নিকট নেয়ামতের পর কুফরই রয়ে গেছে।

তৃতীয়তঃ আল্লাহ পাক তাদের প্রতি নেয়ামত স্বরূপ রসূল প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর নিকট পবিত্র কোরআন নাজিল করেছেন। কিন্তু এ হতভাগার দল ঈমানের বদলে কুফরীকে গ্রহণ করেছে।[২]

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ৩০৬
২। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৯, পৃঃ ১২২

وَاَحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ

কুফরী ও নাফরমানীতে অনুপ্রাণিত করে তারা জাতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا

আর এ ধ্বংসের স্থল হলো দোজখ, যাতে তারা নিজেরাও প্রবেশ করবে এবং তাদের সাথীরাও। তারা শুধু নিজেদেরই সর্বনাশ করেনি, বরং তারা তাদের সাথী এবং অনুসারীদের সর্বনাশ করতেও ত্রুটি করেনি।

وَبِئْسَ الْقَرَارُ

আর দোজখ হলো অত্যন্ত মন্দ ঠিকানা।

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهٖ

"আর তারা আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যে আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী দাড় করায়"।

এবনে মরদবিয়ার বর্ণনা হলো, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেন যে, কার সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়েছে? হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, কোরায়েশের দু'টি গোত্র সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল হয়েছে। তারা ছিল অত্যন্ত মন্দ। বণী মগীরা ও বণী উমাইয়া। বণী মগীরার অপকার থেকে তোমাদেরকে আল্লাহ পাক হেফাজত করেছেন, কেননা এ দিন তাদের শক্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বণী উমাইয়াকে কিছুদিন আনন্দ করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। এবনে জরীর, এবনুল মুনজের, এবনে আবি হাতেম, তেবরানী, হাকেম এবং এবনে মরদবিয়া হযরত আলী (রাঃ)-এর পক্ষ থেকেও এমন কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[১]

قُلْ تَمَتَّعُوْا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ ○

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, তোমরা কিছু দিন আনন্দ করে নাও কেননা, অবশেষে তোমাদেরকে দোজখেই যেতে হবে"।

অর্থাৎ গাফলতের আবর্তে নিপতিত অবস্থায়, মূর্তি পূজায় তথা পথভ্রষ্টতায় তোমরা কিছুদিন পড়ে থাক। অবশেষে তোমাদের জন্যে দোজখের শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে। এতে রয়েছে বিশেষ সতর্কবাণী এবং আজাবের ঘোষণা। তোমাদের বর্তমান কুফরী ও নাফরমানী অবশেষে তোমাদের শাস্তির কারণ হবে, দোজখের কঠোর কঠিন শাস্তি তোমাদেরকে ভোগ করতেই হবে।

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ৩০৬-৭

قُلْ لِّعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ

(হে রসূল!) আপনি আমার মোমেন বন্দাদেরকে বলুন, তারা যেন নামাজ কায়েম করে তথা নামাজ সঠিক ভাবে আদায় করে, তারা যেন কাফেরদের ন্যায় অকৃতজ্ঞ না হয়; বরং আল্লাহ্ পাকের এবাদতের দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করে। আর আমি তাদেরকে যে রিযক দান করেছি তা থেকে যেন তারা গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে।

আলোচ্য আয়াতে মোমেনদেরকে দু'টি বিষয়ে তাগিদ করা হয়েছেঃ

(১) নামাজ কায়েম কর। নামাজ হলো আল্লাহর হক্ব। সঠিক ভাবে যথা নিয়মে এ হক্ব আদায়ের তাগিদ করা হয়েছে। কেননা নামাজের মাধ্যমেই অধিক পরিমাণে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ করা যায়।

(২) আল্লাহর রাহে ব্যয় করার তাগিদ রয়েছে এ আয়াতে। এটি বন্দার হক্ব বা হক্কুল ইবাদ। অতএব, এ আয়াতে আল্লাহর হক্ব এবং বন্দার হক্ব-উভয় হক্ব আদায়ের বিশেষ তাগিদ রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক মোমেন বন্দাদেরকে عبادى (আমার বন্দা) বলে সম্বোধন করে মোমেন বন্দাদেরকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছেন, এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, বন্দেগীর হক্ব ঈমানদারগণই আদায় করে। আর এরশাদ হয়েছেঃ

مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلٰلٌ ۝

অর্থাৎ তোমরা নামাজ কায়েম করো এবং আল্লাহর রাহে দান করো, যেদিন কোন ক্রয়-বিক্রয় হবেনা এবং কোন বন্ধুত্ব উপকারী হবেনা– অর্থাৎ কেয়ামতের দিন যখন কেউ কারো কোন সাহায্য করতে পারবেনা, সেদিনের পূর্বে তোমরা নামাজ কায়েম করতে থাক।

মূলতঃ এ পৃথিবী মানুষের কর্মক্ষেত্র। কর্মফল ভোগ করতে হবে আখেরাতে। অতএব, কল্যাণকামী মানুষ মাত্রকে আখেরাতে চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সম্বল এ জীবনের সাধনার মাধ্যমেই সংগ্রহ করতে হবে।

اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً
فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِیَ فِی
الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ۚ﴿۳۲﴾ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآىِٕبَیْنِ ۚ
وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّیْلَ وَالنَّهَارَ ۚ﴿۳۳﴾ وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ؕ وَاِنْ
تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ﴿۳۴﴾ وَاِذْ
قَالَ اِبْرٰهِیْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّاجْنُبْنِیْ وَبَنِیَّ اَنْ نَّعْبُدَ
الْاَصْنَامَ ؕ﴿۳۵﴾

তরজমা

(৩২) তিনিই আল্লাহ পাক, যিনি আসমান জমীন সৃষ্টি করেছেন এবং আসমান গেকে পানি বর্ষণ করেছেন, এরপর তোমাদের জীবিকার জন্যে ফলমূল উৎপাদন করেছেন, আর তরীকেও তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে করে তা আল্লাহর হুকুমে সমুদ্রে চলে। আর যিনি নদ-নদীকেও তোমাদের কল্যাণে নিবেদিত করেছেন ।

(৩৩) আর আল্লাহ পাক একইভাবে অনবরত সূর্য ও চন্দ্রকে তোমাদের কাজে নিযুক্ত রেখেছেন। তিনিই রাত দিনকেও তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন।

(৩৪) এবং যা তোমরা তাঁর নিকট চেয়েছ তা থেকে তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন।আর যদি তোমরা আল্লাহর নেয়ামতকে গণণা করতে চাও তবে তা শেষ করতে পারবেনা । নিশ্চয় মানুষ অতিশয় সীমা লংঘনকারী, অকৃতজ্ঞ।

(৩৫) আর স্মরণ কর সে সময়কে, যখন ইব্রাহীম বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক! এ নগরীকে নিরাপদ করে রাখ। আর আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখ।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে নেককার এবং বদকার তথা মোমেন ও কাফেরদের অবস্থা ও পরিণতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। অবশেষে মোমেনদেরকে আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে আহবান জানানো হয়েছে। এ মর্মে নামাজ কায়েম করার এবং অর্থ-সম্পদের শোকরগুজারী স্বরূপ আল্লাহর রাহে ব্যয় করার নির্দেশ

প্রদান করা হয়েছে।

আল্লাহ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত হলো তাঁর মা'রেফাত হাসিল করা। আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হওয়ার জন্যে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে তাঁর মা'রেফাত হাসিল করা পূর্বশর্ত। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাকের দশটি গুণাবলীর বিবরণ স্থান পেয়েছে, যাতে করে আল্লাহ পাকের কুদরত, হেকমত এবং অনন্ত অসীম রহমত লক্ষ্য করে কাফেররা ঈমান আনয়নে উদ্বুদ্ধ হয় এবং কুফরী ও নাফরমানীর ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক হয় এবং মোমেনগণ আল্লাহর এবাদত-বন্দেগীতে অধিকতর উৎসাহিত হয়।

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

(১) তিনিই আল্লাহ পাক, যিনি আসমান সমূহকে সৃষ্টি করেছেন।

(২) যিনি জমিনকে সৃষ্টি করেছেন। আসমান সমূহকে ছাদ এবং জমিনকে তোমাদের জন্যে ফরাস রূপে তৈরী করেছেন।

وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً

(৩) তিনি আসমান থেকে তোমাদের জন্যে পানি বর্ষণ করেন।

আর পানিই জীবনের অপর নাম। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ

"আর পানি থেকেই আমি সব কিছুর জীবন দিয়েছি"।

আর তিনিই ঐ পানি দ্বারা তোমাদের জীবিকা স্বরূপ ফলমূল উৎপাদন করেছেন।

অতএব, মানুষের জীবন ও জীবিকা নির্ভর করে পানির উপর। সেই পানি আল্লাহ পাকেরই দান।

وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِىَ فِى الْبَحْرِ بِاَمْرِهٖ

(৪) আর আল্লাহ পাকই তোমাদের জন্যে নৌকাগুলোকে নিয়োজিত করেছেন, যেন তোমরা সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করে এপার-ওপার যেতে পার। এটি যে আল্লাহ পাকের বিশেষ দান, একথা উপলব্ধি করে আল্লাহ পাকের শোকর গুজার হওয়া প্রত্যেকেরই কর্তব্য। জাহাজগুলোকে এবং নদ-নদী, সমুদ্রগুলোকে আল্লাহ পাকই মানুষের সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهٰرَ ○

(৫) আর তোমাদের কল্যাণার্থেই আল্লাহ পাক নদ-নদীকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন। তোমাদের ইচ্ছা মাফিক তোমরা তার দ্বারা উপকৃত হতে পার।

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ

(৬) আর আল্লাহ পাকই সূর্যকে তোমাদের কল্যাণার্থে নিযুক্ত রেখেছেন।

وَالْقَمَرَ دَآئِبَيْنِ

(৭) এমনিভাবে চন্দ্রকেও তোমাদের উপকারার্থেই আল্লাহ পাক নিয়োজিত রেখেছেন, তারা যুগ যুগ ধরে তোমাদের দায়িত্ব পালনে তৎপর রয়েছে, আর তা রয়েছে একমাত্র আল্লাহ পাকের নির্দেশ-ক্রমে। পৃথিবী থেকে লক্ষ কোটি মাইল দূরে থেকেও পৃথিবীর উপর, জোয়ার-ভাটায় চন্দ্র-সূর্যের যে প্রভাব রয়েছে তা সর্বজনবিদিত সত্য। ফল এবং ফসল পরিপক্ক হওয়ার ব্যাপারেও চন্দ্র-সূর্যের ভূমিকা সর্বজনস্বীকৃত সত্য। এসবই তো আল্লাহ পাকের দান। চন্দ্র-সূর্য অনবরত আল্লাহ পাকের হুকুমে এবং কুদরতে তাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করে চলেছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ পাক চন্দ্র-সূর্যকে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশে অত্যন্ত সক্রিয় এবং সতেজ করেছেন।

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ

(৮) আর আল্লাহ পাকই তোমাদের জন্যে রাতকে অনুগত করে দিয়েছেন যেন তোমরা তাতে বিশ্রাম গ্রহণ করতে পার।

وَالنَّهَارَ

(৯) আর তিনি দিনকে তোমাদের খেদমতে নিয়োজিত রেখেছেন যেন তোমরা নিজ নিজ কাজ করতে পার, নিজের জীবিকা উপার্জনে সচেষ্ট হতে পার।

وَاٰتٰكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُ ط

(১০) আর তোমরা যা কিছু চেয়েছ, আল্লাহ পাক তার সবই তোমাদেরকে দান করেছেন। তিনি তোমাদের যাবতীয় প্রয়োজনের আয়োজন করেছেন। তিনি তোমাদের জন্যে সবকিছুই করেছেন। অতএব, মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের মহান দরবারে শোকরগুজার হওয়া, তাঁর বিধি-নিষেধ সঠিকভাবে পালন করা।[১]

শেরকের মূল ভিত্তিতে আঘাত

আলোচ্য আয়াতের ঘোষণা শেরক এবং পৌত্তলিকতার মূল ভিত্তিতে আঘাত হেনেছে। অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, আসমান-জমীন, চন্দ্র-সূর্য এর কোনকিছুই দেব-দেবী নয়, কোন কিছুই পূজনীয় নয়, এর সবই আল্লাহ পাক মানুষের কল্যাণার্থে সৃষ্টি করেছেন। কেননা মানুষ হলো আশরাফুল মাখলুকাত বা সেরা সৃষ্টি। অতএব, কোন সৃষ্টির সম্মুখে মানুষ মাথা নত করতে পারেনা। পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি। শুধু এক

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৯, পৃঃ ১২৬
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৪, পৃঃ ১৪১

আল্লাহ পাকের নিকটই মানুষ মাথা নত করবে, তাঁর প্রতিই আনুগত্য প্রকাশ করবে।

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا ط

আর যদি তোমরা আল্লাহ পাকের নেয়ামত গণনা করতে চাও, তবে তা কোনদিন শেষ করতে পারবেনা। কেননা মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকের নেয়ামত অসীম, তাই আল্লাহর নেয়ামত গণনা করে শেষ করা যায় না। আর এ কারণেই আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহের শোকর আদায় করাও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই মোমেন বন্দা যদি শোকর গুজারীতে অক্ষমতার কথা বিনীতভাবে প্রকাশ করে তবে আল্লাহ পাক তাকে শোকর গুজার বন্দা হিসেবে গ্রহণ করেন।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ পাক হযরত দাউদ (আঃ)-কে শোকর গুজারীর নির্দেশ দিয়েছিলেন। হযরত দাউদ (আঃ)-কে আল্লাহ পাক তাঁর নবী মনোনীত করেছিলেন, তাঁকে দেশের বাদশাহও বানিয়েছিলেন। কিন্তু হযরত দাউদ (আঃ) বিনীতভাবে আরজী পেশ করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনার শোকর গুজারী আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি এ ব্যাপারে অক্ষম, আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করলেন, শোকর গুজারী কেন সম্ভব নয়? হযরত দাউদ (আঃ) আরজ করলেন, হে আমার প্রতিপালক! যদি আমি আপনার শোকর আদায় করতে চাই তবে আপনার তওফিক ব্যতীত তা সম্ভব নয়। আর আপনার তওফিক একটি স্বতন্ত্র নেয়ামত। এ নেয়ামতের শোকর আদায় করাও আমার কর্তব্য। এভাবে নেয়ামতের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আর আপনার শোকর আদায়েও আমি অক্ষম হবো। এ কারণে আপনার শোকর আদায় করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, হে দাউদ! তুমি যে এ সত্য উপলব্ধি কর যে আমার শোকর করতে তুমি অক্ষম, এ অক্ষমতার উপলব্ধিই আমার শোকর গুজারী।

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ ○

নিশ্চয় মানুষ অত্যন্ত সীমালংঘনকারী, অবাধ্য। চরম বিপদের সময় মানুষ ধৈর্য হারা হয়ে যায়। আর একথা জানেনা যে আল্লাহ পাক অত্যন্ত দয়াবান। আর তাঁর সব কাজই হেকমতপূর্ণ। সে হেকমত তোমরা অনুধাবন করতে পার, কি না পার। মানুষ যখন আল্লাহ পাকের নেয়ামত লাভ করে তখন তার কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করা, কিন্তু সে তা করেনা, বরং নেয়ামত লাভের কারণে আরও বেশী নাফরমানী করে, এভাবে আত্ম-বিস্মৃত মানুষ নিজের প্রতিই জুলুম করে। মূলতঃ মানুষ পাপাচারের মাধ্যমে নিজের প্রতি জুলুম করে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে বিপদের উপকরণ তৈরী করে। অথবা আল্লাহ পাকের নেয়ামতের শোকর আদায় না করে মানুষ নিজেকে নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করে, তাই নিজের প্রতিই সে জুলুম করে।

অথবা এর অর্থ হলো, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি প্রাপ্ত নেয়ামতের উপরই জুলুম করে এ মর্মে যে, সে লব্ধ নেয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা, অথবা যে নেয়ামত দাতা তাঁর শোকর

আদায় করেনা। যে নেয়ামত দেয়না, দিতে পারেনা, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এভাবে তারা নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করে।

একখানি হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ আমার এবং জ্বীন ও মানুষের অবস্থা বিস্ময়কর। আমি সৃষ্টি করি, আর তারা অন্যদের পূজা করে, আমি তাদেরকে রিয্ক দান করি, তারা অন্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।[১]

(হাকেম, বায়হাকী)

আলোচ্য আয়াতে মানব চরিত্র ব্যখ্যা করা হয়েছে যে মানুষ জালেম, সীমালংঘনকারী, আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করেও তাঁর অবাধ্য হয়। আল্লাহ পাক তাদের হেদায়েতের জন্য রসূল প্রেরণ করেছেন, তাঁর আগমন হলো সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে নেয়ামত, তিনি হলেন রহমত, কিন্তু তারা এ নেয়ামত গ্রহণ তথা তাঁর মহান আদর্শ বরণে অস্বীকৃতি জানায়, তাঁর সাথে দুশমনি করে।

তাই মানুষ জালেম, অবাধ্য।[২]

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে তওহীদ তথা আল্লাহ পাকের একত্ববাদ এবং তাঁর নেয়ামত সমূহের আলোচনা ছিল। এ আয়াতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়ার উল্লেখ রয়েছে।

যেহেতু মক্কাবাসী এ ধারণা পোষণ করতো যে তারা ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধর এবং তাঁর অনুসারী, তাই আল্লাহ পাক এখানে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়ার উল্লেখ করেছেন, যেন মক্কাবাসী জানতে পারে যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন খাঁটি তওহীদবাদী, তিনি ছিলেন তওহীদের প্রচারক, শেরক ছিল তাঁর নিকট সর্বাধিক ঘৃণ্য এবং নিন্দনীয়, তিনি তাঁর বংশধরদের জন্যেও এই দোয়া করে গেছেন যেন আল্লাহ পাক তাদেরকে শেরক থেকে রক্ষা করেন।

তাই হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধরদের একান্ত কর্তব্য হলো তাঁর আদর্শের অনুসরণ করা। অতএব, তোমাদেরও কর্তব্য হলো এক আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহের জন্যে শোকর গুজার হওয়া।

এক আল্লাহ পাকের বন্দেগীর জন্যেই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পবিত্র কা'বা শরীফ তৈরী করেছিলেন, যারা আল্লাহ পাকের বন্দেগী করে শুধু তারাই হতে পারে এ ঘরের খেদমতগার। এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا

"আর স্মরণ কর সে সময়কে যখন ইব্রাহীম বলেছিলেনঃ হে আমার প্রতিপালক! এই

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ৩১০
২। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৪, পৃঃ ১৪৭

নগরকে শান্তি-ধাম কর"।

وَاجْنُبْنِىْ وَبَنِىَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ○

"আমাকে এবং আমার সন্তান-সন্ততীকে মূর্তি-পূজা থেকে দূরে রাখ"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, আম্বিয়ায়ে কেরাম যে মাসুম বা নিঃস্পাপ হন, তার কারণ হলো আল্লাহ্ পাকের তওফিক এবং বিশেষভাবে আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে হেফাজত-মূলক ব্যবস্থা।

জন্মের দিক থেকে তাঁরা অন্য মানুষের ন্যায়ই, কিন্তু তাঁদের ব্যাপারে আল্লাহ্ পাকের বিশেষ হেফাজত-মূলক ব্যবস্থা কার্যকর থাকে, যার মাধ্যমে তাঁদেরকে সর্ব প্রকার গুনাহ থেকে হেফাজত করা হয়। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর বংশধরদের জন্যে দোয়া করেছেন যেন শেরক ও পৌত্তলিকতার গুনাহ্ থেকে আল্লাহ্ পাক তাঁদেরকে রক্ষা করেন।

আলোচ্য আয়াতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দু'টি দোয়ার উল্লেখ রয়েছে।

১. মক্কা নগরীকে শান্তি-ধামে পরিণত করুন এবং শহরবাসীর মন থেকে ভয় দূর করে দিন, তাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা দান করুন।

২. হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এ দোয়াও করেছেন, তাঁকে এবং তাঁর সন্তান-সন্ততীকে যেন শেরক ও পৌত্তলিকতা থেকে রক্ষা করা হয়।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন যে, কা'বা শরীফের নির্মাণের বহু দিন পর তাঁর শেষ বয়সে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ্ পাকের দরবারে এ দোয়া করেছিলেন।

তওহীদে বিশ্বাসের আহবান

এ আয়াত দ্বারা মক্কাবাসীকে তওহীদে বিশ্বাস স্থাপনের আহবান জানানো হয়েছে এ মর্মে যে, হে মক্কাবাসী! তোমরা নিজেদেরকে ইব্রাহীমের বংশধর বলে দাবী কর। তিনিই মক্কা শরীফে আল্লাহর এই ঘরখানি নির্মাণ করেছেন, তোমরা মক্কায়ে মোয়াজ্জমার অধিবাসী হওয়ার কারণে যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হয়েছ, আল্লাহ্ পাকের অসীম নেয়ামত ভোগ করছো তা তো হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বরকতেই পেয়েছ। তিনি শেরক, পৌত্তলিকতা-তথা মূর্তি পূজা পরিহার করার জন্যে দেশত্যাগ করেছিলেন। জীবনের শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত শেরক থেকে দূরে থাকার তওফিকের জন্যে আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করে গেছেন, অথচ তোমরা তাঁর বংশধর হওয়ার দাবীদার হয়েও শেরক ও পৌত্তলিকতায় লিপ্ত রয়েছ।

দোয়ার আদব

দোয়ার আদব হলো অন্যের জন্য দোয়া করার পূর্বে নিজের জন্যে দোয়া করা। তাই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) শেরক থেকে দূরে থাকার তওফিকের জন্যে দোয়া করেছেন। প্রথমে নিজের জন্যে এবং পরে বংশধরদের জন্যে আর দোয়ায় নিজের পিতা-মাতাকেও

শামিল করা কর্তব্য।

তফসীরকারগণ একথাও বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে যে সন্তান-সন্ততীর কথা উল্লেখ রয়েছে তা যদি তাঁর ঔরষজাত সন্তান-সন্ততী হয়, তবে তাঁর এ দোয়াও আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হয়েছে। কেননা তাঁর ঔরষজাত কোন সন্তান-সন্ততী শেরক করেনি। যেমন হযরত ইসমাঈল (আঃ), হযরত ইসহাক (আঃ), তাঁরা আল্লাহর নবী ছিলেন, আল্লাহ পাক তাঁদেরকে শেরক কুফর সহ যাবতীয় পাপাচার থেকে রক্ষা করেছেন। তাঁরা ছিলেন নিঃস্পাপ, নিঃস্কলংক। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) অবগত ছিলেন যে, তাঁর ঔরষজাত কোন সন্তান-সন্ততী শেরক করবে না, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি এজন্যে দোয়া করেছেন যেন একথা প্রকাশিত হয় যে, আমাদের নিঃস্পাপ হওয়া স্বভাবগত বা চেষ্টা-তদবীরের সুফল নয়; বরং আল্লাহ পাকের মহান দান, তিনিই আমাদের রক্ষাকর্তা। এ অবস্থায় আলোচ্য আয়াতের অর্থ হবে, হে আল্লাহ! আমাকে এবং আমার সন্তান-সন্ততীকে তওহীদের উপর সুদৃঢ় রাখ এবং তোমার দয়া ও করুণায় সর্ব প্রকার শেরক থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর। আল্লাহ পাক তাই তাঁকে এবং তাঁর সন্তান- সন্ততীকে রক্ষা করেছেন।

পক্ষান্তরে, যদি সন্তান-সন্ততী বলতে সর্ব প্রকার সন্তান-সন্ততী তথা বংশধর উদ্দেশ্য হয় তবে তাঁদের কিছু সংখ্যক লোকের জন্যে এ দোয়া কবুল হয়েছে।

কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন, আলোচ্য আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, নবী রসূলগণ পর্যন্ত শেরক, কুফর এবং পাপচারের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত ছিলেন না, বরং সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত এবং সতর্ক থাকতেন। এ সতর্কতা এবং সাবধানতার কারণেই আল্লাহ পাকের বিশেষ দানে ধন্য হয়ে তাঁরা মাসুম বা নিঃষ্পাপ। অতএব, মানুষের কর্তব্য হলো কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের ধোঁকা সম্পর্কে সর্বদা সাবধাণ থাকা।

ইমাম তবরী (রঃ) তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেনঃ আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সন্তানদের ব্যাপারে তাঁর দোয়া কবুল করেছেন, এজন্যেই তাঁর সকল সন্তান শেরক ও পৌত্তলিকতা থেকে পবিত্র ছিলেন।

অতএব, এখানে এ প্রশ্ন অবান্তর যে মক্কার কোরায়েশরা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধর হওয়ার দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও শেরক করেছিল, কেননা কোরায়েশরা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঔরষজাত সন্তান-সন্ততী ছিলনা। এতদ্ব্যতীত, যদি কোরায়েশদেরকে তাঁর বংশধর মেনেও নেয়া হয়, তবু তাঁর দোয়া কবুলিয়তের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন উত্থিত হবেনা, কেননা জরুরী নয় যে কোন নবীর দোয়া সকল বংশধরদের ব্যাপারে কবুল হবে।

দ্বিতীয়তঃ পবিত্র কোরআনে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়ার উল্লেখ রয়েছে। দোয়া কবুল হয়েছে কি হয়নি, তার উল্লেখ নেই। আর একথা সুস্পষ্ট যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর এ দোয়া ছিল ঔরষজাত সন্তানদের জন্যে, ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যে নয়।

এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ মক্কায়ে মোয়াজ্জমাকে শান্তি-ধাম এবং নিরাপদ শহর বানাবার জন্যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যে দোয়া করেছেন তা

সম্পূর্ণভাবে কবুল হয়েছে। যদি কোন মানুষ তার জীবনের নিরাপত্তার অভাব অনুভব করতো, তখন সে মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় হাযির হতো, এমনকি প্রাণের শত্রুর সঙ্গে মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় সাক্ষাত হতো কিন্তু পরস্পরকে ভয় করতোনা, এমনকি পশু-পক্ষী পর্যন্ত এই পবিত্র শহরে নিজেকে নিরাপদ মনে করে, নিঃসন্দেহে এটি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়ার ফলশ্রুতি।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

ইমাম রাজী (রঃ) একটি প্রশ্ন উত্থাপন করে তার জবাব দিয়েছেন।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) অবগত ছিলেন যে আম্বিয়ায়ে কেরাম নিঃস্পাপ। আল্লাহ্ পাক তাঁদেরকে যাবতীয় পাপাচার থেকে হেফাজত করেন, এমনি অবস্থায় এ দোয়ার তাৎপর্য কি? তিনি বলেছেনঃ হে পরওয়ারদেগার! আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততীকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখ।

ইমাম রাজী (রঃ) এর দু'টি জবাব দিয়েছেন—

১. হযরত ইব্রাহীম (আঃ) জানতেন যে, আল্লাহ্ পাক তাঁকে এবং তাঁর সন্তান-সন্ততীকে শেরক থেকে রক্ষা করবেন। কিন্তু এতদসত্বেত্ত তিনি বিনয় প্রকাশার্থে এবং জীবনের সকল অবস্থায় আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে মুখাপেক্ষী থাকার অবস্থা বর্ণনার জন্যে এ দোয়া করেছেন।

২. সুফী-সাধকগণ বলেছেন, শেরক দু'প্রকার। প্রকাশ্য এবং গোপন। প্রকাশ্য শেরক যা পৌত্তলিকরা করে, আর গোপন শেরক হলো মানব মনের সে সম্পর্ক যা কোন সৃষ্টির সঙ্গে থাকে, যে সৃষ্টিকে মানুষ তার উদ্দেশ্য হাসিলের মাধ্যম বা উপকরণ মনে করে।

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কিছুর নিকট কোন প্রকার আশা করাকে সুফী-সাধকগণ গোপন শেরক বলেন। কেননা, আশা শুধু আল্লাহ্ পাকেরই কাছে, ভরসা একমাত্র আল্লাহ্ পাকের প্রতি, এটিই প্রকৃত মোমেনের বৈশিষ্ট্য। আর এ মর্মেই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করেছেন।

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۖ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٦﴾ رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿٣٧﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿٣٨﴾

তরজমা

(৩৬) হে আমার প্রতিপালক! এই প্রতিমাগুলো অনেক মানুষকে বিভ্রান্ত করেছে। অতএব, যে আমার অনুসরণ করবে সে-ই আমার দলভুক্ত। আর যে আমার অবাধ্য হলো (আপনি ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করতে পারেন) আপনিতো অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।

(৩৭) হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার একটি সন্তানকে অনুর্বর উপত্যকায় আপনার পবিত্র গৃহের নিকট বাস করতে দিয়েছি। হে আমাদের প্রতিপালক! এজন্যে যেন তারা নামাজ কায়েম করে। অতএব, আপনি তাদের প্রতি কিছু মানুষের মন আকৃষ্ট করে দিন এবং তাদেরকে ফলমূলের জীবিকা দান করুন, হয়তো তারা শোকর গুজার হবে।

(৩৮) হে আমাদের প্রতিপালক! আপনিতো জানেন যা আমরা গোপনে করি, যা আমরা প্রকাশ্যে করি, আসমান জমিনের কোন কিছুই আল্লাহ পাকের নিকট গোপন থাকেনা।

তফসীরুল কোরআন

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করেছেন এই বলে যে, হে আল্লাহ! আমাকে এবং আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তি-পূজা থেকে দূরে রাখ, আমার সন্তানেরা যেন শয়তানের প্রতারণায় পথভ্রষ্ট না হয়ে যায়। হে আমার প্রতিপালক! এ মূর্তিগুলো অনেক মানুষের গোমরাহী এবং পথভ্রষ্টতার কারণ হয়েছে, বহু লোক এদের ফাঁদে পড়ে পথহারা এবং ধ্বংস হয়েছে।

فَمَنْ تَبِعَنِىْ فَاِنَّهٗ مِنِّىْ

"যে কেউ মূর্তি পূজা পরিত্যাগ করে এবং আমার নির্দেশ মোতাবেক তওহীদে বিশ্বাস করে এবং আমার অনুসরণ করে, শুধু সে-ই আমার দলভুক্ত"।

وَمَنْ عَصَانِىْ

পক্ষান্তরে, যে তওহীদে বিশ্বাস করেনা তার সম্পর্কে এতটুকু আরজী পেশ করি যে আপনি ইচ্ছা করলে তাকে হেদায়েত করে ক্ষমা করতে পারেন। আপনার অপার করুণাই তার নাজাতের কারণ হতে পারে।

فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

"হে আল্লাহ! আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান"।

তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, এ বাক্যটির অর্থ হলো, যে আমার নাফরমানী করে, এরপর তওবা করে তাহলে হে পরওয়াদেগার! আপনি তাকে মাফ করুন। কেননা আপনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে যে নাফরমানীর কথা বলা হয়েছে তা হলো শেরক ব্যতীত অন্য নাফরমানী। কেননা, শেরকের গুনাহ আল্লাহ পাক মাফ করবেন না একথা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, عصانى শব্দটির মধ্যে শেরকও অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এ দোয়া তখন করেছেন যখন তিনি এ বিষয়ে অবগত ছিলেন না যে আল্লাহ পাক শেরকের গুনাহ মাফ করবেন না। যখন এ বিষয়ে তাঁকে অবগত করানো হয়েছে, তখন তিনি এ দোয়া করেছেনঃ

وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ

অর্থাৎ- তাদেরকে ফলমূলের রিয্ক দান কর যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। এ দোয়ায় শুধু ঈমানদারদেরকে রিয্ক দানের কথা বলা হয়েছে এজন্যে যে, যখন মুশরেককে ক্ষমা করা হবেনা বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, তখন হয়তো আল্লাহ পাক দুনিয়াতে মুশরেকদেরকে শাস্তি দেবেন, রিযক থেকে মাহরূম করবেন। যেহেতু এ ধারণা সঠিক নয়, সেজন্যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ

"যে নাফরমান হবে তাকে কিছু সময় পর্যন্ত দুনিয়ার আসবাবপত্র উপভোগ করার সুযোগ দেব, এরপর কাফেরদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করবো"।

অর্থাৎ কাফেরদেরকে দুনিয়ার নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করবোনা, আর আখেরাতে মাফ

করা হবেনা।

رَبَّنَآ اِنِّىۡٓ اَسۡكَنۡتُ مِنۡ ذُرِّيَّتِىۡ

"হে আমার প্রতিপালক! অমি আমার একটি সন্তানকে অনুর্বর উপত্যকায় আপনার পবিত্র গৃহের নিকট বাস করতে দিয়েছি"।

এ সন্তান হলো হযরত ইসমাঈল (আঃ) এবং তাঁর বংশধরগণ। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁকেই রেখেছিলেন মক্কায়ে মোয়াজ্জমায়।

بِوَادٍ غَيۡرِ ذِىۡ زَرۡعٍ

অনুর্বর উপত্যকায়

মক্কা এমনি একটি স্থান যার চারিপার্শ্বে পাহাড় ঘেরা ছিল, প্রস্তর-খণ্ডে পরিপূর্ণ ছিল, সেখানে চাষাবাদ করা সম্ভব নয়, এজন্যে এ বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে।

عِنۡدَ بَيۡتِكَ الۡمُحَرَّمِ

আপনার পবিত্র গৃহের নিকট।

আর বায়তুল্লাহ বলতে এখানে সে ঘরটি উদ্দেশ্য করা হয়েছে যা নূহ (আঃ)-এর প্লাকনের পূর্বে ছিল।

মক্কা নগরীর পবিত্রতা ঘোষণা

মক্কা বিজয়ের দিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক যেদিন আসমান জমিন তৈরী করেছেন সেদিনই এ শহরটিকে সম্মানিত এবং পবিত্র শহর বলে ঘোষণা করেছেন। অতএব, কেয়ামত পর্যন্ত এ শহর আল্লাহ পাকের প্রদত্ত সম্মানের কারণে পবিত্র এবং সম্মানিত থাকবে। এখানে লড়াই করা কারো জন্যে বৈধ নয়, এমনকি আমার জন্যে এক ঘণ্টার বেশী লড়াই করা বৈধ নয়। এখানের কাঁটা পর্যন্ত কর্তন করার অনুমতি নেই। এখানে শিকারকে কেউ পলায়নে বাধ্য করবেনা। এখানে কোন পড়ে থাকা জিনিস কেউ ওঠাবেনা, শুধু এ উদ্দেশ্যে হতে পারে যে সেই জিনিসের পরিচয় বর্ণনা করলে তার মালিক তা উঠিয়ে নেবে। এখানের ঘাসও কাটবেনা। হযরত আব্বাস (রাঃ) তখন আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! এজখার নামক গাছকে এই আদেশের বাইরে রাখুন।

ওয়াকেদী এবং এবনে আসাকের আমের এবনে সাঈদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, সারা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী ছিলেন, তাঁর ঘরে কোন সন্তান-সন্ততি জন্ম গ্রহণ করেনি। হযরত হাজেরার ঘরে যখন হযরত ইসমাঈল (আঃ) জন্ম গ্রহণ করেন তখন হযরত সারা'র অন্তরে প্রতিদ্বন্দিতার মনোভাব জাগ্রত হলো। তখন তিনি শপথ করলেন যে হাজেরার কর্ণ এবং নাসিকা কর্তন করবেন যেন তার আকৃতি বিকৃত হয় এবং ইব্রাহীম (আঃ) তাঁকে ঘৃণা করেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সারাকে বললেন, তুমি কি তোমার শপথ পূর্ণ করতে চাও? হযরত সারা বললেন, আমি কি করবো, আমার শপথ পূর্ণ করার কি উপায় আছে? হযরত

ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, হাজেরার দু'টি কান ছিদ্র করে দাও। হযরত সারা তাই করলেন। হযরত হাজেরা কান ছিদ্র করার পর দু'টি দুল কানে ব্যবহার করলেন, ফলে তার সৌন্দর্য আরো বেড়ে গেল। হযরত সারা পছন্দ করতেন না যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হাজেরার সঙ্গে থাকেন। কিন্তু হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অন্তরে হযরত হাজেরার জন্যে অত্যন্ত মহব্বত ছিল, তিনি হাজেরাকে মক্কায় নিয়ে গেলেন। তিনি প্রতিদিন বোরাকে আরোহণ করে সিরিয়া থেকে মক্কায় আসতেন, হাজেরার সঙ্গে একত্রিত হতেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হযরত হাজেরা এবং তাঁর পুত্র ইসমাঈলকে নিয়ে মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় যেখানে বর্তমান বায়তুল্লাহ শরীফ রয়েছে তার নিকট পৌঁছেন। জমজম কূপের পাশে একটি বড় বৃক্ষের নিচে তাঁদের উভয়কে বসিয়ে দেন। হযরত ইসমাঈল (আঃ) তখন দুগ্ধ পোষ্য শিশু ছিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কিছু খেজুর এবং পানি দিয়ে সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। হযরত হাজেরা পেছন পেছন আসলেন এবং (স্বামীকে) বললেন, আপনি কি এ কাজটি আল্লাহ পাকের হুকুমে করছেন? হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তখন জবাব দিলেন, "হ্যা"।

হযরত হাজেরা তখন বললেন, তাহলে আল্লাহ পাক আমাদেরকে বিনষ্ট করবেন না। এরপর তিনি হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর নিকট ফিরে এলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন হযরত হাজেরার দৃষ্টির আড়াল হয়ে চলে গেলেন তখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কা'বামুখী হয়ে দু'হাত তুলে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করলেন যা আলোচ্য আয়াতে স্থান পেয়েছে।

رَبَّنَآ إِنِّىٓ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِى

হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর মাতা খেজুর এবং পানি দ্বারা কয়েকদিন অতিবাহিত করলেন। কিন্তু অবশেষে পানি এবং খেজুর উভয়টিই শেষ হয়ে গেল। তিনি তৃষ্ণার্ত হলেন। শিশু ইসমাঈলের দিকে তাকিয়ে দেখলেন সে-ও তৃষ্ণার্ত। তখন তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে সাফা পাহাড়ের উপর আরোহণ করলেন। মরু প্রান্তরের দিকে বারে বারে তাকালেন, যদি কাউকে দেখতে পান। যখন কোন মানুষ দেখতে পেলেন না তখন সাফা পাহাড় থেকে দৌড়ে মারওয়া পাহাড়ে আরোহন করলেন, সেখানেও কোন জন-মানুষের সন্ধান পেলেন না।

এভাবে সাতবার এ পাহাড় থেকে ও পাহাড়ে গেলেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ এজন্যেই হাজী মাত্রকে সাফা-মারওয়া পাহাড়ে সাতবার দৌড়াতে হয়।

শেষবার তিনি একটি গায়বী আওয়াজ শ্রবণ করলেন এবং নিজেকে বললেন, "চুপ থাক"। এরপর পুনরায় আওয়াজ শ্রবণ করলেন। তখন বললেন, "আমি আওয়াজ শ্রবণ করেছি যদি তোমার নিকট কোন সাহায্য থাকে তবে নিয়ে আস"। হঠাৎ জমজম কূপের

কাছে একজন ফেরেশতা আত্মপ্রকাশ করলেন এবং তাঁর পদাঘাতের কারণে সেখান থেকে পানি বের হতে লাগলো। হযরত হাজেরা অঞ্জলী ভরে পানি তাঁর মশকে রাখতে লাগলেন। তখন পানি সজোরে আসতে লাগলো। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর মাতার প্রতি আল্লাহর রহমত হোক। যদি তিনি জমজমকে ওভাবেই রেখে দিতেন অথবা তিনি অঞ্জলী ভরে পানি না তুলতেন তবে এটি একটি প্রবাহিত ঝরণা হয়ে যেত। যাহোক, হযরত হাজেরা নিজেও পানি পান করলেন এবং শিশু ইসমাঈলকেও পানি পান করালেন। ফেরেশতা বললেন, "তুমি ধ্বংস হওয়ার আশংকা করোনা, এই শিশু এবং তাঁর পিতা এখানে আল্লাহ পাকের গৃহ নির্মাণ করবেন, আল্লাহ পাক তাঁর আপনজনদেকে বিনষ্ট করেন না"। কা'বা শরীফ সে যুগে একটি উঁচু উপত্যকার ন্যায় ছিল। বন্যার পানি তার ডানে বাঁমে আসতো। হযরত হাজেরা ঐ অবস্থায়ই দিন অতিবাহিত করতে লাগলেন। অবশেষে বণী জুরহাম গোত্রের এক কাফেলা মক্কার নিম্নাঞ্চলে এসে অবস্থান গ্রহণ করলো। কাফেলার লোকেরা দেখতে পেল যে, কিছু পাখি উড়ছে। তারা বলতে লাগলো, এই পাখিগুলো অবশ্যই পানির পার্শ্বে ঘোরাফেরা করছে। কিন্তু আমরা ইতিপূর্বেও এ স্থান অতিক্রম করেছি তখনো এ স্থানে কোন পানি ছিল না। তাই তারা অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্যে কিছু লোক প্রেরণ করলো। তারা এসে দেখলো ঠিকই পানি রয়েছে, তাই তারা সঙ্গীদেরকে যখন পানি পাওয়ার কথা বললো, তখন কাফেলার লোকেরা এসে হযরত ইসমাঈলের (আঃ) মাতার নিকট আরজী পেশ করলো, "আমাদেরকে আপনার নিকট বসবাসের অনুমতি দান করুন"। হযরত হাজেরা বললেন, "তোমরা অবস্থান করতে পার তবে পানির উপর তোমাদের কোন মালিকানা থাকবেনা"। কাফেলার লোকেরা তখন এ অঙ্গীকার করলো।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর মাতা সেখানে একা বাস করছিলেন। তাই তিনি তাঁর একাকীত্ব দূর করতে চেয়েছিলেন। পানির উপর তাঁরই নিয়ন্ত্রণ রইলো এবং ধীরে ধীরে কাফেলার লোকেরা তাদের আপনজনদেরকেও নিয়ে আসলো।

হযরত ইসমাঈল (আঃ) শৈশব কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করলেন। যৌবন লাভের পর তিনি বণী জুরহাম গোত্রের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করলেন। আর বণী জুরহাম গোত্রের একটি মেয়ের সাথে তাঁর বিবাহ হলো। এরই মধ্যে ইসমাঈল (আঃ)-এর মাতার এন্তেকাল হলো। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়ার বরকতে একসময়ের জনশূন্য মক্কা এভাবে একটি জনপদে পরিণত হলো। হযরত ইসমাঈল (আঃ) তাঁর দোয়ার বরকত দেখার জন্যে মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় আগমন করলেন।[১]

ইসমাঈল (আঃ) ঘরে ছিলেন না। ছিলেন শুধু তাঁর স্ত্রী। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ৩১৪-১৫

জিজ্ঞাসা করলেন, "ইসমাঈল কোথায়?"

জবাবে তাঁর স্ত্রী বললেন, "তিনি বাইরে গেছেন"।

কিন্তু সে একথাও বললো না যে আপনি বসুন, তিনি আসবেন, বা কোনরকম মেহমানদারীর ব্যবস্থাও করলো না। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সুদূর সিরিয়া থেকে এসেছিলেন, তাই পুনরায় সিরিয়া অভিমুখে রওনা হলেন। বিদায় বেলা শুধু এতটুকু বললেন, "ইসমাঈল আসলে বলবে যেন ঘরের চৌকাঠটি পরিবর্তন করে"। সন্ধ্যাকালে ইসমাঈল (আঃ) এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেউ এসেছিলেন কি"? স্ত্রী বললেন, এসেছিলেন একজন বৃদ্ধ মানুষ, তিনি আপনার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন। আমি বলেছি আপনি বাইরে আছেন। তিনি বলেছেন, আপনি যেন ঘরের চৌকাঠটি পরিবর্তন করেন"।

হযরত ইসমাঈল (আঃ) বললেন, "তিনি ছিলেন আমার সম্মানিত পিতা এবং তিনি বলেছেন, আমি যেন তোমাকে তালাক দেই, তাই আমি তোমাকে তালাক দিচ্ছি"।

কিছুদিন পর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পুনরায় মক্কায় আগমন করলেন। হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে এবারও ঘরে পেলেন না। কিন্তু এরই মধ্যে ইসমাঈল (আঃ) দ্বিতীয় বিয়ে করেছিলেন। ইব্রাহীম (আঃ) তাই ইসমাঈল (আঃ)-এর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ইসমাঈল কোথায়"? তাঁর স্ত্রী বললেন, "তিনি বাইরে আছেন। আপনি ঘরে আসন গ্রহণ করুন"। এরপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর আরাম এবং আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হলো। তাঁর আদর-যত্নে এতটুকু ত্রুটি করা হলোনা। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর পুনরায় সিরিয়া রওয়ানা হলেন এবং বিদায় বেলা বললেন, ইসমাঈলকে বলবে যেন চৌকাঠটিকে যত্ন সহকারে রাখে। হযরত ইসমাঈল (আঃ) সন্ধ্যাকালে এসব খবর পেয়ে বললেন, তিনি ছিলেন আমার সম্মানিত পিতা, তিনি তোমাকে যত্ন সহকারে রাখার নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সেদিন আরও দোয়া করেছিলেন, "হে পরওয়ারদেগার! আমি আমার সন্তানদেরকে এজন্যে এই নির্জন স্থানে রেখে গেছি যেন তাঁরা নামাজ কায়েম করে। হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে নামাজ কায়েম করার তওফিক দান কর"।

এর দ্বারা পবিত্র কোরআন এ শিক্ষা দিচ্ছে যে, প্রত্যেক পিতা-মাতা যেন তাদের সন্তান-সন্ততীকে নামাজের তাগিদ করে এবং নামাজের তওফিকের জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করে।

فَاجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِىْٓ اِلَيْهِمْ

(হে আমার পরওয়ারদেগার!) তুমি তাদের প্রতি কিছু মানুষের মন আকৃষ্ট করে দাও। তফসীরকার সুদ্দী (রহঃ) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ

"আর তাদেরকে ফলমূলের জীবিকা দান কর, হয়তো তারা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে"।

অর্থাৎ যদিও এ স্থানটি চাষাবাদের উপযোগী নয় তবু এ স্থানের অধিবাসীদেরকে জীবিকা হিসাবে ফলমূল দান কর।

আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়া কবুল করেছেন, মক্কা নগরীকে আল্লাহ পাক নিরাপদ নগরে পরিণত করেছেন এবং এই শহরের চতুর্দিক থেকে সর্ব প্রকার ফলের আমদানী হয়। সকল মওসুমের সর্ব প্রকার ফল এই শহরে সর্বদা সরবরাহ করা হয়, এটি হচ্ছে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়ার ফলশ্রুতি।

رَبَّنَآ اِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِىْ وَمَا نُعْلِنُ

হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যা কিছু গোপন করি অথবা যা কিছু প্রকাশ করি সবই তুমি জানো। আমাদের সকল অবস্থা সম্পর্কে তুমি জানো। আমাদের সকল অবস্থা সম্পর্কে তুমি সম্পূর্ণ অবগত। আসমান জমীনের কোন কিছুই তোমার নিকট গোপন নেই। সবই তোমার নখদর্পণে, তাই তোমার নিকট দোয়া করারও তেমন প্রয়োজন নেই। আমরা শুধু নিজের বন্দেগী প্রকাশ করার জন্যেই তোমার মহান দরবারে আরজী পেশ করে থাকি। আর আমরা যে তোমার দরবারের ফকির, তোমার রহমতের অন্বেষণকারী, এজন্যেই তোমার হুজুরে মোনাজাত করে থাকি।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং মোকাতেল (রহঃ) বলেছেন, হযরত ইসমাঈল (আঃ) এবং তাঁর মাতাকে মক্কার বিরাণ উপত্যকায় রেখে যাওয়ার কারণে হয়ত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মন যে ব্যথিত হয়েছিল তারই উল্লেখ রয়েছে আলোচ্য বাক্যে।

وَمَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَىْءٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ

"আর আল্লাহ পাকের নিকট ভূমণ্ডল এবং নভোমণ্ডলের কোন কিছু গোপন নেই।"

ইমাম রাজী (রহঃ) লিখেছেন, "এটি আল্লাহ পাকেরই কালামের অংশ"। অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কথার স্বীকৃতি দিয়ে আল্লাহ পাক এই ঘোষণা দিয়েছেন, অথবা এটিও হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এরই কথার অংশ। এ মর্মে যে, হে আল্লাহ! তুমি যে আমাদের মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠে সংরক্ষিত সব কথা জান তাই নয়, বরং ভূ-মন্ডল, নভোমন্ডলের কোন কিছুই তোমার নিকট গোপন নেই, সবই তোমার নিকট দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট এবং দেদীপ্যমান।

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى وَهَبَ لِى عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَٰعِيلَ وَإِسْحَٰقَ ۚ إِنَّ رَبِّى لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿٣٩﴾ رَبِّ ٱجْعَلْنِى مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِى ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ﴿٤٠﴾ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿٤١﴾ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَٰفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّٰلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَٰرُ ﴿٤٢﴾ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِى رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۖ وَأَفْـِٔدَتُهُمْ هَوَآءٌ ﴿٤٣﴾

তরজমা

(৩৯) সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ পাকেরই জন্যে যিনি আমাকে বার্ধক্য বয়সে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন, নিশ্চয় আমার প্রতিপালক দোয়া কবুল করে থাকেন।

(৪০) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার সন্তান-সন্ততিকে নামাজ কায়েমকারী বানাও, হে আমাদের প্রতিপালক! আর আমাদের দোয়া কবুল কর।

(৪১) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার পিতা-মাতাকে ও ঈমানদারদেরকে হিসাবের দিন ক্ষমা করে দিও।

(৪২) আর জালেম যা কিছু করেছে সে সম্পর্কে তুমি আল্লাহ পাককে বে-খবর মনে করোনা। তবে তিনি তাদেরকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দেন যেদিন তাদের চক্ষু হবে স্থির।

(৪৩) ভীত-বিহবল চিত্তে আসমানের দিকে চেয়ে তারা ছুটোছুটি করবে, নিজেদের দিকে তাদের দৃষ্টি ফেরাবে না, তাদের প্রাণ-পাখী উড়ে যাবে।

তফসীরুল কোরআন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لِىْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে, অনন্ত অসীম দয়া তাঁরই, যিনি আমাকে বার্ধক্য বয়সেও ইসমাঈল ও ইসহাকের ন্যায় সুপুত্র দান করেছেন। দিয়েছেন আমাকে বংশ গৌরব। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী হাজেরার তরফ থেকে ইসমাঈল (আঃ) এবং সারাহ'র তরফ থেকে ইসহাক (আঃ)-কে পেয়েছিলেন। এটি আল্লাহ পাকের অনন্ত করুণা, অসামান্য এবং অসাধারণ অনুগ্রহ।

বর্ণিত আছে যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বয়স যখন ৮৪, তখন হযরত ইসমাঈল (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন, আর তাঁর ১০০ বছর বয়সে জন্মগ্রহণ করেন ইসহাক (আঃ)। এ বিবরণ রয়েছে তৌরাতে।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ৯৯ বছর বয়সে ইসমাঈল (আঃ) এবং ১১২ বছর বয়সে ইসহাক (আঃ) জন্মগ্রহণ করেন।

এবনে যরীর সাঈদ এবনে যোবাইর (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে তার ১১৭ বছর বয়সে ইসহাক (আঃ)-এর জন্মের সু-সংবাদ দেয়া হয়।[২]

সন্তান-সন্ততি নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের মহান দান, শ্রেষ্ঠ নেয়ামত, আর বিশেষতঃ বার্ধক্য বয়সে অত্যন্ত বড় নেয়ামত।

إِنَّ رَبِّىْ لَسَمِيْعُ الدُّعَاءِ

নিশ্চয় আমার প্রতিপালক আমার দোয়া শ্রবণকারী, তথা গ্রহণকারী তিনি আমার দোয়া কবুল করেন। যেমন বলা হয়-

سمع الملك الكلام

"বাদশাহ আমার কথা শ্রবণ করেছেন", এর অর্থ হলো বাদশাহ ফরিয়াদ কবুল করেছেন। এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো নিশ্চয় আমার প্রতিপালক আমার দোয়া কবুল করেছেন, তিনি তাঁর বন্দাদের দোয়া কবুল করে থাকেন, যেমন আল্লাহ পাক স্বয়ং এরশাদ করেছেনঃ

اُدْعُوْنِىْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ

"তোমরা আমার নিকট দোয়া কর, আমি কবুল করবো"।

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ পাকের সমীপে সন্তানের জন্যে দোয়া করেছিলেন যা কবুল হয়েছে।

এ বাক্যে রয়েছে দোয়ার আদব এবং আল্লাহ পাকের মহান দরবারে দোয়া করার শিক্ষা। আম্বিয়ায়ে কেরাম কি কি বিষয়ে কত বিনয় ও মিনতির সঙ্গে দরবারে এলাহীতে শোকর আদায় করেছেন এবং আরজী পেশ করেছেন তা বিশেষভাবে লক্ষণীয় এবং শিক্ষণীয়।

رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার বংশধরদের মধ্যে কিছু লোককে নামাজ

১। তফসীরে মাজেদী, খন্ড-১, পৃঃ ৫৩৪
২। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ৩১৭

কায়েম করার তওফিক দিও"।

নামাজ কায়েম করার তাৎপর্য হলো নামাজের আরকান, আহকাম, শর্তসমূহ সঠিকভাবে পালন করে যথা নিয়মে, যথাসময়ে সর্বদা নামাজ আদায় করা।

وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ

(আমার বংশধর থেকে কিছু লোককে)

তফসীরকারগণ লিখেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, তাঁর বংশধরদের মধ্যে কিছু লোক কাফের হবে। তাই তিনি তাঁর দোয়ায় এ শব্দটি ব্যবহার করেছেন কেননা, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন,

لَا يَنَالُ عَهْدِي الظّٰلِمِيْنَ

"যারা সীমালংঘনকারী তারা আমার অঙ্গীকার (এর সুফল) লাভ করবে না"।

رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

"হে আমার প্রতিপালক! এবং আমার এবাদত কবুল করো"।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন ইমাম আহমদ (রহঃ) এবং ইমাম বোখারী (রহঃ)। এবনে হাব্বান এবং হাকেম, নোমান এবনে বশীরের হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং আবু ইয়ালা হযরত বারা এবনে আযেব (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসের উল্লেখ করেছেন যে, হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ এখানে দোয়া (শব্দটি) এবাদত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক! আমার এবাদত কবুল করো।

তিরমিজী শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দোয়া হচ্ছে এবাদতের মগজ।

رَبَّنَا اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে মাফ করো, আমার পিতা-মাতাকেও মাফ করো"।

তফসীরকারগণ এ পর্যায়ে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতা-মাতা কাফের এবং মুশরেক ছিল, তাদের জন্যে কিভাবে তিনি দোয়া করলেন?

ইমাম রাজী (রহঃ) এ প্রশ্নের জবাবে লিখেছেন,

১. তিনি পিতা-মাতা বলে আদম-হাওয়াকে বুঝিয়েছেন।

২. ইসলামের শর্তে এ দোয়া করেছেন, অর্থাৎ যদি আমার পিতা-মাতা ইসলাম গ্রহণ

করে তবে তাদেরকে মাফ করে দিও।[১]

অন্যান্য তফসীরকারগণ এ প্রশ্নের জবাবে লিখেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পিতা-মাতার শেষ পরিণাম কুফরী ও নাফরমানী হবে এ সম্পর্কে সুনিশ্চিতভাবে অবহিত হওয়ার পূর্বেই এ দোয়া করেছিলেন।

তবে যদি একথা মেনে নেয়া হয় যে, তিনি পিতার মৃত্যুর পর এই দোয়া করেছেন, তবে এ প্রশ্নের জবাব হবে এই, কাফেরদের মাগফেরাতের সম্পর্কে দোয়া করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হবার পূর্বে তিনি এ দোয়া করেছেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, এ প্রশ্নের জবাব আল্লাহ পাক কোরআন শরীফে দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ

অর্থাৎ ইব্রাহীম তার পিতার জন্যে এ কারণে মাগফেরাতের দোয়া করেছে যে, সে এর ওয়াদা করেছিলো, কিন্তু যখন এ সত্য প্রকাশিত হলো যে, তার পিতা আল্লাহর দুশমন, তখন সে তার উপর অসন্তুষ্ট হলো।[২]

وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ

"হে প্রতিপালক! কেয়ামতের দিন সকল মোমেনকে মাফ করে দিও"।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) প্রথমে নিজের জন্যে, পরে তাঁর পিতা-মাতার জন্য, সবশেষে সকল মোমেনের মাগফেরাতের জন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে দোয়া করেছেন। এ মর্মে যে কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক যেন দয়া করে সকল মোমেনকে মাফ করে দেন। আল্লাহ পাকের দরবার থেকে মাগফেরাত লাভই বড় পাওয়া, তাই তা সবারই একান্ত কাম্য।

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে তওহীদের বিবরণ এবং মুশরেকদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছিল।

এ আয়াত থেকে আখেরাত সম্পর্কে যারা গাফলতের আবর্তে নিপতিত, তাদেরকে সাবধান করা হয়েছে, এরশাদ হয়েছেঃ যারা কাফের মুশরেক, অবাধ্য নাফরমান, তাদের চরম দৌরাত্ম্য সত্ত্বেও যদি তাদেরকে শাস্তি না দেয়া হয়, বা তাদের প্রতি কোন প্রকার আজাব না আসে তবে কেউ যেন এই ভুল ধারণা না করে যে, আল্লাহ পাক জালেমদের দুষ্কৃতি ও দৌরাত্ম সম্পর্কে বে-খবর, বরং প্রকৃত অবস্থা এই যে, আল্লাহ পাক সর্বশক্তিমান, তিনি যে কোন সময় জালেমদের শাস্তি বিধান করতে পারেন, তবে তাঁর প্রতিটি কর্ম

১। তফসীরে কবীর, খন্ড-১৯, পৃঃ ১৪০
২। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ৩১৮

হেকমতপূর্ণ এবং তাৎপর্যবহ। তিনি অপরাধীদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি দেননা, বরং অবকাশ দিয়ে থাকেন, তবে যখন অপরাধীরা সীমা লংঘন করে তখন তাদেরকে পাকড়াও করেন।

অতএব, জালেমদের শাস্তি বিধানে বিলম্ব হওয়া তাদের নিরাপত্তার আলামত নয়, বরং তাদের কঠিন কঠোর শাস্তিরই লক্ষণ। আর এ উদ্দেশ্যেই তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়।[১]

তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ

"আর জালেমরা যা করছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ পাককে গাফেল মনে করো না"।

আলোচ্য আয়াতে জালেম বলতে কাফেরদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আয়াতের মর্মবাণী হলো কাফেরদের তাৎক্ষণিক শাস্তি না দেয়ার কারণ এই নয় যে আল্লাহ পাক তাদের দুষ্কৃতি সম্পর্কে অবগত নন, বরং তিনি তাদের যাবতীয় অন্যায়-অনাচার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত, তাদের প্রতিটি মুহূর্ত সম্পর্কে তিনি ওয়াকেফহাল, তাদেরকে এজন্যে অবকাশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে পুরস্কার বা শাস্তির জন্যে একটি সময় নির্দিষ্ট রয়েছে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ আয়াতে সান্ত্বনা রয়েছে মজলুমের জন্যে যে অবশেষে জালেমের বিচার অবশ্যই হবে। আর জালেমের উদ্দেশ্যে রয়েছে এতে কঠোর সতর্কবাণী।

إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْأَبْصَارُ

তাদেরকে শুধু সেদিনের জন্যেই অবকাশ দিয়ে রেখেছি যেদিন (ভয়াবহ আজাব দেখে) তাদের চক্ষুস্থির হয়ে থাকবে, তারা উর্ধ্বমুখে মাথা তুলে ছোটাছুটি করতে থাকবে, এদিক-সেদিক দেখবার অবস্থা তাদের থাকবে না, কেননা কেয়ামতের দিন মানুষ শুধু আকাশের দিকে চেয়ে থাকবে, একে অন্যের দিকে দেখার মত অবস্থায় থাকবে না। এমনকি–

لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ

তাদের চোখ তাদের দিকেও ফিরে আসবেনা, অর্থাৎ তাদের নিজেদের দিকে তাকাবার অবস্থাও থাকবেনা। কেয়ামতের ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় মানুষ এমন বিহবল হয়ে থাকবে, অতিশয় ভীতির কারণে এবং বিস্ময়ে মানুষ বুদ্ধিহীন হয়ে যাবে, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ

(আর তাদের অন্তর হবে শূণ্য)

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৪, পৃঃ ১৪৬

সাঈদ এবনে যুবায়ের (রঃ) এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, তাদের অন্তর এত অস্থির এবং ব্যাকুল হবে যে তারা কোথাও শান্তি পাবেনা।

ইমাম কাতাদা (রঃ) কেয়ামতের দিনের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে বলেছেনঃ

তাদের হৃদয় যেন বক্ষ থেকে বের হয়ে আসবে এবং গলদেশে আটকে যাবে, রসনার বাইরে আসবে না। আর আল্লামা বগভী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো ভয়ে আতংকে প্রাণ-পাখি উড়োউড়ো করবে, শান্তি, সান্ত্বনা তারা কোথাও পাবেনা, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকবে হিসাবের স্থানের দিকে। অতএব, হে কাফের মুশরেক বেদ্বীনরা! সতর্ক হও, যে আখেরাতের কথা তোমরা অস্বীকার কর, যে কেয়ামতের দিনকে তোমরা অবিশ্বাস কর সেদিন অবশ্যই আসবে, সেদিন তোমাদেরকে আর অবকাশ দেয়া হবে না।

ইমাম হাসান (আঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ নগ্ন অবস্থায় উঠবে, তখন উম্মুল মোমেনীন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, মানুষ একে অন্যকে দেখবে? তিনি এরশাদ করলেন, চক্ষুগুলো জ্যোতিবিহীন হয়ে যাবে, তখন তিনি আবেদন করলেন, আপনি দোয়া করুন যেন আমি নগ্ন না হই। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তার আবরুর হেফাযত কর।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, কেয়ামতের দিনের ভয়াবহ অবস্থার কারণে তথা প্রচণ্ড ভয়ে কোন মানুষ ডানে-বামে দেখবে না এমনকি, নিজের পায়ের দিকেও দেখবে না।

হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, আকাশের দিকে চেয়ে থাকবে প্রতিটি মানুষ, অন্যকে দেখার মত অবস্থা কারোই থাকবেনা, ভয় এবং বিস্ময় এত বেশি হবে যে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পাবে, অন্তর শূণ্য হয়ে যাবে।

হযরত আবুজর (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন মানুষকে তিন ভাগে ওঠানো হবে, একদল আরোহী পোশাক পরিহিত অবস্থায়, দ্বিতীয় দল পদব্রজে তবে অত্যন্ত দ্রুতগামী হবে।

হযরত জাবের (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একদল লোক পিপীলিকার আকৃতিতে উঠবে। মানুষ তাদেরকে পদদলিত করবে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করবে? এদের কি হয়েছে? তখন বলা হবে তারা (দুনিয়াতে) অহংকারী, অবাধ্য ছিল।[১]

১। খোলাসাতুত তাফাসীর, খন্ড-২,পৃঃ ৫০১

وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ
فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ
وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ ۗ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ ﴿٤٤﴾
وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ
فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ﴿٤٥﴾ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ
اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿٤٦﴾

তরজমা

(৪৪) আর যেদিন আজাব আসবে সেদিন সম্বন্ধে আপনি মানুষকে সতর্ক করুন। জালেমরা যখন বলবে হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের কিছু সময় অবকাশ দিন, আমরা আপনার আহ্বানে সাড়া দেব এবং আপনার রসূলগণের অনুসরণ করবো (তোমরা কি ইতিপূর্বে শপথ করে বলোনি যে তোমাদের পতন নেই?)

(৪৫) আর তোমরাতো তাদেরই বাড়ি-ঘরে বাস করতে, যারা নিজেদের উপর জুলুম করেছিল। তাদের সঙ্গে আমি কি করেছিলাম, তা-ও তোমাদের নিকট প্রকাশ পেয়েছে, আর আমি তোমাদের জন্যে দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করলাম।

(৪৬) আর তারা ভীষণ চক্রান্ত করেছে কিন্তু আল্লাহ পাকের সম্মুখে রয়েছে তাদের সকল চক্রান্ত, যদিও তাদের চক্রান্ত এমন হয় যে পাহাড়কে পর্যন্ত তার স্থান থেকে সরিয়ে নিতে পারে।

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছেঃ হে রসূল! মানুষকে সেদিন সম্বন্ধে ভয় প্রদর্শন করুন যেদিন তাদের নিকট আজাব

আসবে। সেদিন কোন্‌টি? এর জবাবে তফসীরকারগণ বলেছেন যে, সেদিন হলো মৃত্যুর দিন। মৃত্যুর সময়ের যে কষ্ট, প্রাণ বায়ু বের হওয়ার যে যন্ত্রণা তার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অতএব, মৃত্যুর দিনকে আজাবের দিন বলা হয়েছে।

অথবা যেদিন কাফেরদের প্রতি আজাব আপতিত হবে এবং তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করা হবে সেদিনকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে এ আয়াত দ্বারা।

অথবা এ দিন বলতে কেয়ামতের দিনকে বোঝানো হয়েছে কেননা সেদিন হবে সমগ্র মানব জাতির জন্যে ভয়াবহতম দিন, যাহোক এ তিনটি দিনের যে কোন দিন আলোচ্য আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হতে পারে।[১]

فَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَا اَخِّرْنَا

মৃত্যুকালীন কষ্টকর অবস্থায় কাফেররা বলবে, হে আমাদের পরওয়ারদেগার! এখনি মৃত্যু না দিয়ে যদি আমাদেরকে এ পৃথিবীতে কয়েকটি দিন বেচে থাকার সুযোগ দাও তবে আমরা তোমার আহ্বানে সাড়া দেব এবং তোমার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করবো এবং তোমার নবী রসূলগণের তাবেদারী করবো, শুধু সামান্য অবকাশ আমাদেরকে দাও।

আল্লামা এবনে কাসীর (রহঃ) লিখেছেন, এ আয়াতটির মর্ম সে আয়াতের ন্যায়ই, যে আয়াতে মোমেনদের সম্বোধন করে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ......

অর্থাৎ হে মোমেনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্ পাকের স্মরণ থেকে গাফেল করে না রাখে, যারা তা করবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমি যে রিয্‌ক তোমাদেরকে দান করেছি তা থেকে আল্লাহর রাহে ব্যয় কর। এমন যেন না হয় সে মৃত্যুর সময় তোমরা এ আকাংক্ষা কর যে আমাকে সামান্য অবকাশ দিলে আমি আল্লাহর রাহে দান করবো আর নেককার লোকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবো। মনে রেখো, মৃত্যুর সময় যখন আসবে তখন কাউকে অবকাশ দেয়া হবেনা। আর আল্লাহ পাক তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। ঠিক এমনিভাবে আলোচ্য আয়াতেও এরশাদ হয়েছে, কাফেররা মৃত্যুর সময় একথা বলবেঃ

اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ

অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে কিছুটা সময় অবকাশ দাও, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তারা উত্তর পাবেঃ

اَوَلَمْ تَكُوْنُوْا اَقْسَمْتُمْ

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ৩১৪-১৫
ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃঃ ৩৩৭
তফসীরে কবীর, খন্ড-১৯, পৃঃ ১৪২

এখন চেতনা ফিরে এসেছে? ইতিপূর্বে জোর গলায় তোমরা শপথ করে বলতে, তোমাদের কোনদিন পতন হবেনা, মৃত্যুর পর পুনঃরুত্থান হবেনা, কেয়ামত কখনো আসবেনা, এ জগতই সবকিছু, এখান থেকে আমাদের বিদায় নেই, বিনাশ নেই, আমরা পৃথিবীর চিরস্থায়ী বাসিন্দা। আল্লাহ পাকের দরবারের উপস্থিতিতে তোমরা বিশ্বাস করতে না, আখেরাতের আজাবকে তোমরা অস্বীকার করতে।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, কাফেররা এসব কথা শুধু যে মুখে বলতো তাই নয়, বরং তারা মনে মনে অনেক সুদীর্ঘ আশা-আকাংক্ষা পোষণ করতো এবং অনেক আকাশ চুম্বী ইমারত তৈরি করতো, যা দ্বারা তাদের এ বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটতো যে তারা কোনদিন এ পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করবে না, তারা শপথ করে বলতোঃ যার মৃত্যু হবে তাকে আল্লাহ পুনরায় জীবিত করবেন না।

وَسَكَنتُمْ فِى مَسَٰكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ

মানুষের শিক্ষা লাভের জন্যে একাধিক পথ রয়েছে, কোন কোন সময় কারো শিক্ষণীয় ঘটনা দেখেও মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে, সতর্কতা অবলম্বন করে অতএব, তোমাদেরও অন্যদের অবস্থা দেখে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। বর্তমানে তোমরা যেসব জনপদে বাস করছো ইতিপূর্বে এখানে দূরাত্মা জালেমরা বাস করতো, তাদের অন্যায়-অনাচারের জুলুম-অত্যাচারের শোচনীয় পরিণাম স্বরূপ তারা পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়েছে যেমন হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতি, আদ জাতি, সামুদ জাতি প্রভৃতি। যে অন্যায়ের কারণে তাদের শাস্তি হয়েছে যদি তোমরা অনুরূপ অন্যায় কর তবে তোমাদের শাস্তিও অবধারিত। অতএব তাদের ঘটনাবলী তোমাদের জন্যে শিক্ষণীয়।

وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ

আর আমি তাদের সাথে কি করেছি তা-ও তোমাদের নিকট প্রকাশ পেয়েছে এবং তাদের অনেক দৃষ্টান্ত আমি তোমাদের নিকট বর্ণনা করেছি। পাপীষ্ঠরা যে অন্যায় আচরণ করেছে তার শাস্তি তারা ভোগ করেছে। নবী রসূলগণের মাধ্যমে, আসমানী কিতাবের মাধ্যমে তোমাদের নিকট এ ঐতিহাসিক সত্য সমূহ তুলে ধরেছি কিন্তু তোমরা সৎপথ গ্রহণ করোনি, অন্যায়-অনাচার, সত্যদ্রোহিতায় অবিচল থেকে তোমরা নিজেরাই নিজের ধ্বংস ডেকে এনেছো।

وَقَدْ مَكَرُوا۟ مَكْرَهُمْ

আর তারা অনেক ষড়যন্ত্র করেছে, অর্থাৎ মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে অনেক ষড়যন্ত্র করেছে, তাঁকে দেশ থেকে বহিষ্কার করার, বন্দী করার, এমনকি তাঁকে হত্যার করার ষড়যন্ত্রও তারা করেছিল। মক্কার কাফেররা সত্যকে

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু), পারা-১৩, পৃঃ ৮১-৮২

প্রতিরোধ করার এমন কোন চেষ্টা-তদবির ছিল না যা তারা করেনি। পূর্বকালের পাপীষ্ঠদের ন্যায়ই মক্কার কোরায়েশরা সর্ব প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।

وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ

এ বাক্যটির দু'টি অর্থ বর্ণিত হয়েছে।

(১) অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নিকট তাদের এ ষড়যন্ত্রের বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে, যথা সময়ে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে।

(২) অথবা এ বাক্যটির অর্থ হলো তাদের এসব ষড়যন্ত্রের শাস্তি বিধানের জন্যে আল্লাহ পাকের নিকটও গোপন তদবির রয়েছে, যার মাধ্যমে তাদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে এবং তাদেরকে যথোপযুক্ত শাস্তি দেয়া হবে। আর তারা কল্পনাও করতে পারবেনা কিভাবে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে।[১]

وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ

"যদিও তাদের ষড়যন্ত্র এত জঘন্য হয় যে পাহাড় পর্যন্ত তার স্থান থেকে সরে যায়"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এর অর্থ হলো তাদের ষড়যন্ত্র এত জঘন্য ছিল যে পাহাড়ের ন্যায় শক্তিশালী বস্তুও তার স্থান থেকে সরে যেতে পারে, কিন্তু দ্বীন ইসলামের কোন ক্ষতিই তারা করতে পারেনি। পাথরে যদি কেউ মাথা ঠুকে তবে মাথা ভেঙ্গে যাবে, পাথরের কিছুই হবেনা। ঠিক এমনিভাবে যারা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় আল্লাহর রসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল, তারা সত্য ধর্ম দ্বীন ইসলামের কোন ক্ষতিই করতে পারেনি।

আলোচ্য আয়াতের আরো একটি অর্থ হলো তারা যত ষড়যন্ত্রই করুক আর তাদের কৌশল যত ভয়ংকরই হোক না কেন, তারা পাহাড়কে তার স্থান থেকে সরাতে পারবেনা। الجبال (পাহাড়) দ্বারা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যত ও আল্লাহ পাকের বিধান উদ্দেশ্য করা হয়েছে অর্থাৎ–কাফেররা যত ষড়যন্ত্রই করুক না কেন আর যত শক্তিই প্রয়োগ করুক না কেন, তারা দ্বীন ইসলামের তথা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কোন ক্ষতিই করতে পারবেনা। দ্বীন ইসলাম বা শরীয়ত পাহাড়ের ন্যায় মজবুত এবং সুদৃঢ়, কাফেররা ষড়যন্ত্র করে পাহাড়কে তথা দ্বীন ইসলামের বুনিয়াদকে উপড়ে ফেলতে পারবেনা।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল দূরাত্মা কাফেরদের বিরোধিতা এবং ষড়যন্ত্র যত শক্তিশালীই হোক না কেন, তারা পাহাড়কে তার স্থান থেকে সরাতে পারবে না। আর প্রথম যে অর্থ বর্ণিত হয়েছে তা গ্রহণ করা হলে এর তাৎপর্য হবে, কাফেররা যে ষড়যন্ত্র করেছে তার দ্বারা পাহাড়কেও তার স্থান থেকে সরাতে পারে, কিন্তু দ্বীন ইসলাম যে

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ৩২১
তফসীরে কবীর, খন্ড-১৯, পৃঃ ১৪৪

পাহাড় থেকেও শক্তিশালী, সুদৃঢ়, তাই দ্বীন ইসলামের ক্ষতি করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

আল্লাম বগভী (রঃ) হযরত আলী (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আলোচ্য আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে জালেম রাজা নমরূদ সম্পর্কে। এ দূরাত্মা নমরূদই হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সঙ্গে আল্লাহ্ পাকের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল। নমরূদ বলেছিল, যদি ইব্রাহীম (আঃ)-এর কথা সত্য হয় তবে আমি নিজে আসমানে গিয়ে দেখবো সেখানে কি অবস্থা আছে। তখন সে আসমানে যাওয়ার একটি পরিকল্পনা করলো। সে শকুনের চারটি বাচ্চাকে লালন-পালন করলো এবং প্রশিক্ষণ দিল। যখন শকুনের বাচ্চাগুলো যৌবন লাভ করলো তখন একটি কাঠের বাক্স তৈরী করা হলো, তার দু'টি দুয়ার রাখা হলো, একটি উপরের দিকে, একটি নিচের দিকে। আর চারটি কাষ্ঠ খণ্ড চার কোণায় রেখে দিল। আর প্রত্যেকটি কাষ্ঠ খণ্ডের মাথায় গোশ্তের টুকরা বেধে দিল, এরপর ঐ কাষ্ঠ নির্মিত বাক্সটি শকুনগুলোর উরুর সঙ্গে বেঁধে দেয়া হলো। বাক্সটি নীচে আর শকুন উপরে। আর নমরূদ ঐ বাক্সের মধ্যে বসে গেল। এরপর শকুনগুলো উপরের দিকে উঠতে লাগলো। শকুনগুলো গোশ্ত খাওয়ার জন্যে উপরের দিকে উঠতে থাকলো, নমরূদ তার সাথীকে বললো, উপরের দিকের দ্বার খুলে দাও, আসমান নিকটবর্তী হয়েছে কি-না দেখ, তার সাথী দরজা খুলে দেখল এবং বললো, আসমান পূর্বের ন্যায় দূরেই রয়েছে। নমরূদ বললো, এবার নীচের দ্বার খুলে দেখ। তার সাথী নীচের দিকের দুয়ার খুলে দেখলো এবং বললো, সারা পৃথিবীটা একটা পুষ্করণীর ন্যায় মনে হয়। আর পাহাড়গুলো ধোঁয়ার ন্যায় দেখা যায়। এভাবে দু'দিন কেটে গেল। যখন উপরের দিকে যাওয়া কঠিনতর হতে লাগলো তখন নমরূদ নীচের দিকের দুয়ার খুলে দিল এবং পৃথিবী তখন অন্ধকার দেখা গেল। ঐ মুহূর্তে গায়ব থেকে আওয়াজ আসলো, হে বিদ্রোহী! তুমি কোথায় যেতে চাও? একরামার বর্ণনা হলো, নমরূদের সঙ্গে একজন গোলামও ছিল। নমরূদ তাকে বললো, উপরের দিকে তীর ছাড়। সে তখন তীরটি উপরের দিকে নিক্ষেপ করলো। তীর রক্তাপ্লুত হয়ে ফিরে আসলো। হয়তো কোন পাখীর রক্ত হবে। নমরূদ বললো, আসমানের খোদার কাজতো আমি শেষ করেছি (নাউজুবিল্লাহে মিন জালিক)।

এরপর নমরূদ তার সাথীকে আদেশ দেয় যেসব খুঁটির মাথায় গোশ্ত ছিল সেগুলোকে নীচের দিকে করে দাও। শকুনগুলো গোশ্ত নিম্নমুখী দেখে নীচের দিকে যেতে লাগলো। পাহাড়গুলো ঐ কাঠের বাক্স এবং শকুনের চলার শব্দ শুনে ভীত হলো এবং তাদের ধারণা হলো আসমান থেকে কোন বিপদ আসছে, হয়তো কেয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে। তখন এমন অবস্থা হয়েছে যে পাহাড় তার স্থান থেকে ভয়ে ও আতংকে সরে যাওয়ার উপক্রম হয়।

আলোচ্য আয়াতে এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।[১]

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু), পারা-১৩, পৃঃ ৮২
তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ৩২২
তফসীরে তবরী, খন্ড-১৩, পৃঃ ১৬১

فَلَا تَحْسَبَنَّ
اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ تُبَدَّلُ
الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ وَبَرَزُوْا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿٤٨﴾
وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ ﴿٤٩﴾ سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ
قَطِرَانٍ وَّتَغْشٰى وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ﴿٥٠﴾ لِيَجْزِىَ اللّٰهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ﴿٥١﴾ هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَ
لِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿٥٢﴾
سُوْرَةُ الْحِجْرِ مَكِّيَّةٌ وَّهِىَ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ اٰيَةً وَّسِتُّ رُكُوْعَاتٍ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○
الٓرٰ ۫ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿١﴾

তরজমা

(৪৭) (হে রসূল!) আপনি কখনও মনে করবেন না যে, আল্লাহ পাক তাঁর রসূলগণের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পাক প্রবল পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

(৪৮) যেদিন এ পৃথিবী এবং এই আকাশ পরিবর্তিত হয়ে অন্য পৃথিবী ও অন্য আকাশ হবে এবং মানুষ উপস্থিত হবে আল্লাহ পাকের দরবারের যিনি এক, যিনি পরাক্রমশালী।

(৪৯) (হে রসূল!) আপনি সেদিন পাপীষ্ঠদেরকে দেখবেন শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায়।

(৫০) তাদের জামা হবে গন্ধকের, আর অগ্নি তাদের মুখমণ্ডলগুলোকে আচ্ছন্ন করে রাখবে।

(৫১) তা এজন্যে যে, আল্লাহ পাক প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিফল দিতে চান। নিশ্চয় আল্লাহ পাক অতি সত্বর হিসাব গ্রহণ করবেন।

(৫২) এটি মানুষের জন্যে এক বার্তা, এর দ্বারা যেন তারা সতর্ক হয় এবং জানতে পারে যে তিনিই একমাত্র মা'বুদ এবং যেন বুদ্ধিমান লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে।

সূরা হিজর

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্ পাকের নামে

(১) আলিফ-লাম-রা। এ আয়াত সমূহ মহান গ্রন্থ সুস্পষ্ট কোরআনের।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ

অর্থাৎ জালেমদের কীর্তিকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাককে বেখবর মনে করোনা। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهٖ رُسُلَهٗ

(হে রসূল!) আপনি কখনো মনে করবেন না যে, আল্লাহ্ পাক তাঁর রসূলগণের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন, এর দ্বারা কাফের, মুশরেক এবং পাপীষ্ঠ লোকদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

প্রথমতঃ একথা বলে যে, দূরাত্মা কাফেরদের অন্যায় আচরণ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বে-খবর নন, তাদের যাবতীয় কীর্তিকলাপ তাঁর নখদর্পণে রয়েছে, যথাসময়ে তাদের যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্ পাক তাঁর রসূলগণকে সাহায্য করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা অবশ্যই রক্ষা করা হবে এবং দুশমনদেরকে ধ্বংস করার যে ইচ্ছা তিনি ব্যক্ত করেছেন, তা অবশ্যই পূর্ণ করা হবে। আল্লাহ্ পাক নবীগণকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا

"নিশ্চয় আমি আমার রসূলগণকে সাহায্য করবো"।

আর দুশমনদেরকে ধ্বংস করার ব্যাপারে এরশাদ হয়েছেঃ

لَنُهْلِكَنَّ الظّٰلِمِيْنَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ

"আমি জালেমদের অবশ্যই ধ্বংস করব এবং তোমাদেরকে তাদের পরে এ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করবো"।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাঁর পয়গম্বরদের সুনিশ্চিত বিজয়ের কথা ঘোষণা করে এরশাদ করেছেনঃ নবী রসূলগণকে সাহায্য করার যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা অবশ্যই পূর্ণ করা হবে, দ্বীন ইসলামের দুশমনদেরকে তাদের কৃতকর্মের শাস্তি দেয়া হবে, এ পর্যায়ে আল্লাহ্ পাকের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হবে। বিলম্ব হলে তথা

কাফেরদেরকে অবকাশ দেয়া হলে কোন প্রকার ভুল বোঝাবুঝির কারণ নেই। আল্লাহ পাক সত্যকে অবশ্যই বিজয় দান করবেন এবং কাফের মুশরেকদেরকে নিশ্চয় শাস্তি দেবেন, তারা যত ফন্দি-ফিকিরিই করুক না কেন, কোন অবস্থাতেই আত্মরক্ষা করতে পারবে না। কেননা,

إِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ পাক পরাক্রমশালী, কেউ তাঁর মোকাবেলা করতে পারবে না, তাঁর ইচ্ছা ও মর্জির খেলাফ কোন ষড়যন্ত্র কার্যকরী হয়না।

ذُوانْتِقَامٍ

তিনি নিশ্চয় প্রতিশোধ গ্রহণকারী, তাঁর রসূলের দুশমনদের থেকে তিনি অবশ্যই প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوٰتُ

"যেদিন এই পৃথিবী এবং আকাশমণ্ডলী পরিবর্তিত হবে"।

মূলতঃ কেয়ামতের দিন এ পৃথিবী এবং আসমান সমূহ পরিবর্তিত হয়ে যাবে। কোন জিনিসের পরিবর্তনের দু'টি পন্থা হয়ঃ

(এক) সেই জিনিসের বদলে অন্য একটি জিনিস উপস্থাপন করা যেমন, দেরহামের স্থলে দীনার দেয়া। কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

بَدَّلْنٰهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا

"দোজখীদের চামড়া পরিবর্তন করে অন্য চামড়া দিয়ে দেব"।

(দুই) ঐ জিনিসটি ঠিকই থাকবে, তার আকৃতি-প্রকৃতি পরিবর্তন করা হবে।

কেয়ামতের দিন আসমান জমীনের পরিবর্তন

এখানে প্রশ্ন হলো আলোচ্য আয়াতে আসমান জমীনের পরিবর্তনের যে কথা বলা হয়েছে, তা কোন্ ধরনের পরিবর্তন? এ পর্যায়ে হাদীস শরীফে বিস্তারিত বিবরণ এসেছে। আবদুর রাজ্জাক, এবনে হামিদ, এবনে জরীর, এবনে আবি হাতেম এবং বায়হাকী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদের (রাঃ) কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ জমীন পরিবর্তন করে এমন জমীন দেয়া হবে যা রূপার ন্যায় হবে। যেখানে কখনো অন্যায়ভাবে কারো রক্ত প্রবাহিত করা হয়নি। কখনো কোন গুণাহর কাজ হয়নি। আর একথাটি হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর নয়; বরং তিনি হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথা বর্ণনা করেছেন যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক জমীনকে রূপার জমীনের ন্যায় করবেন, যেখানে কোন পাপকার্য হয়নি।

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেছেনঃ সেদিন জমীন হবে রূপার, আসমান হবে স্বর্ণের। আহমদ এবনে হামিদ একথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, আমার নিকট এ বিবরণ পৌঁছেছে, এ জমীনকে গুটিয়ে ফেলা হবে এবং তার স্থলে অন্য জমীন হবে এবং ঐ জমীনে মানুষকে একত্রিত করা হবে।

হযরত সাহাল এবনে সা'দ (রাঃ) বর্ণিত হাদীস বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে, হযরত সাহাল (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আমি নিজে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "কেয়ামতের দিন মানুষকে একটি সাদা জমিনের উপর একত্রিত করা হবে। এই হাদীসে তিনি একথাও বলেছেন, ঐ জমীনে কোন ইমারতের নিদর্শন থাকবে না।

আলোচ্য আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) কথার উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন, এ জমীন পরিবর্তন করা হবে। পাহাড়-পর্বত, উপত্যকা, বৃক্ষ-তরুলতা সবই নিঃশেষ করা হবে, চামড়ার ন্যায় তাকে ছড়িয়ে দেয়া হবে, তা রূপার ন্যায় সাদা এমন জমীন হবে, যেখানে কারো রক্ত প্রবাহিত হয়নি এবং কোন গুণাহর কাজও করা হয়নি এবং আসমানে চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র থাকবে না।

হাকেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কেয়ামতের দিন জমীনকে চামড়ার ন্যায় ছড়িয়ে দেয়া হবে এবং সকল সৃষ্টিকে সেখানে একত্রিত করা হবে।

হাকেম হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন জমীনকে চামড়ার ন্যায় ছড়িয়ে দেয়া হবে, কোন মানুষের জন্যে তার পা রাখার চেয়ে অধিক স্থান থাকবে না। তখন সর্ব প্রথম আমাকে ডাকা হবে, আমি সেজদারত হব। এরপর আমাকে অনুমতি দেয়া হবে, তখন আমি দণ্ডায়মান হব এবং আরজ করবো, হে আমার প্রতিপালক! ইনি জীব্রাঈল! (হযরত জীব্রাঈল (আঃ) তখন দয়াময় আল্লাহ পাকের ডান দিকে থাকবেন, আর জীব্রাঈল (আঃ) ইতিপূর্বে কখনো রহমানুর রহীম আল্লাহ পাককে দেখেননি) জীব্রাঈল (আঃ) আমাকে জানিয়েছিলেন, আপনি তাঁকে আমার নিকট প্রেরণ করেছিলেন।

(তখন জীব্রাঈল (আঃ) নীরব থাকবেন) আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, সে ঠিক বলেছিল, এরপর আল্লাহ পাক আমাকে শাফায়াত করার অনুমতি দান করবেন। আমি আরজ করবো, হে আমার প্রতিপালক! তোমার বন্দা জমীনের চতুর্দিকেই রয়েছে, মূলতঃ এটিই হবে "মকামে মাহমুদ" (আল্লাহ পাকের প্রশংসা বর্ণনার স্থান) যেখানে কেয়ামতের দিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পৌঁছিয়ে সম্মানিত করা হবে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন জমিন একটি রুটি হবে যা আল্লাহ পাক জান্নাতবাসীর মেহমানদারীর জন্যে স্ব-হস্তে তৈরি করবেন, যেমন তোমরা ভ্রমণের অবস্থার জন্যে নিজেদের রুটি তৈরি

কর।

এই হাদীসে نزلا لاهل الجنة শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, এর অর্থ হলো মেহমানকে মূল খাদ্য সরবরাহের পূর্বে যা পেশ করা হয়। অতএব জান্নাতবাসীগণকে জান্নাতে পৌঁছার পূর্বে বিভিন্ন স্থানে জমীনের রুটি দেয়া হবে। অবশেষে তারা জান্নাতে পৌঁছে যাবে। হাফেজ এবনে হজর আসকালানী (রঃ) লিখেছেনঃ এই হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, হাশরের ময়দানের বিভিন্ন অবস্থায় মোমেনগণ ক্ষুধার কষ্ট পাবেন না; বরং আল্লাহ পাক স্বীয় কুদরতে জমীনের স্বভাব পরিবর্তন করে দেবেন এবং আল্লাহ পাকের মর্জি মোতাবেক মোমেনগণ তাদের পায়ের নীচে থেকে কোন প্রকার কষ্ট ব্যতীত রুটি উঠিয়ে আহার করবে। একথার সমর্থন পাওয়া যায় সাঈদ এবনে জোবায়েরের ঐ বর্ণনা থেকে, যার উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবনে জরীর। এ মর্মে যে জমিন রুটিতে রূপান্তরিত হবে, যা মোমেনগণ নিজের পায়ের নীচ থেকে তুলে খাবে। মোহাম্মদ এবনে কা'ব থেকেও এমনি কথা বর্ণিত আছে।

বায়হাকী একরামা (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, জমীন সাদা রুটিতে রূপান্তরিত হবে, যা মুসলমানগণ হিসাব-নিকাশ শেষ হওয়া পর্যন্ত আহার করবে। খতিব হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কেয়ামতের দিন মানুষের হাশর এ অবস্থায় হবে যে, তারা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হবে। এমন ক্ষুধা আর কখনো উপলব্ধি করা হয়নি, এমন পিপাসাগ্রস্ত হবে যে, এমন পিপাসাও আর কোনদিন হয়নি, সেদিন সকলেই এমনভাবে নগ্ন থাকবে ইতিপূর্বে আর কখনো এমন নগ্ন হয়নি, আর এমন ক্লান্ত হবে যে, আর কখনো এমন ক্লান্ত হয়নি। যে দুনিয়াতে আল্লাহকে রাজী করার জন্যে মানুষকে খাবার দিয়েছে, আল্লাহ পাক সেদিন তাকে আহার করাবেন। যে দুনিয়াতে আল্লাহ পাককে রাজী করার জন্যে কোন লোককে পানি পান করিয়েছে, আল্লাহ পাক সেদিন তাকে পানি পান করাবেন। যে দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কাউকে পোষাক পরিয়েছে আল্লাহ পাক সেদিন তাকে পোষাক পরিধান করাবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে দুনিয়াতে কোন আমল করেছে, আল্লাহ পাক তার জন্যে যথেষ্ট হবেন।

এবনে জরীর এ আয়াতের তফসীরে এবনে কা'বের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আসমান বাগানে পরিণত হবে এবং সমুদ্র অগ্নিতে পরিণত হয়ে যাবে আর জমিনকে অন্য কিছুতে পরিণত করা হবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর এ কথাও বর্ণিত আছে যে, কেয়ামতের দিন ধরণী অগ্নিতে পরিণত হয়ে যাবে। কা'বে আহবারের কথা হলো সমুদ্র অগ্নিতে রূপান্তরিত হবে।

ইমাম মুসলিম (রঃ) হযরত সওবান (রাঃ) বর্ণিত হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। একজন ইহুদী ধর্মযাজক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, যে দিন জমিন পরিবর্তন করা হবে সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে? হুজুর সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, পুলসিরাতের কাছে অন্ধকারে।[১]

আল্লাম এবনে কাসীর (রঃ) এই হাদীসের আরও বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট একজন ইহুদী ধর্মযাজক আসে, সে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নাম নিয়ে "সালামুন আলাইকা" বললো। হযরত সওবান (রাঃ) বললেন, আমি তাকে অত্যন্ত জোরে ধাক্কা দিলাম তখন তার পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, আমাকে ধাক্কা দিলেন কেন? আমি বললাম, তুমি বেয়াদব, তুমি "ইয়া রসূলাল্লাহ" (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলোনি, তুমি তাঁর নাম নিয়েছো। সে বললো, তাঁর পরিবারের লোকেরা তাঁর যে নাম রেখেছেন সে নামেই আমি ডাকবো। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, আমার খান্দান আমার নাম মোহাম্মদই রেখেছেন। ইহুদী বললো, আমি আপনার নিকট একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি। তিনি এরশাদ করলেন, আমার কথা তোমার কোন উপকার আসবে কি? সে বললো, আমি শুনতে তো পারবো। তখন তিনি এরশাদ করেন ঠিক আছে তুমি জিজ্ঞাসা কর। তখন সে বললো, যখন আসমান ও জমীন পরিবর্তিত হবে তখন লোকগুলো কোথায় থাকবে? তিনি এরশাদ করলেন পুলসিরাতের কাছে, অন্ধকারে।

সে জিজ্ঞাসা করলো, সর্ব প্রথম পুলসিরাত কারা পার হবে? তিনি এরশাদ করলেন, দরিদ্র মোহাজেরগণ। সে জিজ্ঞাসা করলো, তাদেরকে সর্ব প্রথম কি উপঢৌকন দেয়া হবে? তিনি এরশাদ করলেন, মাছের কলিজার বাড়তি অংশ। সে জিজ্ঞাসা করলো, এরপর তাদেরকে কি খাদ্য সরবরাহ করা হবে? তিনি এরশাদ করলেন, জান্নাতী গরু জবেহ করা হবে, যা জান্নাতের চারিপার্শ্বেই বিচরণ করতো। এরপর সে জিজ্ঞাসা করলো, তাদেরকে কি পানীয় দ্রব্য দেয়া হবে? তিনি এরশাদ করলেন, জান্নাতী নহর সালসাবীলের পানি। ইহুদী বললো, আপনার সকল জবাবই সত্য।[১]

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, কেয়ামতের দিন ধরণী অগ্নিতে পরিণত হবে, এর পেছনে জান্নাত থাকবে, যার নেয়ামতসমূহ বাহির থেকে দেখা যাবে। লোকেরা তাদের ঘামের মধ্যে ডুবে থাকবে, অথচ তখন হিসাব-নিকাশ শুরু হবে না। মানুষের ঘাম প্রথমে তাদের পায়ে হবে কিন্তু পরে তা বৃদ্ধি পেয়ে নাক পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। আর তা কেয়ামতের দিনের ভয়াবহ দৃশ্য দেখার কারণেই হবে।

আবু দাউদ শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক জমিনকে সম্প্রসারিত করে চামড়ার ন্যায় ছড়িয়ে দেবেন। তাতে উঁচু নীচু কিছু থাকবে না। এরপর একই আওয়াজের মাধ্যমে সমগ্র সৃষ্টিকে ঐ পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেয়া হবে। এরপর তিনি এরশাদ করেছেন, সমগ্র সৃষ্টি কবর থেকে বের হয়ে এক আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হবে। সেই আল্লাহ পাকের দরবারে যিনি এক, যিনি পরিক্রমশালী, যাঁর সম্মুখে সকলের মাথা নত, সকলে যাঁর তাবেদার এবং অনুগত।[১]

১। তফসীরে মাজহারী, খন্ড-৬, পৃঃ ৩২৫-২৬
২। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু), পারা-১৩, পৃঃ ৮১-৮২

ইমাম মুসলিম হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। তিনি বলেছেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! যেদিন জমীন পরিবর্তিত হবে সেদিন মানুষ কোথায় থাকবে? তিনি এরশাদ করলেন, পুলসিরাতের উপর।

ইমাম বায়হাকী (রঃ) বলেছেন, এই বর্ণনায় "পুলসিরাতের উপর" বলার তাৎপর্য হলো এই, যেহেতু সমস্ত মানুষ পুলসিরাতের কাছেই থাকবে এবং এরপর পুলসিরাত পার হতে হবে, তাই পুলসিরাতের উপর বলা হয়েছে। অতএব, হযরত সওবান (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের মধ্যে ও এই হাদীসের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

আল্লামা সয়ুতি (রঃ) লিখেছেন, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম একাধিক মত পোষণ করেছেন যে, জমিন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে জমীন পরিবর্তন হবে? না কোন গুণ ও বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হবে।

এবনে আবি হামজা বলেছেন, এই জমিনের অস্তিত্ব বিলুপ্তি হবে এবং কেয়ামতের জন্যে নতুন জমিন সৃষ্টি করা হবে।

শায়খ এবনে হাজার (রঃ) লিখেছেন, জমিন পরিবর্তন সম্বন্ধে যে হাদীস রয়েছে এবং জমিনকে ছড়িয়ে দেয়া সম্পর্কে যে বর্ণনা রয়েছে এবং বেশী বা কম হওয়ার যে বিবরণ রয়েছে, উভয় বর্ণনায় তেমন কোন পার্থক্য নেই। কেননা, সব কিছু এ দুনিয়াতেই হবে, আর কেয়ামতের দিন মানুষের দাঁড়াবার স্থান অন্য হবে। একটি ধমকের কারণে সমস্ত লোক এখান থেকে বের হয়ে হাশরের ময়দানে পৌঁছে যাবে।

এবনে হাজার (রঃ) বলেছেন, এ সম্পর্কীয় বিভিন্ন হাদীসের বিবরণে কোন পার্থক্য নেই।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, মোমেনদের পায়ের নীচের জমিন রুটি হয়ে যাবে আর কাফেরদের পায়ের নীচের জমীন অগ্নিতে রূপান্তরিত হবে।

ইমাম কুরতবী লিখেছেন, যে সমস্ত বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় তা দূরীভূত করার জন্যে বলা যায় যে জমিন আসমানের পরিবর্তন দু'বার হবে। প্রথমবার শিংগায় ফুঁক দেয়ার পূর্বে হবে। নক্ষত্রগুলো ছুটে যাবে। চন্দ্র সূর্যের আলো থাকবে না। আসমানের বর্ণ তাম্রের ন্যায় হয়ে যাবে। পাহাড়গুলো উড়তে থাকবে, সমুদ্র অগ্নিতে রূপান্তরিত হবে, জমীনের কম্পন শুরু হবে এবং তা খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে, জমীনের আকৃতিই বদলে যাবে। এরপর প্রথম শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। তখন আসমানকে গুটিয়ে ফেলা হবে। এই আসমানের পরিবর্তে অন্য আসমান হবে। জমিনকে টেনে ছড়িয়ে দেয়া হবে, আর পূর্বে যেমন ছিল দ্বিতীয়বার তেমনি করা হবে। জমীনের অভ্যন্তরে কবর হবে, যার ভেতরে মৃতরা থাকবে।

দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুঁক দিলে জমীনের পুনরায় পরিবর্তন হবে। আর এ পরিবর্তন

১। তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু), পারা-১৩, পৃঃ ৮৩

তখনই হবে যখন লোকেরা হাশরের ময়দানে থাকবে। তখন জমীনকে পরিবর্তন করা হবে। জমীন রূপার হবে, সাদা ধূসর বর্ণ হবে। ঐ জমীন এমন হবে যাতে কখনও খুব-খারাবী হয়নি এবং সেখানে কখনও পাপ কার্য সংঘটিত হয়নি। এ পরিবর্তনের সময় লোকেরা পুলসিরাতের উপর থাকবে। আর সকলের স্থান সেখানে হবে। আর যারা সেখানে থাকবেনা তারা দোজখের পুলের উপর থাকবে। দোজখ তখন জমাট থাকবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ থেকে বর্ণিত রয়েছে, জমিন তখন অগ্নিতে রূপান্তরিত হবে, লোকেরা তখন পুলসিরাত অতিক্রম করবে তখন জমীনকে রুটিতে রূপান্তরিত করা হবে। জান্নাতে যারা যাবে তারা ঐ রুটি থেকে খাবে। জান্নাতের গরুর কলিজা অথবা মাছের কলিজা তরকারী হিসেবে হবে।

তেবরানী একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, কেয়ামতের দিন এক মসজিদ ব্যতীত আর সব ধ্বংস হয়ে যাবে। সমস্ত মসজিদকে একত্রিত করে দেয়া হবে। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার গৃহ এবং আমার মিম্বরের মধ্যকার স্থানগুলো জান্নাতের বাগানগুলোর একটি বাগান। (বোখারী ও মুসলিম)

وَبَرَزُوا لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

আর তখন সমস্ত মানুষ আল্লাহ পাকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হবে, যিনি এক এবং শক্তিশালী।

অর্থাৎ মানুষকে কবর থেকে বের হয়ে জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের হিসাব-নিকাশের জন্যে আল্লাহ পাকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হতে হবে, যিনি এক, অদ্বিতীয়, একচ্ছত্র শক্তির অধিকারী, পরাক্রমশালী।

وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ

আর পাপীষ্ঠ লোকদেরকে দেখবে সেদিন একে অন্যের সঙ্গে শৃংখলাবদ্ধ রয়েছে। যেহেতু কাফের মুশরেক বেদ্বীনরা অবিশ্বাসের দিক থেকে একে অন্যের সঙ্গে মিলে মিশে ছিল, তাই কেয়ামতের দিনে তাদেরকে একই জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে রাখা হবে।

সাঈদ এবনে মনসুর হযরত ওমর (রাঃ)-এর একথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, (কেয়ামতের দিন) নেককার মানুষকে নেককারদের সাথে জান্নাতে এবং মন্দ লোকদেরকে মন্দ লোকদের সাথে দোজখে একত্রিত করা হবে। অথবা এর অর্থ হলো, যারা দুনিয়াতে বাতিল মতবাদে বিশ্বাসী হবে এবং যারা পাপাচারে লিপ্ত থাকবে তাদের পরস্পরকে কেয়ামতের দিনে একত্রিত করা হবে এবং তাদের হাতে পায়ে এবং ঘাড়ে শেকল দিয়ে আবদ্ধ করা হবে।

سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ

তাদের জামা গবে গন্ধকের।

وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ النَّارُ

দোজখের আগুন তাদের চেহারা ঢেকে রাখবে। গন্ধকের আগুন হয় অত্যন্ত তীব্র, ভয়ংকর, তদুপরি তার গন্ধ অত্যন্ত পীড়াদায়ক। গন্ধকে অতি সত্ত্বর আগুন ধরে যায়। আর এজন্যে দোজখীদের দেহে গন্ধক ব্যবহার করা হবে।

এতদ্ব্যতীত, দোজখের আগুন তাদের চেহারা ঢেকে রাখবে।

যেহেতু কাফেররা সত্যকে গ্রহণের ব্যাপারে তাদের বিবেক-বুদ্ধিকে ব্যয় করেনি, এমনকি সত্য কথা শ্রবণের জন্যে শ্রবণ শক্তি এবং সত্য কথা বলার জন্যে বাকশক্তি ব্যয় করেনি, তাই তাদেরকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে এবং দোজখের আগুন তাদের মুখগুলোকে ঢেকে দেবে।

لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ

আর এ শাস্তি এজন্যে হবে যেন প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের বদলা দেয়া হয়। মূলতঃ প্রত্যেককে তার কর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। যে অপরাধী তাকে তার অপরাধের শাস্তি ভোগ করতেই হবে। পক্ষান্তরে, যে ঈমানের সঙ্গে নেক আমল করবে, সে তার শুভ-পরিণতি অবশ্যই লাভ করবে। হিসাব নিতে বিলম্বও হবে না।

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক অতি সত্বর হিসাব গ্রহণ করবেন"।

আর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সকলের হিসাব হবে। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা সুয়ূতী (রঃ) লিখেছেনঃ এর অর্থ হলো, একজনের হিসাব গ্রহণ অন্যের হিসাব গ্রহণে বিলম্বের কারণ হবেনা; বরং একই সঙ্গে সকলের হিসাব গ্রহণ করা হবে।

আল্লামা সয়ুতি (রঃ) একথাও লিখেছেনঃ অর্ধেক দিনের মধ্যে সকলের হিসাব গ্রহণ করা হবে।

ইমাম নখয়ী (রঃ) বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কেরাম এ ধারণা করতেন যে আল্লাহ পাক সমগ্র মানব জাতির হিসাব নেবেন আর এজন্যে সময় ব্যয় হবে একদিনের অর্ধেক। এরপর একদল জান্নাতে যাবে, একদল দোজখে। এবনে আবি হাতেম এবং এবনে মোবারক বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, হিসাবের দিনের অর্ধেক অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই জান্নাতবাসী জান্নাতে আর দোজখীরা দোজখে পৌঁছে যাবে। যেমন কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

أَصْحَٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا

জান্নাতবাসীগণ ঐ দিনই জান্নাত বিশ্রাম করবেন বলে আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে। এমনিভাবে দোজখীদের সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

ثُمَّ اِنَّ مَقِيْلَهُمْ لَاِ اِلَى الْجَحِيْمِ

"দোজখীরা অবশ্যই ঐ দিন দুপুর পর্যন্ত দোজখে পৌঁছে যাবে"।

এবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, (হিসাবের দিন) শুধু দ্বিপ্রহর হলেই আল্লাহর ওলীগণ জান্নাতে বিশ্রাম গ্রহণ করবেন। পক্ষান্তরে আল্লাহর দুশমনেরা শয়তানকে জড়িয়ে ধরবে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এই অর্ধেক দিন দুনিয়ার হিসেবে নয়; আখেরাতের অর্ধেক দিন হবে (আর আখেরাতের এক দিন দুনিয়ার হাজার বছরের সমান)।

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ

অর্থাৎ এই পবিত্র কোরআন, অথবা এই সূরা, অথবা পূর্ববর্তী আয়াত।

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ

আয়াতে যে নসিহত রয়েছে বা যে শিক্ষা রয়েছে তা সমগ্র মানব জাতির শিক্ষার জন্যে যথেষ্ট।

وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ

আর যেন আল্লাহ পাকের এ ঘোষণা দ্বারা মানুষকে ভয় প্রদর্শন করা হয়। আর তারা যেন নিশ্চিতভাবে একথা জানতে পারে যে এক আল্লাহ পাকই বন্দেগীর যোগ্য, আর কেউ নয়। বন্দেগী শুধু তাঁরই করতে হবে, আর কারো নয়।

وَلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ

আর বুদ্ধিমান লোকেরা যেন পবিত্র কোরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, পবিত্র কোরআন এজন্যে নাজিল করা হয়েছে যেন মানুষ আত্মসংশোধন করে এবং এ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগী সম্পর্কে সচেতন থাকে। এ আয়াত সমূহে আল্লাহ পাক একথা ঘোষণা করেছেন যে, পবিত্র কোরআন তথা সমস্ত আসমানী গ্রন্থ নাজিল করার এবং নবী রসূলগণকে প্রেরণ করার উদ্দেশ্য হলো যেন মানুষকে তার ভবিষ্যত জীবন সম্পর্কে সতর্ক করা হয়। দ্বিতীয়তঃ মানুষের কর্তব্য হলো, বিবেক-বুদ্ধি ব্যয় করে সত্যকে গ্রহণ করতে সচেষ্ট হওয়া। মানুষের বুদ্ধিমত্তার পরিপূর্ণতা প্রমাণিত হয় তখন, যখন সে স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করে। তৃতীয়তঃ তাকওয়া-পরহেজগারী অবলম্বনের মাধ্যমেই মানব জীবনের সাধনা সার্থক, সুন্দর এবং সফলকাম হয়।

সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ

আলোচ্য সূরার শেষে মানুষ মাত্রের উদ্দেশ্যে এরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ

নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক অতিসত্বর হিসেব গ্রহণ করবেন। অতএব, কেউ যেন গাফলতের ঘুমে বিভোর না হয়ে থাকে। অন্য আয়াতেও এ সম্পর্কে বিশেষভাবে তাগিদ রয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ

"মানুষের হিসাব গ্রহণের সময় অতি নিকটবর্তী, অথচ তারা গাফলতের আবর্তে নিপতিত হয়ে বিমুখ হয়েছে"।

বোখারী শরীফে সংকিলত একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন পাঁচটি প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মানুষ তার স্থান থেকে কোনদিন যেতে পারবে না।

১. عن عمره

অর্থাৎ প্রত্যেককে তার জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, কি কাজে ব্যয় করেছে আল্লাহ পাক প্রদত্ত এই জীবন?

২. عن شبابه

অর্থাৎ তার যৌবন কিভাবে ব্যয় করেছে?

৩. عن ماله مما اكتسبه

অর্থাৎ সম্পদ কি কি পন্থায় রোজগার করেছে?

৪. وفيما انفقه

আর অর্থ–সম্পদ কি কি খাতে ব্যয় করেছে?

عن علمه

৫. আর যে সব বিষয়ের এলম সে অর্জন করেছিল তার উপর কতখানি আমল করেছে।

এমনিভাবে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ.......شَرًّا يَّرَهٗ

"যে ব্যক্তি কণা মাত্র নেক আমল করবে সে তার শুভ-পরিণতি অবশ্যই দেখতে

পাবে। আর যে কণা মাত্র মন্দ আমল করবে সে-ও তার শোচনীয় পরিণতি দেখতে পাবে"।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, কণা মাত্র নেক আমলের পুরস্কার কণা মাত্র হবে না, তাই তা দেখা যাবে। এমনিভাবে যদি সগীরা গুণাহও কারো দ্বারা হয় আর আল্লাহ পাক তা মাফ না করেন তবে তার শাস্তিও দেখা যাবে।

দ্বিতীয়তঃ হিসাব গ্রহণ যখন শুরু হবে তখন তাতে এতটুকু বিলম্ব হবে না। কেননা আল্লাহ পাক প্রত্যেকের জীবনের সকল অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। আর এ কাজটি তাঁর জন্যে খুবই সহজ। যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ

অর্থাৎ তোমাদের সকলের সৃষ্টি এবং তোমাদের পুনঃজীবন এমনই, যেমন একটি মানুষকে সৃষ্টি করা এবং মৃত্যুমুখে পতিত করা। অর্থাৎ সমগ্র মানব জাতির হিসাবের সময় ঘনিয়ে এসেছে আর হিসাব গ্রহণে কোন প্রকার বিলম্ব হবে না; বরং একদিকে শুরু হবে আর একদিকে শেষ হবে।

আলোচ্য সূরার শুরুতে পবিত্র কোরআন নাজিল করার উদ্দেশ্য এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ

الٓرٰ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ

অর্থাৎ হে রসূল এই কিতাব কোরআনে করীম আপনার নিকট এজন্যে নাজিল করেছি যেন আপনি কোরআনে করীমের মাধ্যমে দুনিয়ার মানুষকে গোমরাহীর অন্ধকার থেকে হেদায়েতের আলোর দিকে নিয়ে আসেন। আর সূরার শেষে এরশাদ হয়েছেঃ

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ

এই কোরআনের মাধ্যমে সমগ্র মানব জাতির উদ্দেশ্যে আল্লাহ পাকের মহান বাণী প্রচার করা হচ্ছে, যাতে করে মানুষ সতর্ক হয় এবং যেন তারা জানতে পারে যে তিনিই একমাত্র মা'বুদ আর যেন বুদ্ধিমান লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে কেননা, কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক তাঁর একত্ববাদের এবং আম্বিয়ায়ে কেরামের সত্যতার এবং কেয়ামতের দিনের ব্যাপারে এমন সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন যে, যদি কারো মধ্যে সামান্য বিবেক-বুদ্ধিও থাকে, সে এই মহা সত্যকে অস্বীকার করতে পারবে না।[১]

وَلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ

অর্থাৎ "যেন বুদ্ধিমানেরা উপদেশ গ্রহণ করে"–এ বাক্য দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে মানুষের মর্যাদা এবং ফজিলত তার বিবেক-বুদ্ধি এবং তার সঠিক

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ), খন্ড-৪, পৃঃ ১৪৯

প্রয়োগের মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়, যারা বুদ্ধিমান তারা সৃষ্টিকে দেখেই তার স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে। আর যে নির্বোধ তাকে বারে বারে সতর্ক করার পরও সে সতর্ক হয় না।[১]

بسم الله الرحمٰن الرّحيم

সূরা হিজর

সূরা হিজর প্রসঙ্গে

এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। আয়াত–৯৯ রুকু-৬। "হিজর" নামক স্থানটি সিরিয়া এবং মদীনা মোনাওয়ারার মধ্যখানে অবস্থিত। এ স্থানের অধিবাসীরা তাদের নাফরমানীর কারণে আল্লাহ পাকের কোপগ্রস্ত হয়েছিল। আলোচ্য সূরায় তাদের ধ্বংসের বিবরণ স্থান পেয়েছে আর এজন্যে এ নামেই আলোচ্য সূরার নামকরণ করা হয়েছে। যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতকে অস্বীকার করে তাদের মন্দ আচরণ এবং তার পরিণাম সম্পর্কে এ সূরায় বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

الٓرٰ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ

আলিফ-লাম-রা- (এটি হরফে মোকাত্তাআত)। এ আয়াত সমূহ মহান গ্রন্থ পবিত্র কোরআনেরই, যা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। পবিত্র কোরআন কামেল, পরিপূর্ণ কিতাব, মহান গ্রন্থ, যার মোকাবেলায় অন্য কোন কিতাবকে কিতাবই বলা যায় না। এ কিতাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কোন আড়ষ্টতা বা অস্পষ্টতা এতে নেই। এ মহান গ্রন্থের বর্ণনা–শৈলী অত্যন্ত স্বচ্ছ, সাবলীল, এই পবিত্র গ্রন্থে বর্ণিত প্রমাণ সমূহ অতি উজ্জ্বল, দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট প্রতিভাত, তাই পবিত্র কোরআনের প্রতি মনযোগ সহকারে কর্ণপাত করা এবং তা অনুধাবনে সচেষ্ট হওয়া প্রত্যেকেরই একান্ত কর্তব্য। কেননা, এতেই নিহিত রয়েছে সমগ্র মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ। আলোচ্য আয়াতে পবিত্র কোরআনের দু'টি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে।

১. এটি কামেল বা পরিপূর্ণ।

২. এটি সুস্পষ্ট, হালাল ও হারাম, হক্ব ও বাতিল এবং হেদায়েত ও গোমরাহীকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে এ মহান গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ২৯শে রজব মোতাবেক ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৯৯২) রোজ মঙ্গলবার বেলা একটায় তফসীরে নূরুল কোরআনের ত্রয়োদশ খণ্ডের রচনা সমাপ্ত হলো। হে আল্লাহ! কবুল কর, হে আল্লাহ! এই মহান গ্রন্থকে সম্পূর্ণ করার তওফিক দান কর। হে আল্লাহ! প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উসিলায় অধমের দোয়া কবুল কর। আমীন।

১। তফসীরে কবীর. খন্ড-১৯, পৃঃ ১৫১